

মুসলিম নারীর ভাষা: শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার জগৎ

পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

হাসনুহেনা

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নং - AOOBE1401116

তত্ত্বাবধায়ক

ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী

(প্রাক্তন অধ্যাপক)

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা-৭০০০৩২

২০২১

Certified that the Thesis entitled

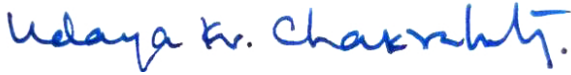
মুসলিম নারীর ভাষা: শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার জগৎ [Muslim Narir Bhasha: shabdarthatattwa o Adhibhashar Jagat] submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Udaya Kumar Chakraborty, Former Professor, Department of Bengali, Jadavpur University; And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Candidate



[Hasnuhenna]

Countersigned by the Supervisor



[Dr. Udaya Kumar Chakraborty]

Former Professor

Department of Bengali

Jadavpur University

Kolkata 700032

Dated: 10.12.2021

প্রাককথন

একজন গবেষক তাঁর দীর্ঘ গবেষণার পথে শুধু একটি গবেষণা নিবন্ধটিকেই গড়ে তোলেন না। নিজেও সেই গবেষণার হাত ধরে তিলে তিলে তৈরি হয়ে ওঠেন। কখনো গবেষণা নিবন্ধ তাঁকে কখনো তিনি গবেষণা সন্দর্ভটিকে পারস্পরিকভাবে সমৃদ্ধ করে তোলেন। প্রায় সব গবেষকের মতো আমার এই যাত্রাপথও সমতল নয়। একারও নয়। আমার সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে একদিকে যিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন অন্যদিকে আমার সক্ষমতার উপর যিনি আমার আগেই দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আমার পিতৃপ্রতিম আচার্য ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী। তাঁকে ছাড়া এই সন্দর্ভ সৃষ্টির পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়া অসম্ভব ছিল। ভাষাবিজ্ঞান পড়তে ও ভালবাসতে শেখা তাঁর কাছে। তাঁরই তত্ত্বাবধানে করা স্নাতকোত্তরের প্রকল্প পত্র ও এমফিলের গবেষণাপত্রটি। তাঁর অকুণ্ঠ সাহচর্য ভালোবাসা স্নেহ প্রশয় ও নির্দেশনা ছাড়া এই গবেষণা নিবন্ধটি সৃষ্টির মুখ দেখতে পেত না। তাঁর অনুপ্রেরণা সুচিন্তিত মতামত ও সর্বোপরি আমার প্রতি আস্থা আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে গবেষণার কাজটি সঠিকভাবে সম্পাদনা করতে। গুরু ঋণ অপরিশোধ্য।

এছাড়া গবেষণার কাজ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল কাফি ও জয়দীপ ঘোষের কাছ থেকে। তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ইন্সিতা হালদারের প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশের জন্য। এছাড়া আমার বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন শিক্ষকের প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম যারা আমার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে, আমার চিন্তন মনন ও চেতনাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

গবেষণার কাজে বিভিন্ন বইপত্র সাময়িক পত্রের খোঁজ দিয়ে, অনবরত অনুপ্রাণিত করেছে আধুনিক সময়ের গদ্যকার বন্ধু সম্বিত বসু। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো ভাষা নেই।

বিভাগের অনুজ বন্ধু সামসুর রহমান গবেষণার ক্ষেত্র সমীক্ষায় যেভাবে সাহায্য করেছেন তা ভোলার নয়। বিভাগের ভাতৃপ্রতিম অনুজ স্বস্তিক করগুপ্ত প্রযুক্তিগত কাজে সাহায্য করেছে। তার প্রতি আমার ভালোবাসা ও স্নেহ রইল।

আর যারা আমার জীবনের মেরুদণ্ড, আমার জীবনের প্রতিটি সাফেল্য যাঁদের ত্যাগ ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণাই মূল চালিকা শক্তি সেই আব্বা মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা জানানোর রীতি আমার অজানা। আমার মা মজিদা খাতুন, যিনি উত্তর ২৪ পরগণার মেয়ে ও মুর্শিদাবাদের বধূ তিনি আমার গবেষণা সন্দর্ভের জন্য বহু তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। বহু শব্দের অধিভাষা বুঝতে সাহায্য করেছেন। অনেক পুরনো শব্দ যা প্রবীণ মহিলারা ব্যবহার করে থাকেন সেসবের অনেক হাল-হদিশ পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে। এই গবেষণার জন্য মায়ের কাছে ঋণ অপরিমেয়। আজীবন তাঁর কাছে আমার ঋণ আমার পাথেয় হয়ে থাকুক।

এই গবেষণা সন্দর্ভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত রয়েছে বহু মানুষের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা ও পরিশ্রম। তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাছে ছাত্রাবস্থা থেকেই অফুরন্ত সাহায্য পেয়ে এসেছি। গবেষণার সময়ও এখান থেকে খালি হাতে ফিরিনি। এছাড়া প্রচুর বইপত্র জার্নাল পেয়েছি অনলাইনের বিভিন্ন সাইট থেকে।

সূচিপত্র

অধ্যায় বিভাজন	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	১-৪
প্রথম অধ্যায়	৫-৫০
নারীর অধিভাষার জগৎ: শব্দার্থতত্ত্ব-ভিত্তি	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৫১-৮৪
ভাষা পারঙ্গমতাবোধ ও নারীর ভাষা নির্মাণ	
তৃতীয় অধ্যায়	৮৫-২২৫
মুসলিম নারীর অধিভাষা নির্মাণে ধর্মের প্রভাব	
চতুর্থ অধ্যায়	২২৬-২৪১
নারীর মনোজগৎ ও উপসর্গ ব্যবহার বৈশিষ্ট	
পঞ্চম অধ্যায়	২৪২-২৬৮
মুসলিম মেয়েদের বাক্যগঠন ও অধিভাষা	
ষষ্ঠ অধ্যায়	২৬৯-২৯৮
নারীর মুখের গল্প-কথা ও অধিভাষার জগৎ	
উপসংহার	২৯৯-৩১০
গ্রন্থপঞ্জি	৩১১-৩২৩
পরিশিষ্ট	৩২৪-৩৬২

ভূমিকা

আমাদের চিন্তারাশি যা কি না বিমূর্ত একটি বিষয় তাকে আমরা কিছু শব্দের মাধ্যমে অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি। এই সন্দর্ভে আমরা চেষ্টা করেছি মুসলিম নারীর ভাষা থেকে তার অধিভাষার জগতে, তার অন্তর্জগতে পৌঁছানোর। বিদ্যায়তনিক পরিসরে মানবীবিদ্যার চর্চা এখন খুব একটা নতুন বিষয় নয়। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মানবীবিদ্যা তার নিজস্ব ভূমিকায় সমুজ্জ্বল। ভাষাবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলেও নারীর ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। সুকুমার সেন ‘Women’s Dialect in Bengal’ লিখছেন। সেখানে তিনি বাঙালি মেয়েদের ভাষার শব্দভাণ্ডারের বিশেষত্ব, ছড়া প্রবাদের প্রতি ঝোঁক ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরছেন যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে পরবর্তী গবেষকদের দিশা দেখিয়েছে। শর্মিলা বসু তাঁর ‘মেয়েদের ভাষা’ বইটিতে মেয়েদের ভাষা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। এছাড়া উদয়কুমার চক্রবর্তীর প্রবন্ধ ‘নারীর ভাষা’ এবং সাম্প্রতিক কালে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু গবেষণাপত্রও এ বিষয়ে পথিকৃৎ হয়ে আছে। কিন্তু এই গবেষণাগুলোতে আলাদা করে আমরা মুসলিম মেয়েদের ভাষা নিয়ে আলোচনা পাচ্ছি না।

আমরা এখানে মুসলমান নারীর মুখের ভাষা থেকে তাদের অন্তর্জগতে, অধিভাষার জগতে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। ভাষা একটি সামাজিক বিষয়। সমাজের প্রয়োজনে উদ্ভূত ভাষা তাই সমাজ-নিরপেক্ষ হতে পারে না। আমাদের এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে ‘simple random’ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

এই গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলাকে- উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও মালদা। পশ্চিমবঙ্গের এই চারটি জেলায় সর্বাধিক মুসলিম বসবাস করে। তাই ক্ষেত্রসমীক্ষায় এই চারটি জেলাকে বেছে নেওয়া হল। এখানে পশ্চিমবঙ্গের অন্য মুসলিম মেয়েদের ভাষা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদের ভাষাও এই গবেষণা থেকে বাদ গিয়েছে। আগামী দিনে ভবিষ্যৎ-গবেষকরা নিশ্চয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করার কথা ভাববেন।

এই গবেষণা সন্দর্ভে অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগৎকে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে আমরা ‘মুসলিমমেয়ে’দেরকে একটি আলাদা ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করছি। তাদের অধিভাষার জগৎ আলাদা হবে কি না তা এই সন্দর্ভে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

বিভিন্ন জেলায় যেহেতু ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। অবধারিত ভাবে সেখানকার আঞ্চলিক প্রভাব আছে ভাষায় মিশে। এছাড়া সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য সূচক যেমন পেশা বয়স অর্থনৈতিক অবস্থান ভেদে ভাষায় যে পার্থক্য থাকে সেগুলোও ভাষার মধ্যে আমরা পাব। একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে সে যে যে সামাজিক ভূমিকা ও স্থানে অবস্থান করে তার সেই অস্তিত্বের দ্যোতনা তার ভাষায় প্রভাব ফেলে।

আমরা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভকে ছটি অধ্যায়ে এবং উপসংহারে বিভক্ত করেছি আলোচনার সুবিধার্থে।

প্রথম অধ্যায়ে, এই গবেষণা যে তত্ত্বগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থতত্ত্বের বিভিন্ন ধাপ এবং

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা একদিকে সমাজভাষাবিজ্ঞান অন্যদিকে শব্দার্থতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমরা দেখিয়েছি বাঙালি মুসলিমদের নিজস্ব অস্তিত্বের সংকট এবং সেখানে বাঙালি মুসলিম নারীর অবস্থান। বাঙালি মুসলিমদের ধর্মাচরণে শিথিলতা, সুফি প্রভাব, দারিদ্র ও শিক্ষার অভাব মুসলিম নারীর জীবন ও মননে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্য এবং ইসলাম ধর্মের বিধিনিষেধ শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত মুসলিম নারীর মনন এবং অধিভাষার জগৎ গঠন করতে কীভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, আমরা দেখিয়েছি ইসলাম ধর্মের ও শরিয়তের বিভিন্ন বিধি ও নারীপুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিধি কীভাবে বিভিন্ন শব্দ সম্পর্কিত বোধ বা অধিভাষা নির্মাণ করেছে। অনেক শব্দ ধরে ধরে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি সেই শব্দ বা ক্রিয়া বা আচরণ সম্পর্কে তাদের বোধের, শব্দার্থের গহন জগৎ।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বিশেষভাবে নজর দিয়েছি উপসর্গের প্রতি। বাঙালি মুসলিম পরিবারে কিছু বিশেষ বিশেষ উপসর্গ সহযোগে শব্দ গঠনের প্রতি ঝাঁক থাকে। তার মধ্যে আবার মেয়েদেরও কিছু বিশেষ পক্ষপাত রয়েছে। সেই সমস্ত উপসর্গের অধিভাষার জগৎ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে, মুসলিম মেয়েদের বাক্য গঠন কীভাবে তাদের অন্তর্জগতের হৃদিশ দেয় ও ভিন্ন অধিভাষার জগৎ নির্মাণ করে তা আমরা তাদের দৈনন্দিন কথোপকথন থেকে বিশ্লেষণ করেছি। এখানে মেয়েদের বাক্য ব্যবহারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মেয়েদের গল্প কখন ভঙ্গি যা মেয়েদের সহজাত তা মুসলিম মেয়েদের মধ্যে কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দিচ্ছে কি না তা অনুসন্ধানের প্রয়াস থেকেছে।। এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব, মুসলিম মেয়েরা একদিকে যেমন রূপকথার গল্প, ছোটোদের গল্প বলে অন্যদিকে হাদিস কোরানের বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত বা নীতিমূলক গল্পও বলে যা তাদের ভাষাবিশ্বকে প্রভাবিত করে গভীরভাবে।

আমরা উপসংহারে দেখানোর চেষ্টা করেছি মুসলিম মেয়েদের নিজস্ব অধিভাষাতে মুসলিম ও নারী এই দুটো সূচকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেমন থাকে তেমন বাঙালি পরিচিতিও তাদের ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। তাদের ভাষাবিশ্ব ও অধিভাষার জগৎ দ্বন্দ্বময় ও বহুমাত্রিক। তা একদিকে ‘নারী’ ও ‘মুসলিম’ এই দুই পরিচিতিতে আলাদাভাবে আত্মীকরণ করেও নিজস্ব ভূমিকায় সমুজ্জ্বল।

এই গবেষণাতে আকাদেমির বানান অভিধান অনুসৃত হয়েছে। উল্লেখপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে MLA (6th) স্টাইল অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

নারীর অধিভাষার জগৎ : শব্দার্থতত্ত্ব-ভিত্তি

১. ভূমিকা

শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics ভাষাবিজ্ঞানের বিশিষ্ট ধারাগুলির অন্যতম। শব্দার্থতত্ত্ব ভাষার মধ্যে অবস্থিত তার প্রত্যেকটা উপাদানের অর্থ ও তাদের পারস্পরিক ও সামগ্রিক অর্থ নিয়ে আলোচনা করে। যদিও আমরা জানি যে, আমরা প্রতিনয়ত যে কথা বলে যাই তা আসলে কিছু চিহ্ন বা সিম্বলের মতো করে কাজ করে। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সেই সিম্বলগুলোর অর্থ আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে। যদি একজন সেই সিম্বল বা ভাষা না জানে তাহলে সে সেই ভাষা বুঝবে না বা সেই ভাষা তার কাছে কয়েকটি অর্থহীন ধ্বনি সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই হবে না। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর এর ‘চিহ্নক’ বা ‘signifier’ এবং চিহ্নিত বা ‘signified’ তত্ত্বটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

‘Semantics’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি ফিলোলজিস্ট মাইকেল ব্রেইল (Michel Breal)। কোনো বিশেষ শব্দচয়ন বা তাৎপর্যের ক্ষেত্রে তা বোঝাবার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হত। ভাষাবিজ্ঞানে চিহ্ন বা প্রতীকের ব্যবহার ও বিশ্লেষণে ‘semantics’ কথাটি ব্যবহার করা হয়। এবার এই ভাষায় বিভিন্ন শব্দ পরস্পর বসে অন্বয়ের মাধ্যমে যে অর্থ নির্দেশ করে তা বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ বাক্য বা ভাষার অর্থ নির্ভর করে শ্রোতার ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যার উপরে। অর্থাৎ শুধুমাত্র অভিধানগত অর্থ যথেষ্ট হয় না অনেক সময় ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে। আবার একই কথা এক এক সময়ে ব্যক্তি সাপেক্ষে এক একটা বিষয়ের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যেতে পারে। ফলে, বিভিন্ন শব্দকে signifier ও তার অর্থকে বা যে জিনিস বা বিষয় বোঝাতে সেই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছিল

তাকে signified বলে। আমার দেখব যে চিহ্ন পদ্ধতি বা sign system কে আপাত সরল সুসংবদ্ধ ও একমুখী মনে হচ্ছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষা আর তত সরল থাকে না। তার অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে অভিধানগত অর্থ ছাড়াও আরো বহু বিষয় সূচক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। সেই সমস্ত বিষয় শব্দার্থতত্ত্বের এলাকা।

২. প্রাচীন ভারতে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা

ভারতীয় দর্শনে ও ব্যাকরণে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা আগে থেকেই ছিল। পাণিনি, পতঞ্জলি, যাস্ক, ভট্টহরি প্রমুখ সংস্কৃত ভাষায় শব্দার্থতত্ত্বের নানাবিধ দিক ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। চমস্কি তাঁর “Aspects of the Theory of Syntax” [1965] গ্রন্থের ভূমিকায় পাণিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’র অবদান স্বীকার করে নিয়েছেন সঞ্জননী ব্যাকরণে।^১ এছাড়া ভট্টহরির ফোটেবাদের গুরুত্ব পাশ্চাত্যেও স্বীকৃত।

Robins জানাচ্ছেন যে -^২ ভারতে ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় বাক্য ও পদের গুরুত্ব নিয়ে বিতর্ক ছিল। একদল পাশ্চাত্য ধারার মতো পদকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য ছিল যেহেতু পদের সমষ্টিই বাক্য তাই তাদের সম্মিলিত অর্থই একটি বাক্য বহন করে। এর বিপরীতে ভট্টহরি প্রমুখরা বাক্যের অর্থকে সামগ্রিক ভাবে দেখতে চেয়েছেন। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই সমগ্র বাক্যের বোধটি পায়। বাক্যকে ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করে পদকে গুরুত্ব দিয়েছেন বৈয়াকরণিকরা। একটি বাক্য সম্পূর্ণ উচ্চারিত হলে তবেই তার অর্থ সম্যকভাবে উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানে বন্দিত ও নন্দিত। তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে শব্দার্থতত্ত্বের বিকাশ ঘটে উনিশ শতকে। ব্রিল প্রথম ১৮৮৩ সালে ‘semantique’ পরিভাষাটা ব্যবহার করেন। বাংলায় ‘semantics’ এর পরিভাষারূপে শব্দার্থতত্ত্বই সর্বজনগ্রাহ্যরূপে গৃহীত। হেমন্তকুমার সরকার প্রথম এই শব্দার্থতত্ত্বটি ব্যবহার করেন (১৯২৩)। এছাড়া সুনীতিকুমার (১৯৪৫) শব্দার্থবিজ্ঞান

(বাগার্থ), বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৬৫) ‘বাগার্থবিজ্ঞান’ পরিভাষা ব্যবহার করেন। আর সুকুমার সেনের পক্ষপাত ছিল শব্দার্থতত্ত্ব পরিভাষাটির উপর।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পেক্ষাপটে শব্দার্থতত্ত্ব খুবই চর্চিত একটি দিক। দর্শন ও ভাষার আঙিনা ছাড়িয়ে বিভিন্নক্ষেত্রে শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics বিভিন্ন শাখায় প্রাধান্য লাভ করেছে। প্লেটোর থেরায়তেতুস গ্রন্থে সত্রেটিসের মাধ্যমে ভাষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটে। ওনোমাতা (বিশেষ্য) ও রেমাতা (ক্রিয়া)র সংযোগে বাক্য গড়ে ওঠে বলে প্লেটোর অভিমত। অনেকেই প্লেটোর ভাগকে আকারগত না বলে অর্থগত বলতে চান। তবে শিশিরকুমার দাশ এ বিষয়ে তার সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। তিনি প্লেটোর ভাষা সম্পর্কে অবদানকে স্বীকার করে নিয়েও বলেছেন প্লেটো যথার্থ ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তার প্রবক্তা নন।^৭

এরপর আরিস্টটল ‘লোগোস’ এর একটি বিশেষ তাৎপর্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে, লোগোস হল তাৎপর্যময় উক্তি, তার অর্থ আছে কিন্তু তা কোনো বক্তব্যের সমর্থন বা অসমর্থন কিছুই করে না। এছাড়া গ্রিক ‘সু ন দে স মো ই’ এর কথা উল্লেখ্য যার তর্জমা হতে পারে সংযোজক অব্যয়। এক অর্থে এরা অর্থহীন আবার বাক্যে সংযোজিত হলে নতুন অর্থ দ্যোতিত করে। তবে ভারতীয় ব্যাকরণচর্চার তুলনায় পাশ্চাত্যে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা খানিক ম্রিয়মানই বটে।

৩. ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় শব্দার্থতত্ত্ব

ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা প্রকার ও কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বহিরঙ্গেই শুধু পরিবর্তন আসে তা না, অর্থেরও পরিবর্তন আসে। নির্দিষ্টভাবে অর্থ পরিবর্তনের কারণ বলা দুরূহ। রুমফিল্ড, পল, উলম্যান, ব্রিল কেউই অর্থ পরিবর্তনের কারণ নির্ণয়ে একমত হতে পারেননি।

ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীদেরও এ বিষয়ে ঐক্যমত নেই। কৃষ্ণপদ গোস্বামী, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, সুকুমার সেন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ কারণ বিষয়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

A.F.pott (1876) অর্থ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে বলেছেন—

ক। শব্দের অর্থের সংকোচন প্রসারণ ঘটিয়ে

খ। শব্দকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে

গ। ব্যক্তি ও বস্তুভেদে শব্দ প্রয়োগ ও তজ্জনিত কারণে অর্থ পরিবর্তন হয়।

ঘ। কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যে একই শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঙ। একই ধারণা একটি কোনো শব্দ বা জটিলভাবে ঘুরিয়ে একাধিক শব্দের মাধ্যমেও প্রকাশ করা যেতে পারে।

চ। একই শব্দের বৈচিত্রপূর্ণ অর্থ হয় বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে।

ছ। শব্দের উচ্চারণগত পরিবর্তনে অর্থ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

H. Paul (1886) কারণ হিসেবে বলেছেন উচ্চারণের তারতম্যেও শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে। এছাড়া কিছু কিছু শব্দের অর্থ ব্যক্তিভেদে বা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভেদে অন্যরকম হয়ে যায়। M. Breal (1897) কারণ হিসেবে বলছেন –

ক. (abridgment) সংক্ষিপ্তকরণ খ. (Compound Nouns) যৌগিক বিশেষ্য গ. concretion of meaning বা অর্থের সংমিশ্রণ ঘ. (Metaphor) রূপকের ব্যবহার ঙ. (Industrial production) শিল্প উৎপাদন চ. (The propensity to generalization

& chimerical tendency) যে কোনো বিষয়ের সাধারণীকরণের প্রবণতা বা কাল্পনিক বিষয়ে কথা বলা হলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে ছ. (Politeness) সৌজন্য

T.G.Tucker (1908) এর মতে –

- ক. কোনো শব্দের বৈচিত্রময় অর্থের সম্ভাবনা তার ব্যবহার ও অর্থকেও একইরকম রাখে না।
- খ. কোনো বস্তু বা বিষয়ের নামকরণের মধ্যে কোনো উপাদান প্রাধান্য পেলে সেই শব্দের অর্থ বিশেষ হয়ে ওঠে।
- গ. অনবধানতাবশত, কোনো শব্দের মধ্যে বক্তার সাধারণ ধারণা অনুযায়ী আনুষঙ্গিক অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।
- ঘ. কোনো শব্দের প্রতীকী প্রয়োগ তার শব্দার্থের সীমানার বিস্তার ঘটায়
- ঙ. আবেগ অনুভূতির আতিশয্য কোন শব্দের আভিধানিক অর্থকে কখনো অতিক্রম করে যায়।
- চ. সামাজিকভাবে অশোভন বা নিষেধমূলক শব্দগুলোকে আমরা প্রায়ই অন্যভাবে বলার চেষ্টা করে থাকি।
- ছ. শব্দ ব্যবহারে শিথিলতা বা কখনো উপেক্ষা শব্দের অর্থকে অন্যভাবে প্রতিপাদন করে।

S. Ullman (1962) যেসব কারণগুলি নির্দেশ করেছেন সেগুলি হল –

- ক. ভাষাবিজ্ঞানগত কারণ (Linguistic causes)
- খ. ঐতিহাসিক কারণ (Historical causes)
- গ. সামাজিক কারণ (Social causes)

ঘ. মানসিক কারণ (Psychological causes)

ঙ. বিদেশি ভাষার প্রভাব (Foreign influence)

চ. কোন নতুন বিষয় বা ধারণার প্রয়োজনে নতুন শব্দের প্রয়োজন। (The need for new name for new discovery)

ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানীরাও শব্দার্থ পরিবর্তনের নানা কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। তারাপোরেওয়ালা যে যে কারণগুলোকে শব্দার্থতত্ত্বের জন্য ক্রিয়াশীল ভেবেছেন সেগুলো হল—

ক. প্রতীকী ভাষা বা অলংকারের প্রয়োগে শব্দের অর্থবোধ প্রচলিত অর্থ থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে।

খ. পরিবেশের পার্থক্যেও শব্দার্থে পরিবর্তন আসে। যেমন ভৌগোলিক সামাজিক বা পরিবেশগত উপাদানের পরিবর্তনের জন্যও শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

গ. সামাজিক সৌজন্য বশত আমরা অনেক কথা রূক্ষভাবে না বলে বিকল্প শব্দ ব্যবহার করি। আবার সম্বোধনের ক্ষেত্রেও সৌজন্য বজায় রাখি। এসব ক্ষেত্রেও শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়।

ঘ. বা আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ অন্যরকম হতে পারে।

ঙ. বিদ্রূপ বা কপটতার ক্ষেত্রেও আমরা দেখব শব্দার্থ পরিবর্তন।

চ. আবেগের বহুলতা

ছ. বিভিন্ন সমার্থক শব্দগুচ্ছের মধ্যে কিছু শব্দের ব্যবহার বেশি।

জ. ভুল বোঝাবুঝি বা উপেক্ষা বশত অনেক সময় একটি শব্দের ভিন্ন অর্থ হয়ে যায়।

ঝ. যে কোন শব্দের মধ্যেই তার অর্থের অসীম বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে থাকে।

ঞ. প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও এই পৃথিবীকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ধারণ করে। তাই শব্দের অর্থও তাদের জন্য পৃথক হয়ে পড়ে।

ট. কোনো শব্দের কোনো উপাদানের উপর জোর পড়লে

ঠ. অসচেতনভাবে শব্দের মধ্যে অন্য অর্থের অন্তর্ভুক্তি ঘটে যেতে পারে।

বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৫০) শব্দার্থ পরিবর্তনের যে কারণগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ—

১। আলিঙ্কারিক প্রয়োগ (উপমান ও উপমেয়, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ) ২। সৌজন্য ও শিষ্টাচার

৩। বক্রোক্তি ৪। ব্যাজোক্তি ৫। পরিবেশের অনৈক্য

৬। ভাবাবেগ ৭। ব্যাপ্তিস্থলে সমষ্টি ৮। সমষ্টিস্থলে ব্যাপ্তি ৯। অনবধানতা

১০। অর্থসৃষ্টি ১১। অর্থের অনির্দিষ্টতা ১২। গৌণার্থপ্রাধান্য

শুদ্ধসত্ত্ব বসু শব্দের একাংশের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বদান, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের ব্যবহার, দেশ বা ব্যক্তির নাম বাদ নূতন অর্থ ইত্যাদি সহ ১৫টি কারণের উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণপদ গোস্বামী (১৯৬৬) ও শুদ্ধসত্ত্ববসুর মতো টুকার পন্থী ছিলেন। আনন্দমোহন বসু (১৯৭৩), দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (১৯৭৫), পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯৮৪), আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৮৫) প্রমুখরাও তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেছেন। রামেশ্বর শ' (১৯৮৮) অর্থ পরিবর্তনের কারণগুলিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন—

১। স্থূল কারণ

২। সূক্ষ্ম কারণ

স্থূল কারণগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

ক। ভৌগোলিক খ। ঐতিহাসিক গ। উপকরণগত

সূক্ষ্ম কারণগুলিকেও নানাভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—

ক। সাদৃশ্য খ। মানসিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় সংস্কার গ। শৈথিল্য ও আরামপ্রিয়তা ঘ।
আলংকারিক প্রয়োগ ইত্যাদি

বাংলায় ভাষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধারায় (দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামেশ্বর শ' প্রমুখরা) শব্দার্থতত্ত্বের কারণ-নির্ণয়ে কেউ খুব বেশি অগ্রসর হয়নি। বলেননি, তিনটে বিষয়কেই মুখ্য কারণ হিসেবে রাখতে চান তারা।

শব্দার্থ পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি—

অসুর – বেদের প্রাচীনতম অংশে ও প্রাচীন আবেস্তায় (পারসিক) ‘অসুর’ শব্দের অর্থ ছিল দেবতা। পরে সংস্কৃত ও সংস্কৃত উত্তর ভারতীয় ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় দৈত্য বা দানব। দেবতাদের শত্রু। আবার প্রাচীন আবেস্তায় দেব শব্দের অর্থ ‘অপদেবতা’ বা ‘দানব’। ইন্দো-ইরানীয় দুটি আর্যভাষায় দুটি শব্দ পারস্পরিকভাবে তাদের অর্থ বিনিময় করেছে। শব্দের পারস্পরিক অর্থ বিনিময়ের একাধিক কারণের উল্লেখ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। তারা পোরেওয়ালা বলেছেন অনবধানতা আর পরেশচন্দ্র ‘পারিবারিক ভিন্নতা’ বলেছেন (পরেশচন্দ্রঃ পৃ ১৪৮)

কালি— লেখার উপকরণরূপে কালো রঙের তরল পদার্থ কালি রূপে পরিচিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য রঙের তরল পদার্থও লেখার জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। কালির অর্থ বিস্তার ঘটে সব রঙকেই কালি বলার প্রচলন শুরু হয়। এর কারণ হিসেবে সাদৃশ্য-ভাবনা (তারাপোরেওয়ালা), ব্যাপ্তিস্থলে সমষ্টি (বিজনবিহারী) বা আলংকারিক প্রয়োগ (দ্বিজেন্দ্রনাথ) ইত্যাদি একাধিক কারণ দেখানো যেতে পারে।

৪. আচরণবাদী শব্দার্থতত্ত্ব

(Behaviourist semantics)

মনস্তাত্ত্বিক জে বি ওয়াটসন আচরণবাদ নামে এক নতুন চিন্তাসূত্রের প্রবক্তা। তিনি মানুষ ও প্রাণি জগতের বিভিন্ন আচরণের পশ্চাতে উত্তেজনা বা stimulus ও প্রতিক্রিয়া বা response এই দুই কেন্দ্রীয় ধারণার কথা বলেন। এই সময় বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীরাও এই আচরণবাদের নিরিখে ভাষা ব্যবহারকে দেখতে চাইলেন।

ভাষাবিজ্ঞানী লিয়ঙ্গ ভাষা ব্যবহারকে প্রতিক্রিয়ার ফল বলছেন।^৪ রুমফিল্ড ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় আচরণবাদের সংযুক্তি ঘটালেন যা পরবর্তীকালে অনেককেই অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু রুমফিল্ড তার সমকালীন মনোবাদী ভাষাবিজ্ঞানীদের তুলনায় কিছুটা আলাদা হয়ে যান তার তত্ত্বে। মনোবাদীদের মতে, শব্দ ও অর্থের যে যোগ মনের ক্রিয়া তার মধ্যেই। কিন্তু রুমফিল্ড মনে করেন, বস্তুজগৎ সম্পর্কে আমাদের সামগ্রিক জ্ঞান না থাকলে ভাষার পূর্ণ অর্থ আয়ত্ত হবেনা।

পরবর্তীকালে স্কিনার 'sign' এবং 'symbol' এই দুটো শব্দকে বাতিল করবেন ভাষার ক্ষেত্রে এবং উত্তেজনা – প্রতিক্রিয়াকেই ভাষা ব্যাখ্যা করতে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপিত করতে চাইবেন।^৫

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই ব্যাকরণচর্চা ভাষাবিজ্ঞানের structuralism এ নতুনভাবে দিশা পায়।

৫. গঠনগত শব্দার্থতত্ত্ব (Structural Semantics)

ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে যে ধারণার সঙ্গে বিশ্বকে পরিচিত করান তা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারায় নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছাত্র শার্ল বালি এবং আলবেয়ার সেশেহায় তাঁর আলোচনার এক সংকলন বের করে, যার নাম ছিল ‘Cours de Linguistique generale’.

তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার (Diachronic) বাইরে এককালীন (Synchronic) ভাষাচর্চার কথা বলেন, যেখানে ভাষার পরিবর্তনের কথা ব্যতিরেকে একটি বিশেষ কালের ভাষার রূপ নিয়ে চর্চা করা যাবে। এছাড়া তিনি লা পারোল (La parole) এবং লা লাঙ (La langue) বলে আরো দুটি বিষয়ের ধারণা দিলেন। লা পারোল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক মুখের ভাষা আর লা লাঙ ভাষার সামাজিক রূপ আর তাই তা বিমূর্ত, ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে তা প্রতীক রূপে অবস্থান করে।

এই লা লাঙ এর আলোচনা এককালীন ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় হতে পারে। কারণ এর মধ্যেই থাকে ভাষার মূল সূত্রগুলো। প্রথমত ব্যাকরণের যে আলোচনা প্রাচীনযুগে ছিল, সেই আলোচনাও এই এককালিক। একটি ভাষার বিশেষ পর্বের পরিচয় এই এককালীন ভাষাচর্চার মাধ্যমেই আসতে পারে।

এর সঙ্গে তিনি জানালেন লা লাঙ হল সংকেত বা চিহ্নের সমাহার। এই সংকেত বা চিহ্ন শুধু বস্তুকে বোঝাতে নয় কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা অনুভূতি বা প্রত্যয় জানাতেও

ব্যবহৃত হয়। এই ধারণাগুলোকে তিনি বলবেন signified আর তাদের জন্য নির্ধারিত শব্দকে বলবেন signifier.

আধুনিক শব্দার্থতত্ত্ব সম্পর্কে যা একেবারে গোড়ার কথা হয়ে থাকবে। সোস্যুরের ভাষা সম্পর্কে এই অবস্থান শব্দার্থতত্ত্বকে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে যুক্ত করে। শব্দ-প্রতীকগুলির সঙ্গে তারা যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় তাদের সম্পর্ক একেবারেই আপাতিক।

সিনট্যাগমেটিক, প্যারাডিগমেটিক (*Syntagmatic, Paradigmatic*)

আমাদের ভাষার মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের অভিযুক্ত সাপেক্ষে syntagmatic বা আন্বয়িক সম্পর্ক এবং paradigmatic বা নিদর্শনী সম্পর্কের ধারণা দিয়েছেন। অর্থ বা রূপের দিক থেকে প্রত্যেকটি উপাদান প্রত্যেকটির সঙ্গে হয় যুক্ত বা যুক্ত নয়। এই দুই প্রকার সম্পর্ককে সোস্যুর ভাষা সংকেতের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষভাবে। ভাষা সংকেতগুলোর আসল মূল্য তাদের ধ্বনিসজ্জায় নেই, আছে ভাষার বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্যে।

৬. প্রাগ ও কোপেনহেগেন স্কুল

প্রাগে ট্রুবেসকয় ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা করেন। এই আলোচনায় অনেকখানি আমরা সোস্যুরের মতের সঙ্গে সাযুজ্য পাব। ধ্বনিবিজ্ঞানের কাজ হল কোনো বিশেষ ভাষার ধ্বনির পরিবর্তে সার্বিকভাবে উচ্চারিত স্থান অনুসারে বা উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা। এছাড়া উচ্চারণের সময় স্বরের দৈর্ঘ্য, স্বরগ্রাম স্বরভক্তি নিয়েও আলোচনা করে ধ্বনিবিজ্ঞান। স্বর ও ব্যঞ্জন - মূলত এই দু'ভাগে মূলত ধ্বনিগুলোকে ভাগ করা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের এই আলোচনায় শব্দের বা ভাষার অর্থের দিকটি গুরুত্ব পায় না, ধ্বনির বাহ্যিক রূপের প্রতিই তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি।

অন্যদিকে সোস্যুর যেভাবে ‘লা পারোল’ এবং ‘লা লাঙ’ এর মধ্যে বিভেদ করে তাদের জন্য চর্চার ক্ষেত্র পৃথক রেখেছিল সেইভাবে ধ্বনিবজ্ঞান থেকে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্র পৃথক করা হল। ধ্বনিতত্ত্বে গুরুত্ব পেল ধ্বনির বৈপর্য্যের ফলে অর্থে ভিন্নতা আসার বিষয়টি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

কাল (kal)

খাল (khal)

ডাল (dal)

উচ্চারণের সাপেক্ষে ধ্বনিগুলির স্ব-লক্ষণের (distinctive features) ভিত্তিতে স্বনিমের ধারণা দেন ইয়াকবসন। এই স্বনিমের ভিন্নতার ফলে শব্দের অর্থ বদলে যায়। এই ধারণাটি ধ্বনিতত্ত্বে গুরুত্ব পেল।

প্রাগগোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানীরা উচ্চারিত ধ্বনিগুলিকে ‘লা পারোল’ এর অন্তর্গত করলেন আর ফোনিম বা স্বনিমকে ‘লা লাঙ’ এর অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করলেন। অনেকেই স্বনিমকে মনস্তাত্ত্বিক সত্তা বা শারীরিক সত্তা বা বিমূর্ত অবস্থা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু ট্রুবেসকয় সহ প্রাগ গোষ্ঠীর ভাষাবিজ্ঞানীরা একে ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিলেন। ব্লুমফিল্ডের পর ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ অবধি ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান সংকুচিত হয়ে গেছিল। অভিজ্ঞতাবাদী বা empiricist রা এই সময় ভাষাকে যান্ত্রিকভাবে দেখতে শুরু করেন যার দার্শনিক সমর্থন পাওয়া যাচ্ছিল পশ্চিমী সভ্যতার কোঁত, জন লক ডেভিড প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তায়। তারা ভাষায় বৈচিত্র্য সন্ধানে প্রয়াসী ছিলেন ; যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা ভাষার পরীক্ষিত তথ্যের বিন্যাস করতে পারবেন বৈজ্ঞানিকভাবে। কিন্তু ভাষার মধ্যে কোনো সার্বজনীনতার ধারণা নিয়ে তখন তাঁরা আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই প্রাগের

ধ্বনিতত্ত্বে তাঁরা কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এঁরা ভাষার থেকে দর্শন বা মনোবিজ্ঞানকে আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন।

কিন্তু এই ঘরানার সীমাবদ্ধতা নজরে আসে। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাচর্চার লক্ষ্য নির্ধারণে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। ভাষার ক্ষেত্রে সীমিত তথ্য পর্যবেক্ষণের বদলে সমস্ত ভাষার সাধারণ সূত্র বা তত্ত্ব নির্মাণে ভাষাবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি পড়ে।

এরপর ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হবে নোয়াম চমস্কির হাত ধরে। চমস্কির আগে হ্যারিস ও হকেট বর্ণামূলক ভাষাবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে ভাষার সমস্ত বাক্য সঞ্জননের নির্দেশাবলীকে একইসূত্রে গ্রথিত করার চেষ্টা করছিলেন। এঁদের থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে চমস্কি তৈরি করে ফেললেন ভাষা সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা, তত্ত্ব। ১৯৫৭ সালে চমস্কির syntactic structures প্রকাশিত হয়। এবং তারপর থেকে একের পর এক বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে সঞ্জননী সংবর্তন ব্যাকরণের ধারণাকে তিনি পরিবর্ধিত ও পরিশীলিত করেছেন।

১৯৬৫ – Aspects of the Theory of Syntax (ST theory)

Extended Standard Theory (EST theory)

Revised Extended Standard Theory (REST theory)

১৯৮১ – ‘Lectures on Government and Binding’

(GB Theory/ Principles and parameter Theory)

১৯৮৬ – ‘Barrier’

১৯৫৫ – ‘The Minimalist Program’

চমস্কি ভাষার সঙ্গে মনস্তত্ত্বকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা দিলেন। মানুষের ভাষা ব্যবহারে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপকে স্বীকার করে নিলেন। বললেন মানুষের ভাষা শেখার ক্ষমতা সহজাত। ভাষার একটি সার্বজনীন সূত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কাঠামোতে তিনি ভাষার অর্থবোধকেও গুরুত্ব দিলেন।

সঙ্গননী ব্যাকরণের শুধু অধিগঠনের স্তরে প্রথমে শব্দার্থতত্ত্বের স্থান হলেও EST তে চমস্কি দেখালেন অধগঠন ও অধিগঠন উভয়স্তরেই শব্দার্থতত্ত্বের ধারণা নিহিত থাকে।

৭. শব্দার্থতত্ত্ব স্বতন্ত্র ও একক শাখা হিসেবে

প্রথাগত ব্যাকরণের বিভিন্ন স্তর থেকে ভাষাবিজ্ঞানে উত্তরণের নানা পর্যায়ে শব্দার্থতত্ত্ব তার নিজের জায়গা করে নিয়েছে কখনো সংকুচিতভাবে, কখনো তা গুরুত্বপূর্ণও হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোনো ধারাই শব্দার্থতত্ত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনি। ভাষার উৎপত্তি ব্যবহারে শব্দার্থতত্ত্ব সর্বত্র স্বমহিমায় অবস্থান করেছে। তবে শব্দার্থতত্ত্ব একক ও স্বতন্ত্রভাবে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করেছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর উনিশ শতকের আগে নয়। উনিশ শতকের আগে মূলত শব্দার্থতত্ত্ব দর্শন ও যুক্তি এই দুই ধারার বড়ো রকম প্রভাব দেখা যায়।

জার্মান সাহিত্য সমালোচক সি সি রাইজিক [Reisig] ১৮২০ সালে চিহ্নতত্ত্ব (semiology) নামে এক পৃথক ধারার কথা ভাবেন যেখানে শব্দার্থতত্ত্বের বিকাশের ধারা ও নীতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। ১৮৮৩ সালে মিশেল ফরাসী ভাষাবিজ্ঞানী ব্রেইল ‘semantics’ শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি অর্থ পরিবর্তনের কারণ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে ভাবেন। ১৮৯৭ সালে শব্দার্থতত্ত্বের ধারায় ব্রেইলের গুরুত্বপূর্ণ বই ‘Essai semantique’ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ধারায় শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনাতেও আমরা দেখব, এখানে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের সার্বজনীন নিয়ম নির্ধারণে ব্রতী হচ্ছেন

ভাষাতাত্ত্বিকেরা। ব্রেইলের এই বইও সেই অনুসন্ধানের কথা বলে। ব্রেইল বৈশেষিকতা বিভেদত্ব, ক্রমিকতা ইত্যাদি সূচকের কথা বলেন যার সাহায্যে অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাসের গভীরে যাওয়ার সার্বজনীন সূত্রের আভাস পাওয়া যায়। (শিশিরকুমার দাসঃ ভাষা জিজ্ঞাসা) এছাড়া তিনি শব্দের সাধারণ ও বিশেষ অর্থের কথা বলেন। এক এক ভাষায় তাদের গুরুত্ব এক এক রকম। এছাড়া ব্রেইল সমার্থক শব্দ সম্পর্কেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, যা পরবর্তীকালেও শব্দার্থতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হয়ে আছে। তিনি law of distribution এর কথা বলেন। অর্থাৎ, ততক্ষণ পর্যন্ত দুটি শব্দকে আমরা সমার্থক শব্দ বলব, যতক্ষণ একে অপরের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। এছাড়া অনেকার্থবাচক ও একধ্বনি বলে শব্দের আরো দুটি শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন ব্রেইল। ব্রেইলের শব্দার্থতত্ত্বের এই আলোচনায় মনোবিজ্ঞান দর্শন যুক্তি ও রেটোরিকের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়ে একে একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে সাহায্য করে।

সেইসময় ইংলিস্ট ট্রায়ার ‘শব্দ পরিমণ্ডল’ নামে একটি নতুন বিষয়ের ধারণা দিলেন যাকে বিংশ শতাব্দীতে স্টিফেন আলম্যান আরো সূক্ষ্মরূপ দিয়েছিলেন।

শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনার একটা দীর্ঘধারা রোমানিয়াতে অনেকদিন ধরেই ছিল। দিমিত্রে কান্টেমের [Dimitrie Cantemir] ‘categorematic’ ‘syncategorematic’ এই দুইভাবে শব্দের শ্রেণিবিভাগ করেন যা সেইসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল তাত্ত্বিকদের কাছে। রোমানিয়ান ফিলোলজিস্ট বি পি হাসদেও [Bogdan Petriceicu Hasdeu] লেক্সিকোগ্রাফির চর্চাকে খুবই উচ্চস্তরে নিয়ে যায়। ‘*Magnum Etymologicum Romaiae*’ নামে তাঁর বই লেক্সিকোগ্রাফিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত। ১৮৮৭ সালে ব্রেইলের ১০ বছর আগে ‘*Incercare asupra semasiologiei limbei romane. Studii istorice despe*

tranzitiunea sensurilor' নামে প্রকাশিত 'Lazar Saineanu' এর এই গ্রন্থটিকে শব্দার্থতত্ত্ব নিয়ে আলোচিত প্রথম গ্রন্থ বলে ধরা হয়।

এরপর ১৯১৬ সালে সোস্যুর এর অবদান যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তা শব্দার্থতত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এরপর শব্দার্থতত্ত্ব নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়—

১। Jost Trier – *Der Deutsche Wortschatz im sinnbezink des Verstandes* (1931)

২। G.Stern – *Meaning and change of meaning* (1931)

৩। C.K.Ogden and J.A.Richards – *The meaning of Meaning* (1923)

জস্ট ট্রাইয়ার (Jost Trier) এর গ্রন্থে হামবোল্টের ভাষার ধারণার প্রভাব খুবই প্রকট। এছাড়া সোস্যুরের ভাষার সূত্র নীতির একধরনের প্রয়োগ ঘটানোরও চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে প্রথম শব্দকোষগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রত্যেক শব্দকোষের জন্য নির্ধারিত কক্ষ তাদের অর্থ নির্ধারণে সহায়তা করে বলা হয়। শব্দগুলোর অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে বোঝার চেষ্টা করা হয়। এখানে শব্দার্থতাত্ত্বিক শ্রেণি নির্ধারণ করে তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। শব্দার্থতত্ত্বের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি তাই খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

গস্টভ স্টার্ন মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে অর্থ পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা, শ্রেণিবিভাগ এবং কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। অগডেন ও রিচার্ডসের বইয়ের নামকরণই তার বিষয়বিস্তৃ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। শব্দার্থের অর্থ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা শুধু ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকেনি। চব্বিশ

প্রকার অর্থ নিয়ে এখানে কথা বলা হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ১৯৩০ - ১৯৫০ সাল অবধি শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে ততটা গুরুত্ব পায়নি। এইসময় শব্দার্থতত্ত্বকে ভাষার বাইরের বিষয় বলে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়েছে। রসায়ন পদার্থবিদ্যা সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রেখে ভাষাকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর হকেটের তত্ত্বে (১৯৫৮) শব্দার্থতত্ত্বের স্থান হলেও তা শব্দার্থতত্ত্বের সংকটকে খুব বেশি অতিক্রম করতে পারেনি।

স্ট্রাকচারালিসম বা গঠনমূলক ভাষাবিজ্ঞান বা আরো বিশেষভাবে বলতে গেলে আমেরিকার বর্ণামূলক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্বহীন বলে মনে করা হয় এবং ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য গবেষণার ধারাকে এর থেকে দূরে রাখা হয়। কিন্তু শব্দার্থতত্ত্বকে বাদ দিয়ে ভাষার আলোচনা অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত। ১৯৮০ সালে মনোভাষাবিজ্ঞানের দিক থেকে মেটাফরিকাল বা রূপকধর্মী শব্দের ভিত্তিতে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা পাই ল্যাকঅফ ও জনসন এর আলোচনায়। এদের তত্ত্ব চমস্কির শব্দার্থতত্ত্ব সম্পর্কে মতামতের বিরুদ্ধতা করল। চমস্কি অর্থকে মনের ভাষাকে cognitive competence থেকে আলাদা করে দেখতে চাননি। কিন্তু এখানে তা থেকে বিযুক্তভাবেই শব্দার্থতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানী লিচ শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনাকে এককভাবে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে না দেখে ভাষাবিজ্ঞান দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সহায়তায় দেখার কথা ভাবেন। বর্তমানে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনায় মাল্টিডিসিপ্লিনারি ভাবনা ও দৃষ্টিকোণের উপর জোর দেওয়া হয়।

৮. শব্দার্থতত্ত্বের সাধারণ ধারণা

শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics এর আলোচনার সঙ্গে pragmatics এর ধারণা খুবই নিবিড়। সামাজিক সংযোগ সাধনের জন্য ভাষার নিয়ম নীতি ও সমস্যার দিকটি pragmatics এর আলোচনার বিষয়। pragmatics এর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কো-অপেরাটিভ প্রিনসিপল (co-operative principle)। এখানে বলা হয় যদি কোনো পরপর যুক্তি পরস্পর দিয়ে একটি কথোপকথন গড়ে ওঠে তবে তা অবশ্যই সেই কথোপকথনের মধ্যে স্থিত কথা বা utterance গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকবে। এছাড়া polite principle এ আলোচনা করা হয় সামাজিকভাবে কোনো ঠিক ভুল ধারণার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক মনে করেন কেউ যাওয়ার পথে রওনা হলে তাঁকে পিছু ডাকতে নেই, তাতে অমঙ্গল হয়। বা কোনো শোকসভায় ঠাট্টা তামাশা করাটা অশোভন।

শব্দার্থ হল অর্থের অন্বেষণ। শব্দের অর্থ যেহেতু শুধু তার আভিধানিক অর্থ মাত্র নয়, বিচ্ছিন্ন শব্দ সমূহের অর্থ অনেকাংশেই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। ব্যবহারিক জীবনের ভাষা কনটেক্সট সেনসিটিভ। তাই শব্দার্থতত্ত্ব এবং pragmatics একে অপরের পরিপূরক।

আমরা আপাতভাবে, ব্যাকরণগত ভাবে ঠিক বা বেঠিক বাক্যের অর্থ নির্ণয় করতে পারি বলে মনে হয়। কিন্তু শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics এর নিরিখে অনেক অর্থহীন বাক্যকে আমরা খুঁজে পাব যেমন –

ক. তোমার বাবা মায়ের কোন সন্তান আছে?

খ. আমি কাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছিলাম।

গ. আমি সূর্যদোয়ের সময় সূর্যাস্ত দেখেছি।

ইত্যাদি বহু এমন বাক্য আমরা পাবো যার কোনো অর্থ নেই।

শব্দার্থতত্ত্ব বুঝতে তাই ‘Real World’ বা বাস্তব জগৎকে বোঝা প্রয়োজন নাহলে অনেকসময়ই শব্দ বা বাক্য কী বোঝাতে চাইছে তা আমরা বুঝে উঠতে পারব না।

লিচ ৭ প্রকারের অর্থ বা meaning এর কথা বলেছেন। সেগুলি হল—^৬

ধারণাগত অর্থ (Conceptual meaning), গুণবাচক অর্থ (connocative meaning), সামাজিক এবং কার্যকরী অর্থ (social and effective meaning), প্রতিবিম্বিত ও সংস্থাপনগত অর্থ (Reflected and Collocative meaning), সহযোগী অর্থ (Associative meaning: a Summary Term), বিষয়গত অর্থ (Thematic meaning).

উপাদানগত বিশ্লেষণ (Componential Analysis)

কোন শব্দের মধ্যে অবস্থিত ছোটো ছোটো উপাদানকে ভেঙে ফেলে একটা শব্দের বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনাকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয় একইসঙ্গে সেই শব্দ আর কী কী হতে পারে না তাও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়।

যেমন নারী = -পুরুষ+ প্রাপ্তবয়স্ক+মানুষ

পুরুষ = - নারী+ প্রাপ্তবয়স্ক+মানুষ

কুকুর = - মানুষ+ মাংসাশী+ শ্বাপদ+ লেজযুক্ত+

ইত্যাদি।

বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)

যদি একটি শব্দ আর একটির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে Antonyms বা বিপরীত শব্দ বলা হয়।

চার রকমের বিপরীত শব্দ পাওয়া যেতে পারে, যেমন—

ক. Binary opposites

খ. Gradable oppositions

গ. Converse terms

ঘ. Multiple incompatibles

লিচ ‘শ্রেণিবিন্যাসগত বৈপরীত্য’ (‘Taxonomic Oppositions’) কে চারভাবে দেখিয়েছেন।

যথা-

১। বাইনারি টেক্সনোমি/ শ্রেণিবিন্যাস (Binary taxonomy)

যদি দুটো শব্দ সম্পূর্ণভাবে বিপরীতার্থক হয়, অর্থাৎ একটির অনুপস্থিতি আর একটি নিশ্চিতভাবে বোঝায়, মাঝে অন্য কোন সম্ভাবনা থাকেনা তাদের binary taxonomy বলা হয়ে থাকে। যেমন জন্ম; মৃত্যু,

২। মেরুকরণ বা Polarity.

কিছু কিছু শব্দ বিপরীত কিন্তু বাইনারির মতন নয়। যেমন – গরিব, ধনী ; যুবক, বৃদ্ধ ; বড়ো, ছোটো ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাব মাঝামাঝি অনেক অবস্থান থাকতে পারে। বড়ো আর ছোটোর মধ্যে বা গরিব আর ধনীর মধ্যে অনেক অবস্থান আছে। লীচ এখানে বলবেন যে এখানে অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন শব্দের পরিমাপ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ,

ধনী বলতে আমরা কতটা ধনী বুঝব বা গরিব বললে কাকে গরিব বলব, এই সমস্ত বিষয়ের সংজ্ঞা ও সীমারেখা নির্ণীত হবে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট স্থান ও অবস্থা অনুসারে।^৭

এছাড়া লিচ ৩। বহুবিধ শ্রেণিবিন্যাস (Multiple taxonomy), ৪। আপেক্ষিক বৈপরীত্য (Relative Oppositions) ৬। বিপরীত বর্গ (Inverse Oppositions) ইত্যাদির উল্লেখ করে বিভিন্ন শব্দের একাধিক শ্রেণিবিন্যাসের কথা বলেছেন যা তাদের অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয়।

প্রতিশব্দ (Synonym)

প্রায় সব ভাষাতেই প্রায় কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যাদের প্রতিশব্দ বলা হয়। বাংলা ভাষাতেও এরকম অনেক শব্দ আছে। যেমন—

স্বাধীনতা- মুক্তি

হাওয়া – বাতাস, মলয়, সমীর

মাতা- মা, জননী, গর্ভধারিণী, প্রসূতি, প্রসবিনী

কিন্তু বাক্যে এদের ব্যবহার খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারব, সব প্রতিশব্দ সবসময় পুরোপুরি অর্থবাচক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনুকম্পা, দয়া সমবেদনা সহানুভূতি সমজাতীয় অনুভূতির কথা বললেও এরা পরস্পর পরস্পরের স্থানে বসতে পারে না।

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Homonyms)

প্রায় সব ভাষাতেই এমন কতগুলো শব্দ আছে যাদের উচ্চারণ এক বা প্রায় এক, কিন্তু অর্থ আলাদা। তাদের Homonyms বা সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বলা হয়।

বাংলা ভাষাতেও এই ধরনের শব্দ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। যেমন-

শর – তীর বিশেষ

ষড় – ছয়

সর – দুধের সর

স্বর – গলার আওয়াজ

শব – মৃত দেহ

সব – সমস্ত

অন্ন – ভাত

অন্য – অপর

হাইপোনিমি (Hyponymy)

কোন কোন শব্দের সঙ্গে অন্য একটি শব্দ আন্তঃশ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে। দুটো শব্দের মধ্যে যখন একটিকে অন্যটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় বা একটি শব্দ একটি বড় শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে আর অন্য শব্দটি তার উপবিভাগ হিসেবে গণ্য হতে পারে তখন তাদের সম্পর্কে হাইপোনিমি বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ চাদর; শীতবস্ত্র, টেলিফোন; প্রযুক্তি, পার্লে জি; বিস্কুট, ইত্যাদির সম্পর্ক Homonymyর। খুব স্বাভাবিকভাবেই Hyponymy শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন শব্দের মধ্যে এক ধরনের উচ্চ-নিম্ন স্তরের সম্পর্ক পাওয়া যাবে।

কথন-ক্রিয়া তত্ত্ব (Speech Act theory)

Austin এর বই How to do Things with Words এ দেখান, কিছু নির্দিষ্ট কথা বলা আসলে কিছু Action বা কাজকেই সরাসরি প্রতীকায়িত করে। যেমন যখন আমরা বলি, আমি শপথ করছি বা প্রতিজ্ঞা করছি বা যদি ধরি, মুসলিম বিয়েতে যখন পাত্র পাত্রী বলে

‘কবুল’ তা আসলে তাদের বিয়ে বা পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়। এইরকম বিভিন্ন utterance ভাষার মধ্যে দিয়ে কোন বিশেষ কার্জকে সূচিত করে। এইভাবে কথার মধ্যে দিয়ে semantics বা শব্দার্থতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭৫ এ Searle ৫ ধরনের এইরকম বিশেষ speech act এর শ্রেণিবিভাগ করেছেন।

গ্রিস বলেন যে আমাদের সাধারণ যে শব্দার্থতত্ত্ব তা অনেকসময়ই NL বা natural language কে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়, পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে গেলে সামাজিক ‘co-operative principle’কে আমাদের বুঝতে হবে।

৯. শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার জগৎ

Object Language বা বিষয়ীভূত ভাষা ও Meta Language বা অধিভাষা

অভিধান সবসময় কোনো একটি শব্দের প্রসঙ্গ বা প্রেক্ষিত নিরপেক্ষভাবে তার অর্থ প্রদান করে। কিন্তু কোনো বাক্য বা কথার অর্থ তখনই বোঝা যাবে যখন বক্তা কোন প্রসঙ্গে কোন সময়ে কথাটি বলছে তা জানা যাবে। শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics এর পরিভাষায় তাকে $M_{w,t}$ (ভাষাবিশ্ব ও সময়ের মডেল) বলা হয়ে থাকে।

যেখানে, M = model, W = world, T = time কে বোঝানো হয়।

এই model of world and time অর্থাৎ বিশেষ ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ স্থান ও সময়। আমাদের বলা কথা বা ভাষা কে বলা হয় Eo বা expression of object language যা সবসময় natural language। আর এই Eo র ভাষাকে Em বা expression of meta language এ অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক বা যিনি এই ভাষাটা বুঝতে চেষ্টা করছেন তার সেই শব্দ বা ভাষা সম্পর্কে ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বক্তা যে কোনো সময়ের ও যে কোনো পৃথিবী বা স্থানের কথা বলতে পারে। সেটা বর্তমান সময়ের হতে

পারে, কোনো রূপকথার গল্পের হতে পারে, অতীত ভবিষ্যতের, সাহিত্যের কোনো বিষয় বা কোন চরিত্র নিয়ে বলতে পারে। শিল্পকলা আলোকচিত্র বা যা কোথাও কখনো অবস্থান করে না এরকম অলীক অসম্ভব বিষয় নিয়েও কথা বলতে পারে। সময়েরও নির্দিষ্ট কোনো সীমানা নেই।

আমরা ভাষার যে আভিধানিক অর্থ পাই, তা decontextualized। কিন্তু তাতে নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বা context এ কোন শব্দ বা বাক্যের কী অর্থ তা সবসময় নাও বোঝা যেতে পারে। কিন্তু আদর্শ শব্দার্থতত্ত্ব ভাষার অর্থ এবং ধ্বনিতত্ত্বকে বিযুক্ত করে দেখে না। ভাষার ব্যাকরণের দিকেও তার মনোযোগ থাকে। এছাড়া কোনো ভাষাব্যবহারকারীর সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও শব্দার্থতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত থাকে। শব্দার্থতত্ত্ব শুধু মানুষের ভাষার অর্থ নয় মানুষের ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান ধারণা উপলব্ধিকেও নির্দেশ করে কারণ ভাষার অর্থ অনেকসময়ই ব্যবহারকারীর ভাষাবোধের প্রতিফলন।

বাচনিক শব্দার্থতত্ত্ব বা Discourse Meaning

কোন একটি বাচনের অর্থ সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে হলে বক্তা ও শ্রোতা যে মানসিক জগতে বিচরণ করে অর্থাৎ যে world এবং time এ অবস্থান করে সেটাকে বোঝা প্রয়োজন। শব্দার্থতত্ত্ব নিশ্চয় তার বিভিন্ন তত্ত্বকে ব্যবহার করবে সম্পূর্ণ অর্থ উদঘাটনে কিন্তু বক্তা শ্রোতার মানসিক জগৎকে অনুবাদ করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবসময়।

Expression of object language (E_o)

সেন্স (Sense)

যেকোন শব্দের expression এ তাঁর অভিধানগত যে অর্থ পাওয়া যায় তাতে তার সেই ভাষায় সেই শব্দের যে বিভিন্নরকম ব্যবহার ও সেই অনুসারে তার অর্থ থাকে তা বাদ পড়ে

যায়। যেমন যদি, উদাহরণ স্বরূপ বলি, বাংলায় গাছ, হিন্দিতে পেড় ইংরেজিতে Tree এদের সমার্থক মনে হলেও গাছ পেড় ও ট্রি বলতে যা বোঝায় তা পুরোপুরি এক নয়।

রেফারেন্স (Reference)

‘আমি পুতুলটা হারিয়ে ফেলেছি আজ’ – এই বাক্যটির সাধারণ অর্থ বা sense হল যে – বক্তা পুতুলটা হারিয়ে ফেলেছে যেদিন বক্তা এই কথাটা বলছে। কিন্তু এই বক্তা কোন রূপকথার বা কাল্পনিক চরিত্র কি না, এই পুতুলেরই বা কী তাৎপর্য তা বিস্তারিত জানতে সেই $M^{w,t}$ এর সঠিক তথ্য জানা দরকার।

Keith Allan জানাচ্ছেন যে e বা বক্তা যখন তার মনের কথা প্রকাশ করছেন তখন তিনি নির্দিষ্টভাবে একটি স্থান বা ঘটনা সময় বা বিষয়ের কথা বলেন। আর সে সমস্ত কিছুই বক্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বক্তা নিরপেক্ষ নয়। একটি নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানকে তা ধারণ করে থাকে।^৮

ডিনোটেশন (Denotation)

বক্তার বলা যেকোনো ভাষা বা E_L এর সঙ্গে সেই সময় ও ওয়ার্ল্ড বা পৃথিবীর যে সম্বন্ধ, তা শুধু আমাদের এই বাস্তব জগত বা সময়ের বাইরেও যেকোনো সময় ও ওয়ার্ল্ড এর কথা হতে পারে।^৯

এক্সটেনশন, ইন্টেনশন (Extension, Intention)

বক্তার কথা বা E_0 কোন নির্দিষ্ট সময় বা গণ্ডিতে বাঁধা না থাকতে পারে। Sense এর সঙ্গে Intention এর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। Sense কে E_m বা metalanguage র মাধ্যমে বোঝানো হয়। যদিও Intension sense এর সঙ্গে প্রায়শই অবিচ্ছদ্যভাবে থাকে। কিন্তু

intensions are the content of concept (encyclopedia of semantics page;

৪) . বক্তা একটি নির্দিষ্ট সময় ও ওয়ার্ল্ড কে Intension এর সাহায্যে সূচিত করতে চেষ্টা করে।

যেকোনো E_o এ যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় ও ওয়ার্ল্ড এর ($M^{w1,t1}$) জন্য Extension থাকে তবে সেখানে Intension ও থাকবে। তবে অনেকসময় এমন হতে পারে যে দুটো পৃথক E_L এক্সপ্রেশন বা E_L এর Extension একটি নির্দিষ্ট জগত ও সময়ের জন্য (ধরা যাক তা ($M_{w1,t1}$) না থাকলেও অন্য কোন model of time and world ($M_{w2,t2}$) এ তার Extension আছে। আর সেই Extension-ই সেই নির্দিষ্ট জগত ও সময়ের Intension কে নির্ধারণ করবে। Intension সবসময়ই ভাষার অর্থের একটি বিমূর্ত রূপ। কোন বিষয় সম্পর্কে সঞ্চিত এই বিমূর্ত জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কের কগনিটিভ এলাকায় ধরা থাকে। তাকেই চমস্কি আমাদের ভাষা সম্পর্কে মস্তিষ্কে সঞ্চিত জ্ঞান বা Competence বলেছেন তার সঞ্জননী সংবর্তনী ব্যাকরণের ধারণায়। আরও একটু এগিয়ে বলা যায় তাই আসলে আমাদের ভাষার অধোগঠন বা Deep structureকে সূচিত করে। সেখানেই ধরা থাকে আমাদের ভাষা, অর্থ সম্পর্কিত বোধ।

টটোলজি (Tautology)

যখন একটি বাক্যের একটি clause এর অর্থ সেই বাক্যের আর একটি clause এ প্রকাশিত হয় তাকে ভাষাবিজ্ঞানে Tautology বলা হয়ে থাকে। যেমন-

যে ব্যক্তি বিবাহিত তার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে।

৫ সংখ্যাটি ৪ এর পরে ও ৬ এর আগে।

গরু একটি তৃণভোজী প্রাণী।

এই সমস্ত বাক্য গুলোতে আমরা দেখি, ৫ সংখ্যাটি নিজেই তার ক্রমিক সংখ্যা জানায়, ৪ এর পরে ও ৬ এর আগে এইটা ৫ এর অবস্থান বলার মধ্যেই ধরা থাকে। বিবাহিত হতে গেলে বিয়েটাই আবশ্যিক শর্ত। আবার গোরু শব্দের অর্থের মধ্যেই তৃণভোজী প্রাণী থাকে। এই বাক্যগুলি তাই সব সময়ে সব জগতের জন্যই সত্য।

বাক্যে যখন Extension অনুপস্থিত থাকে বা অনিশ্চিত থাকে

1. God is good
2. God does not exist.

প্রথম বক্তার মানসিক জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সে ঈশ্বরের Extension আছে বিনা দ্বিধায় জানে। সে ঈশ্বরের একটু গুণ ‘ভালো’ এই অভিমত প্রকাশ করেছে। কিন্তু দ্বিতীয় জন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। আপাতভাবে মনে হতে পারে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মানসিক জগতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যার কোন অস্তিত্ব নেই তার সম্পর্কে কোন কথাই ধারণাই করা যায় না। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে যে প্রথম ব্যক্তি বা অন্য অনেকের জন্য অনেকের ধারণায় ঈশ্বরের Extension আছে। এই অন্যদের চিন্তায়, ভাবনায় ঈশ্বরের Extension থাকার সঙ্গে সে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছে।

এইরকমভাবে, আমরা দেখতে পাব আমাদের অজস্র বাক্যের মধ্যে Extension থাকে আপাতভাবে মনে না হলেও। semantics আমাদের মনোজগতের সেই সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করতে সাহায্য করে থাকে।

Model of world and time ($M^{w,t}$) বা স্থান ও কালের নকসা বা মডেল

‘Language and Mind’ গ্রন্থে চমস্কি বলছেন—^{১০} মানুষের ভাষা আসলে মানুষেরই নির্যাস। মানুষের অস্তিত্ব তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা থেকে অবিচ্ছেদ্য মানুষের ভাষা।

মানুষের ভাষা মানুষের মনের ভাবনার চিন্তার বাহক। চমস্কি তাই ভাষাকে ‘instrument’ বলবেন। প্রতিটি একক ব্যক্তি মানুষের চিন্তা, মনন, অনুভূতির স্বতন্ত্র জগতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বাক্যের উদ্ভব ঘটে থাকে যা ভাষার নিজস্ব নিয়ম কানুন মেনে তৈরি হয়েও স্বাধীন এবং অনন্য। আমরা একটু ভেবে দেখলে বুঝব, বিভিন্ন ব্যক্তির বলা একই বাক্য বা একই শব্দও সবসময় তাদের নিজেদের কাছে বা শ্রোতার কাছে ঠিক একই অর্থ প্রকাশ করে না। সেই বাক্য বা শব্দের কনটেক্সট ছাড়া শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থ তাদের সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করতে অসমর্থ। কনটেক্সট এর সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে থাকে বক্তার নিজস্ব মানস জগতও।

ভাষাবিজ্ঞান সহজভাবে বললে মানুষের মনস্তত্ত্বেরই একটি অংশ। ভাষাবিজ্ঞান আসলে মানুষের মানসিক সক্ষমতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে এই সক্ষমতা কীভাবে ভাষায় প্রকাশ পায় তা বিশ্লেষণ করা হয়। ভাষার অর্থ তাই বক্তার মনস্তাত্ত্বিক সফর ব্যতিরেকে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বক্তা, কনটেক্সট এবং তার সময় ও পরিবর্তনশীল। কোনো ভাষার অর্থের বিভিন্ন সূচককে আমরা Model of world and time ($M^{w,t}$) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি।

স্থান এবং সময় শব্দের অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন স্থান কালে অর্থের ব্যঞ্জনা পালটে যায়। রূপকথার জগৎ, সিনেমা-সাহিত্যের জগৎ, কবিতার জগৎ বা আমাদের দৈনন্দিন যাপনে সব শব্দ বাক্য বাচন একই অর্থ বয়ে আনে না। আবার আমাদের এই বাস্তব জগত – সেখানে আমাদের স্বতন্ত্র পরিচিতির বিভিন্ন কৌণিক বিন্দুতে যে আমাদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন তাও আমাদের মানসিক জগতকে নির্মাণ করে। এই মহাবিশ্বে আমাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র ও অনন্য আইডেন্টিটি আছে। আর তা আমাদের সামাজিক বিভিন্ন অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশের সমন্বয়ের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। আলাদা আলাদা পরিচিতি বিন্দুর যে বৃত্তে আমরা একসঙ্গে জোটবদ্ধভাবে যারা অবস্থান করি তাদের মানসজগতের মধ্যে সেই বৃত্ত অনুসারে

আবার অমিলের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মিলও পাওয়া যাবে। যেমন ধরা যাক, ভারতবাসীর পশ্চিম দিক আর আরবের মানুষের পশ্চিম দিক একই দিককে বোঝাবে না। পাঞ্জাবি ভারতীয় আর বাঙালি ভারতীয় প্রাতরাশের খাবার বলতে একই জাতীয় খাদ্য বুঝবে না। একজন নারী পুরুষের কাছে ভারতীয় সমাজে বিবাহ কথাটিও একই তাৎপর্য বয়ে আনবে না। কিন্তু ভারতের সময় সমস্ত ভারতবাসীর জন্য একইরকম। কিন্তু অন্য অনেক দেশের সঙ্গে সেই সময়ের ধারণা মিলবে না। ভারতের যেকোন জায়গায় যখন দুপুর ২ টো তখন আমেরিকা বা রাশিয়ার সময় এক থাকবে না। এরকমভাবে আমরা বিভিন্ন বৃত্ত পাব যাদের Linguistics competence এ আমরা কিছু যৌথতার সূত্রও খুঁজে পাব। কিন্তু সেখানেও World এবং Time গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই world and time এর sense, Extension, Intension Denotation নিয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। যা সামগ্রিকভাবে এই Model of world and Time কে ব্যখ্যা করে শব্দার্থকে ব্যখ্যা করতে পারে।

ভাষা আমাদের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম। আমাদের ভাবনা চিন্তার বা যে কোনো বিষয়বস্তু Expression বা প্রকাশ ঘটে যে ভাষার মাধ্যমে তাকে Expression of object language বা E_o বলে। এই ভাষা আমরা আমাদের স্বাভাবিক বা Natural language এর মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি। এই E_o কেই শ্রোতা মস্তিষ্কে অনুবাদ করে থাকে – E_m বা Expression of meta language এ। [Keith Allan] অনেকসময়, বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কালগত ও স্থানগত (সাংস্কৃতিক, সামাজিক ধর্মীয়, আনুষ্ঠানিক, শিক্ষাগত যোগ্যতার বা সামাজিক যে কোন বিষয়ের স্তরভেদ) পার্থক্য থাকলে শ্রোতা বক্তার object language এর যথাযথ ব্যঞ্জনা অনুধাবন করতে পারেনা। বক্তার World এবং Time এর সঙ্গে শ্রোতার পরিচয় না থাকলে তা ঘটতে পারে।

E_0 শুধুমাত্র Natural language এই ব্যক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু E_0 র বক্তব্য বা অধিভাষা অনুধাবন করতে গিয়ে তাকে অনেকসময় বিধিবদ ভাষা বা Formal language দিয়েও প্রকাশ করা হয়। E_m তাই natural language বা Formal language বা কৃত্রিম উভয়ই হতে পারে। বক্তা যে কোন সময়ের যেমন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কাল্পনিক রূপকথার বা অসম্ভব কোন সময়ের বা ওয়ার্ল্ড এর কথাও বলতে পারে। অধিভাষা বা শব্দার্থতত্ত্বকে সেই সমস্ত world ও time কে ব্যাখ্যা করতে হয় তার Meta language এ। কোন object language এর অর্থ শুধু তার শব্দের মধ্যেই ধরা থাকে না। শব্দের অধিধ্বনি, বলার সময়ের বক্তার body language বা শারীরিক ভাষা, সময়, Tone, stress, বলার সময়ের যতিচিহ্নের ব্যবহার, pause বা বিরতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুই শব্দার্থ বা অধিভাষার উপাদান থাকে।

ভাষাবিজ্ঞানী উদয়কুমার চক্রবর্তী সাহিত্যের ভাষার object language নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, $E_0 = E_m$ এক হয়েও যদি পাঠকের মর্মে গিয়ে তা উপলব্ধ না হয় তবে E_m আরো গভীরতর তাৎপর্য বহন করে। সেই অধিভাষার জগতকে তিনি suggestive world বলেছেন।

তিনি প্রস্তাব করেছেন

$$E_0 = E_m / E_{ms}$$

১০. সমাজভাষাবিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে শব্দার্থতত্ত্বের চর্চা

সমাজভাষা বিজ্ঞানের যাত্রাপথ সুসংবদ্ধভাবে শুরু হয়েছে বিশ শতকের ষষ্ঠ শতক থেকে।

Haver C. Currie প্রথম sociolinguistics পরিভাষাটা ব্যবহার করেন। ১৯৭২ সালে লেবোভ বললেন যে ভাষা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু হতেই পারেনা। এরপর ব্রাইট, ফিশম্যান,

আরভিন-ট্রিপ, গ্রিমশ, ট্রাডগিল ও পরে চেম্বার্স এর হাত ধরে সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে। প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক মানুষের অস্তিত্ব, নৃতাত্ত্বিক দিক সমূহ।

ভাষাকে যখনই সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করার চেষ্টা করা হবে তখন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিকই ভাষার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়বে। ভাষা ও লিঙ্গ রাজনীতি তার সমস্যা ও বিভিন্ন দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানে যে খুব বিস্তারিত ও বহুলভাবে আলোচিত হয়েছে এমন নয়। ১৯২২ সালে অটো ইয়েসপার্সন তার ‘LANGUAGE ITS NATURE DEVELOPMENT AND ORIGIN’ গ্রন্থে ‘THE WOMAN’ বলে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই রাখেন মেয়েদের ভাষার বৈশিষ্ট্য, শব্দভাণ্ডার, শব্দচয়ন ও সামাজিক বিভিন্ন ট্যাবু তাদের ভাষাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে তা আলোচনা করার জন্য।

মেরি উলস্টোনক্রাফট *A Vindication of the Rights of Woman* (1792) লেখার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে তথা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় নারীবাদের প্রথম সোপান রচিত হয়। কিন্তু সুসংবদ্ধভাবে নারীবাদী আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে উনিশ ও বিশ শতক অবধি। ভোটাধিকার, সমবেতন, গর্ভনিরোধক ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদি প্রাথমিকভাবে নারীবাদী আন্দোলনের মূল দাবি-দাওয়া ছিল। পরে ধীরে ধীরে তা আরো বিস্তৃত ও বিধৃত হয়। পরিসরেও আসে ব্যাপ্তি। কিন্তু এই সমস্ত আন্দোলনের ঢেউ তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতে আসতে অনেক সময় লেগেছিল।

মূলত সেকেন্ড-ওয়েভ নারীবাদী আন্দোলন থেকে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিসরে ভাষার সঙ্গে লিঙ্গ-পরিচিতি বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। যদিও ভারতে বিশেষত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের বেশ কিছু

গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেও সংখ্যায় ও ব্যাপ্তিতে ভাষার সঙ্গে লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে অনেক গবেষণার ক্ষেত্র পড়ে আছে।

আমরা যদি সংস্কৃত নাটকের সংলাপের কথা ভাবি, সেখানে দেখব নারী পুরুষের সংলাপের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষা নির্বাচন করা হচ্ছে। জেসপার্সন এই প্রসঙ্গে বলেছেন-^{১১} ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যে মেয়েদেরকে প্রাকৃত কথায় বলতে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষেরা তখনকার অপেক্ষাকৃত সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ভাষা সংস্কৃতে কথা বলত। তবে ভাষার এই পার্থক্য শুধু লিঙ্গকে কেন্দ্র করেই ছিল না। সামাজিক পদ মর্যাদা তাদের ভাষাতে প্রতিফলিত হতো। যেমন দেবতা রাজা রাজকুমার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী নৃত্য শিক্ষক বা অধ্যক্ষ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের মুখের ভাষা ছিল সংস্কৃত। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণির ও বিত্তের পুরুষ যেমন দোকানদার, জেলে, মাঝি পুলিশ ইত্যাদি এবং প্রায় সমস্ত মহিলারা প্রাকৃত কথায় বলতো। ফলে সামাজিক পদ মর্যাদার নিরিখে আমরা তাদের ভাষা আলাদা হতে দেখি। এখানে যদিও সংলাপ রচিত হচ্ছে লিঙ্গ পরিচিতিতে মাথায় রেখে নয়, বরং সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদার ভিত্তিতে তবুও একটা বিষয় খেয়াল করার একটা আলাদা লিঙ্গের মানুষের পদমর্যাদা সমাজে কোথায় তা খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে এর সঙ্গে সঙ্গেই।

তবে সমাজভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিসর নির্মাণের আগে থেকেই ভাষার সঙ্গে সমাজের নানাবিধ সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চমস্কি ব্রুমফিল্ড হকেট সোস্যুর প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীরা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের চর্চার পর ভাষাবিজ্ঞানের গতিমুখকেই একপ্রকার পালটে ফেলেন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার হাত ধরে। ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন, বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক আলোচনার পথ পেরিয়ে ভাষার গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা শুরু হল। একে একে ভাষাবিজ্ঞানের নানা শাখা যেমন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান, শৈলী বিজ্ঞান, নৃত্যভাষাবিজ্ঞান, মনোভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটন

প্রথম লিঙ্গ-নির্ভর ভাষার বৈচিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন ও সেখানে নারীর ভাষাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরপর তাঁর সমসাময়িক ভাষাবিজ্ঞানী রচফোর্ড ‘Historic naturalle of morale des lles antilly’ (1665) গ্রন্থে দেখান মেয়েদের ভাষা ব্যবহারে বিশেষ শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশ যা ছেলেরা ব্যবহার করেনা। এরপর ১৯২২ সালে ওটো জেসপার্সন ‘Language, its Nature development and origin’ শীর্ষক গ্রন্থে ‘The women’ বলে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে নারীর ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে মেরি হাস আমেরিকার লুইজিয়ানার কাআসদিদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। ‘Man’s and women’s speech in koasati’ in language in culture and society (1964) নামে গ্রন্থে তিনি নারী পুরুষের পৃথক ভাষা ব্যবহারের দিকটি তুলে ধরেছেন ছয়টা সূত্রের মাধ্যমে। কিন্তু জেসপার্সন কথিত ট্যাবুর ব্যাপারটি নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন ও নারীর ভাষায় ট্যাবুর ব্যবহারকে স্বীকার করতে চাননি। এরপর সমাজবিজ্ঞানী ফিশার বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে নারী পুরুষের ভাষায় উচ্চারণের ভিন্নতার দিকগুলি প্রণালীবদ্ধ করেন।

বাংলায় মেয়েদের ভাষা নিয়ে উইলিয়ম কেরী তাঁর ‘কথোপকথন’ শীর্ষক গ্রন্থের ‘মাইয়া কোন্দল’ অধ্যায়ে মেয়েদের ভাষা ব্যবহার এর বর্ণনা দিয়েছেন। ১৮০১ সালে লেখা এই বইয়ে নারীর কথ্য ভাষার জীবন্ত উদাহরণ আছে। ১৮৭২ সালে সারদাচরণ মিত্র ‘লোকভাষাবিজ্ঞান’ নামক প্রবন্ধে পুরুষ ও নারীর ভাষার ভিন্নতা নিয়ে কথা বলেছেন। সুকুমার সেন এর নারীর ভাষা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ‘women’s dialect in Bengali’ (1928). এরপর ২০০ সালে শর্মিলা বসুর উল্লেখযোগ্য কাজ ‘বাংলায় মেয়েদের ভাষা’ বইটি প্রকাশিত হচ্ছে, যেখানে মেয়েদের ভাষা ব্যবহারের নানা খুঁটিনাটি দিকে খুবই বিস্তারিতভাবে

দেখানো হয়েছে। এছাড়া নারীর ভাষা প্রসঙ্গে উদয়কুমার চক্রবর্তীর ‘নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ’ গ্রন্থে ‘নারীর ভাষা’ শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া নির্মল দাশের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীজগদীশ রায় বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মেয়েদের ভাষা নিয়ে কাজ করে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকাশকান্তি মিদ্যার তত্ত্বাবধানে উত্তর চব্বিশ পরগণার মেয়েদের ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন সাইফুল্লা।

এতো গেল সমাজভাষাবিজ্ঞানে নারীর ভাষা নিয়ে নানা গবেষণার ক্ষেত্রের কথা। কিন্তু আমরা জানি নারীর ভাষা নিয়ে কথা বলতে গেলেও সমাজভাষাবিজ্ঞানের সোসিওলেক্ট পাণ্টে যেতে পারে আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। বয়স পেশা অর্থনৈতিক অবস্থান ধর্ম ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নারীর ভাষাকেও প্রভাবিত করবে বিভিন্ন স্তরে। অর্থাৎ শুধু নারীর ভাষা বলেও আমরা একমাত্রিক কোনো ভাষা বৈশিষ্ট্য উপনীত হতে পারব না।

আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু নারীর ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করাও না। বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বীর মানুষ হলেন হিন্দু ধর্মের। এবং তার পরেই সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ। এই নিবন্ধে মুসলিম মেয়েদের ভাষা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। এখানে যদিও ক্ষেত্রসমীক্ষা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এবং বাংলা ভাষাভাষী রাষ্ট্র বাংলাদেশকেও এই সমীক্ষার বাইরে রাখা হয়েছে। স্থানিক দূরত্বের কারণে বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েদের ভাষাও হয়তো বেশ খানিকটা আলাদা হবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মেয়েদের ভাষার থেকে। কিন্তু তবু ধর্ম ও লিঙ্গ ভিত্তিক কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যও নিশ্চয় থাকবে। এছাড়া এই নিবন্ধের মূল বিশ্লেষণের জায়গা মুসলিম নারীর ভাষার বহিরঙ্গের পার্থক্যগুলিকে চিহ্নিত করা নয়। গবেষণার মূল লক্ষ্য থাকবে মুসলিম নারীর ভাষার

শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষাকে আবিষ্কার করা। ভাষা থেকে তাদের মনোজগতে ডুব দিয়ে তাদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

ধর্ম আর লিঙ্গকে একটি একক হিসেবে ধরে তাদের মুখের ভাষা নিয়ে গবেষণার তেমনভাবে হয়নি। মুসলিম নারীর ভাষাও তাই আলাদা করে প্রাধান্য পায়নি। তবে বর্তমান সন্দর্ভে সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শব্দার্থতত্ত্ব ও অধিভাষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। শুধু আলাদা শব্দ ব্যবহারে তাদের পক্ষপাতগুলোকে চিহ্নিত করা নয় বরং শব্দ তাদের কাছে কীরকম অর্থ অনুষণ বয়ে আনছে, তাদের চিন্তন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাষা, শব্দ ও তার অর্থ কীভাবে যুক্ত ও আলাদা হয়ে যাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করাই এই সন্দর্ভের মূল লক্ষ্য। ভাষার অর্থ নির্ভর করে কথা বলার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, ছন্দ, বাক্যে বা শব্দে বক্তা কোথায় জোর দিচ্ছে, বাক্যের বা শব্দের মারের ফাঁক, এছাড়া স্বরভঙ্গি বা intonation এর উপরও।

বিশ শতক থেকে ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থবিদ্যার ধারার অগ্রগতি শব্দের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করেছে এবং ভাষা প্রক্রিয়াকে যান্ত্রিকভাবে দেখা ছাড়াও অন্যভাবে দেখার জানালা খুলে দিয়েছে। ভাষার মধ্যে থাকা দ্যোতনা রূপক ইত্যাদিকেও ভাষার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখন E_0 হিসেবে ভাষার কোনো শব্দ পদবন্ধ বা বাক্য যা কিছুই দেখা হতে পারে। এর E_m বা meta language সবসময় প্রাকৃতিক বা natural language নাও হতে পারে কিন্তু তা সবসময় মানুষের বোঝার উপযোগী হতে হবে এবং তা সবসময় E_0 এর সমতুল্য যেন হয় সেটা দেখতে হবে।

object language এর meta language আর একটি natural language ও হতে পারে। অর্থাৎ formal informal – এই দূরকম meta language ই ব্যবহৃত হতে

পারে। Meta language সবসময়ই ব্যাখ্যাতার উপর নির্ভর করবে। তাই তার বোধ জ্ঞান সবসময়ই প্রাধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এক্ষেত্রে। এবং শব্দার্থতত্ত্ব সবসময়ই প্র্যাগমেটিকসের (pragmatics) তত্ত্বের সঙ্গেও পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থাকবে। ফলে সামাজিক – সাংস্কৃতিক কাঠামো ও তার প্রভাব ও অধিভাষার (meta language) ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল থাকবে।

এবার এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিচার্য বিষয় বা অনুসন্ধান এর বিষয় হল, পশ্চিমবঙ্গের মুসলামান নারীদের ভাষার অধিভাষা অর্থাৎ meta language এবং শব্দার্থতত্ত্ব বা semantics কে ধরা।

এখানে বৃহৎ অর্থে world বা স্থান হল পশ্চিমবঙ্গ এবং time বা সময় হল বর্তমান সময়। এই সময় ও স্থানের মধ্যেও বহু মাত্রিকতা আছে। আমরা কখনোই শুধু যে সময়ে অবস্থান করি তার কথা বলি না। একই স্থানের মধ্যেও বহু স্থানকে জায়গা করে নিতে দেখব। ১৯৭০ ও ১৯৮০ তে শব্দার্থতত্ত্বের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত একটি বিষয় ছিল। এরপর আবার আমরা দর্শনে শব্দার্থতত্ত্বের এক ধরনের আধিপত্য লক্ষ্য করতে পারছি।

১১. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা করতে ক্ষেত্রসমীক্ষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। গবেষণার প্রধান ও মুখ্য উৎস ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ উপাত্ত। ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য simple random পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চার জেলা।

Qualitative Research Methodology তে বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে qualitative research methodology একটি প্রচলিত নির্ভরযোগ্য ও

কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই গবেষণা নিবন্ধে আরোহী বা Inductive পদ্ধতিতে একটি প্রস্তাবনা বা প্রকল্পে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলিম মেয়েদের মুখের ভাষাকেই প্রধান ও মুখ্য অবলম্বন করে এই গবেষণার প্রকল্প বিশ্লেষণ ও প্রস্তাব নির্মাণ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই data collection করা হয়েছে simple random পদ্ধতিতে। তবে প্রয়োজন বিশেষে বেশ কিছু ক্ষেত্রে stratified random পদ্ধতিরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১২. গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে, আমাদের গবেষণার মূল প্রশ্ন বা বিষয়টি হল –

মুসলিম মেয়েদের অধিভাষা বা শব্দার্থতত্ত্বের দিকটি তুলে আনা। এখন সম্ভবতাবে প্রশ্ন আসতে পারে মুসলিম মেয়েদের কোনো পৃথক অধিভাষা ও শব্দার্থতত্ত্বের জগৎ আদৌ আছে কি না। আমরা জানি, ধর্ম এবং লিঙ্গ পরিচিতি উভয়ই ভাষাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তা কোন শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক হিসেবে যুগপৎ মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে কি না বা তাদের ভাষার শব্দার্থতত্ত্বে আমরা কোন বিশেষ ভাষা বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাই কি না তা এই গবেষণায় অন্বেষণ করার প্রয়াস থাকবে। ধর্ম কোন মানুষের সামাজিক জীবনকে দৈনন্দিন আচার ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। লিঙ্গ পরিচিতিও মানুষের জীবনে একটি প্রধান সূচকের মতো তার জীবনযাত্রা যাপনকে নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু মুসলিম মেয়েদের ভাষায় সেই প্রভাবই একমাত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে নাকি আরো বিভিন্ন বিষয় সংযুক্ত হয়ে আছে তাদের ভাষায়, আর সংযুক্ত হয়ে থাকলে তাদের প্রকৃতিই বা কেমন- এই সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে এই সন্দর্ভে। কোথায় কোথায় বা কীভাবেই বা তাদের

অধিভাষা ও শব্দার্থতত্ত্বের জগত নির্মাণ হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে আর কোথায়ই বা সামূহিক চেতনা ক্রিয়া করছে সেসব বিষয়েও যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ।

১৩. গবেষণা-উৎস

এই গবেষণায় primary ও secondary উভয় source বা উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে। data collection বা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে অনেকক্ষেত্রে ইন্টারভিউ পদ্ধতিতে, প্রশ্নমালা আগে থেকে সাজিয়ে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থেকেও তাদের জীবন ও ভাষাকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। তাদের নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত গাল-গল্পও রেকর্ড করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এবং সেইসব উপাত্তই পরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার primary source বা প্রধান উৎস এই উপাত্ত বা data ই। এছাড়া Secondary source অপ্রধান বা অন্যান্য উৎস হিসেবে কোরান হাদিস বিভিন্নরকম ধর্মীয় পুস্তক যা সাধারণ মুসলিম পরিবারে পড়া হয় বা পাঠ করা হয় বা মেয়েদের জানানো হয় সেইসব পুস্তককে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আছে বিভিন্ন নামাজ-শিক্ষা মূলক বই, ধর্মীয় বিধি নিষেধ সম্বলিত অজস্র বাংলা বই যা বিভিন্ন মৌলানা হাফেজ সাহেবদের দ্বারা রচিত। এছাড়া ইসলামিক বিভিন্ন জলসা যেখানে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়া হয় সেইসবও লক্ষ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন সাপ্তাহিক বা মাসিক ধর্মীয় পত্রিকা যা মুসলিম মেয়েদেরও হস্তগত হয় বা সেইসব খবর যা তাদেরও শোনানো হয় –সেইসমস্ত পত্রিকা সংবাদপত্রও এই গবেষণার Secondary source।

১৪. গবেষণার ক্ষেত্র-সমীক্ষা এলাকা

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন, এই গবেষণা বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নারীদের উপরই করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যেসব মুসলিম মেয়েদের মাতৃভাষা বাংলা তাদেরও এই

গবেষণার বাইরে রাখা হয়েছে। প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশের মুসলিম মেয়েরাও এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

Population by religious communities					
S No.	State / UT	Religious Communities	Persons	Males	Females
1	India	All Religious Communities	1,028,610,328	532,156,772	496,453,556
2	India	Hindu	827,578,868	428,678,554	398,900,314
3	India	Muslim	138,188,240	71,374,134	66,814,106

281	West Bengal	All Religious Communities	80,176,197	41,465,985	38,710,212
282	West Bengal	Hindu	58,104,835	30,069,503	28,035,332
283	West Bengal	Muslim	20,240,543	10,470,406	9,770,137
284	West Bengal	Christian	515,150	257,337	257,813
285	West Bengal	Sikh	66,391	36,738	29,653
286	West Bengal	Buddhist	243,364	122,877	120,487
287	West Bengal	Jain	55,223	28,631	26,592
288	West Bengal	Other Religious Communities	895,796	451,334	444,462

[http://censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_data_finder/C_Series/Population_by_religious_communities.htm]

সেনসাস – ২০১১

ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৪.২% মুসলিম। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭% মুসলিম, আর সংখ্যাগুরু ধর্ম হিন্দু ৭০.৫৪%। এর মধ্যে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিমরা সংখ্যা গুরু। বাকি জেলাগুলিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা সংখ্যা গুরু।

Muslims in West Bengal by district (2011) ^[2]				
#	District	Total population	Muslim population	%
1	<u>Murshidabad</u>	7,103,807	4,707,573	66.88%
2	<u>South 24 Parganas</u>	8,161,961	2,903,075	35.57%
3	<u>North 24 Parganas</u>	10,009,781	2,584,684	25.82%
4	<u>Malda</u>	3,988,845	2,045,151	51.27%
5	<u>Bardhaman</u>	7,717,563	1,599,764	20.73%
6	<u>Uttar Dinajpur</u>	3,007,134	1,501,170	49.92%
7	<u>Nadia</u>	5,167,600	1,382,682	26.76%
8	<u>Birbhum</u>	3,502,404	1,298,054	37.06%
9	<u>Howrah</u>	4,850,029	1,270,641	26.20%
10	<u>Kolkata</u>	4,496,694	926,414	20.60%
11	<u>Hooghly</u>	5,519,145	870,204	15.77%
12	<u>Purba Medinipur</u>	5,095,875	743,436	14.59%
13	<u>Cooch Behar</u>	2,819,086	720,033	25.54%
14	<u>Paschim Medinipur</u>	5,913,457	620,554	10.49%
15	<u>Jalpaiguri</u>	3,872,846	445,817	11.51%
16	<u>Dakshin Dinajpur</u>	1,676,276	412,788	24.63%
17	<u>Bankura</u>	3,596,674	290,450	8.08%
18	<u>Purulia</u>	2,930,115	227,249	7.76%
19	<u>Darjeeling</u>	1,846,823	105,086	5.69%
##	West Bengal (Total)	91,276,115	24,654,825	27.01%

এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি সবথেকে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও মালদায়।

আমরা মোট মুসলিম জনসংখ্যার বিচারে এগিয়ে থাকা চারটি জেলাকে নির্বাচন করেছি ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য। এই চারটি জেলা ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি অবস্থিত নয়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা এবং মালদা ও মুর্শিদাবাদ কাছাকাছি অবস্থিত জেলা। এই চারটে

জেলার মুসলিম মেয়েদের সার্বিক চিত্রও পুরোপুরি একরকম নয়। উপরন্তু এই চারটে জেলার ভাষাই মান্যায়িত আদর্শ প্রমিত বাংলা থেকে খানিক আলাদা। প্রত্যেকটি অঞ্চলেরই নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র ও বিশেষত্বে পূর্ণ। এদের ভৌগোলিক রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসও একে অপরের থেকে পৃথক।

২০০৬ সালে সাচার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মুসলিমদের সাক্ষরতার হার বেশ কম, এমনকি তা SC ST দের তুলনায়ও অনেক কম। এবং কারণ হিসেবে এই রিপোর্টে দারিদ্রকেই প্রধান কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছিল। ২০০৬ থেকে ২০১৯ এর এই মধ্যবর্তী সময়েও মুসলিমদের সামাজিক অর্থনৈতিক কোন অবস্থাই বিশেষ পালটায়নি। পালটায়নি তার কারণও। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছিল অসংরক্ষিত মুসলিমদের অবস্থা OBC হিন্দুদের থেকে বহুগুণে খারাপ।

আর মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে বিভিন্নরকম সমস্যার কথা সাচার কমিটির রিপোর্টে উঠে আসে। তার মধ্যে দারিদ্র, মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব এবং একজনকে পড়ানোর ক্ষমতা থাকলে বাবা মায়েরা ছেলেদেরকে প্রাইভেট স্কুলে পড়ায় মেয়েটির বদলে। কিন্তু এতসব অন্তরায় থাকা সত্ত্বেও রিপোর্টে বলা আছে—^{১২} মুসলিম মেয়েদের মধ্যে পড়াশোনা করার অভিলাষ তীব্র কিন্তু আর্থিক দুর্গতি তাদের সহায় হয় না।

মুসলিম মেয়েদের স্বনির্ভর বিষয়ে সাচার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে—^{১৩} মুসলিম মেয়েদের মধ্যে স্বনির্ভরতা খুবই বেশি। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মেয়েদের মধ্যে। কাঁথার সেলাই, রেডিমেড কাপড়ের ব্যবসা, বিড়ি বাঁধা ইত্যাদি কাজে তাদের যোগদান চোখে পড়ার মত। সাচার কমিটির দীর্ঘ ও অনুপুঙ্খ রিপোর্টে সারা ভারতের মুসলিমদের যে চিত্র উঠে এসেছিল তাতে সার্বিকভাবেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের দুর্দশার ছবিটি ধরা পড়ে। সেখানে বিশেষভাবে আমরা মুসলিম মেয়েদের ছবিটিও পাব যা খুব স্বাভাবিকভাবেই আরো সঙ্গিন।

প্রথম অধ্যায়

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. chomsky, Noam, *Aspects Of The Theory Of Syntax*, The M.I.T press, Cambridge, 1965, P. v (Preface)

“What is more, it seems that even Panini’s grammar can be interpreted as a fragment of such a “generative grammar”, in essentially the contemporary sense of this term”

২. Robins, R. H, *A Short History Of Linguistics*, Longman Group Limited, London, 1967, P. 139

“Indian linguists debated the whole question of the primacy of the word as against that of the sentence. One set of thinkers maintained a view very like the general western attitude that the sentence is built up of words each contributing its meaning to the total meaning of the sentence. But an opposite view, particularly associated with Bhartrhari, author of *V iikyapadiya* (c. seventh century A.D.), regarded the sentence as a single undivided utterance conveying its meaning 'in a flash', just as a picture is first perceived as a unity notwithstanding subsequent analysis into its component coloured shapes. Given the conception of the word unit, sentences can be identified as one-word sentences or as many-word sentences, but for the speaker and earer they are primarily

single sentence unities, words and word meanings being largely the creation of linguists and self-conscious speakers trying to analyse and classify sentence meanings in terms of smaller components. As an example of Bhartrhari's attitude, the sentence fetch a cuckoo from the woods is not understood first as a sequence of words put together,... ২

৩. দাশ, শিশিরকুমার, ভাষা জিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস, কোলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫৪

(“প্লেটো ভাষা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলেও ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তার সূত্রপাত করেননি।”)

৪. Lyons, John, *Semantics (Volume -1)*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, p. 125

“An early formulation of the behaviourist conception of meaning was Watson's: 'Words function in the matter of calling out responses'”

৫. Lyons, John, *Semantics (Volume -1)*, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, P. 129

“he rejects the terms 'sign' and 'symbol' to denote the relationship of association. He bases his analysis on the concept of stimulus control.”

৬. Leech, Geoffrey, *Semantics: The Study Of Meaning* 2nd Edition, Penguin, Great Britain, 1981. P. 10

৭. Leech, Geoffrey. *Semantics: The Study Of Meaning* 2nd Edition. Penguin. Great Britain. 1981. P. 101

“This middle ground implies the existence of a norm – and it is important to observe that the norm is object-related – that is, it can shift its position on the scale according to the object being categorized. For example, in terms of physical measurement, young does not mean the same in the phrase young man (age seventeen to thirty?) and aged archbishop (age forty-five to sixty?)...”

8. Allan, Keith, *Natural Language Semantics*, Blackwell Publishers, UK, 2006, P. 46

“The REFERENCE of a language expression e in utterance U is “what Speaker is talking about when using e in U” e.g. Speaker refers to particular entities, events places, and times within the world and time s/he is speaking of. Thus, referring is something that Speaker does, and it is intimately connected with speaker meaning.”

9. Allan, Keith, *Natural Language Semantics*, Blackwell Publishers, UK. 2006, P. 47

“Denotation is a convenient cover term for intension and extension when we have no need to distinguish between them.”

10. Chomsky, Noam, *Language And Mind*, Cambridge University Press, Cambridge, P. 88

“When we study human language, we are approaching what some might call the “human essence”, the distinctive qualities of mind that are, so far as we know, unique to man and that are inseparable from any critical phase of human existence, personal or social.”

११. Jespersen, Otto, *Language Its Nature Development And Origin*, Henry Holt & company, New York, 1922, P. 242

“in the old Indian drama that women talk Prakrit {prdkrta. the natural or vulgar language) while men have the privilege of talking Sanskrit (sani' skrta, the adorned language). The distinction, however, is not one of sex really, but of rank, for Sanskrit is the language of gods, kings, princes, brahmans, ministers, chamberlains, dancing-masters and other men in superior positions and of a very few "ivomen of special religious importance, while Prakrit is spoken bj men of an inferior class, like shopkeepers, law officers, aldermen, bathmen, fishermen and policemen, and by nearly all women. The difiFERENCE between the two ' languages * is one of degree only”

१२. *Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India*, A report by Prime Minister’s High Level Committee Cabinet Secretariat Government of India November, 2006, P. 40

“In this dismal scenario there is one big ray of hope; while the education system appears to have given up on Muslim girls, the girls themselves have not given up on education. There is a strong desire and enthusiasm for education among Muslim women...

ۛۛ. *Social, Economic and Educational Status of the Muslim Community of India*, A report by Prime Minister’s High Level Committee Cabinet Secretariat Government of India November, 2006, P. 43

“Muslim women are overwhelmingly self-employed (engaged in home-based work). Sewing, embroidery, zari work, chikan work, readymade garments, agarbatti rolling, beedi rolling are some of the occupations in which Muslim women workers are concentrated. Their work conditions are characterized by low income, poor work conditions, absence of toilet and crèche facilities, lack of social security benefits like health insurance and the absence of bargaining power. In several states home-based industry has virtually collapsed leaving poor Muslim women spiraling downwards to penury.”

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা পারঙ্গমতাবোধ ও নারীর ভাষা নির্মাণ

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ভোগ্যপণ্য, পুরুষ তাকে অধিকার করে। পুঁজিবাদের কৌশলী চেহায়ায় অনেকসময় সেই দাসত্বের শৃঙ্খল নারী দেখতেও পায় না। ‘Woman in the Past Present and Future’ গ্রন্থে আগস্ট বেবেল বলেছেন ‘সমগ্র মানবজাতির মধ্যে নারীকেই প্রথম দাসত্ব স্বীকার করানো হয়েছে। দাসপ্রথা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই নারী দাস ছিল।

সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হল পরিবার। পরিবার থেকেই, যেখান থেকে একটি নারীর জন্মের পর প্রথম পথ চলা শুরু হয়, সেখান থেকেই আমরা তার পায় বেড়ি পড়ানোর শুরুয়াত খেয়াল করব। পরিবার শব্দের ইংরেজি অর্থ ‘family’ শব্দের উৎসে গেলে তার বুৎপত্তিগত ল্যাটিন শব্দ familia শব্দটি আজকের আপাত নিরীহ family শব্দের মূল্যবোধকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই শব্দের শিকড়ে লুকিয়ে আছে দাসত্বের কাঠামো। খুব সংক্ষেপে পরিবার তৈরির ইতিহাসটা আমরা দেখে নেব।

প্রাথমিক যাযাবর জীবন ও অনিশ্চিত খাদ্য সরবরাহের স্তর পেরিয়ে মানুষ ধীরে ধীরে পশুপালন ও কৃষিকাজ শিখে পরিবার প্রথার দিকে এগিয়েছে। অবাধ যৌন সংসর্গ নিয়ন্ত্রিত হতে হতে প্রথমে একরক্ত সম্পর্কের পরিবার প্রথা হল যেখানে পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানের যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ হল। বাস্তব ও প্রয়োজনের সুবাদেই তা হল।। খাদ্যের জোগানের সঙ্গে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য সাধন করতে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে প্রাধান্য দেওয়া হল। এরপর এল pualuan family, যেখানে ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হল। সমষ্টিগত পরিবার বা যৌনতা মাতার পরিচয় নিশ্চিত করলেও পিতার পরিচয় নিশ্চিত করে না। ফলে সন্তানের

পরিচয় তখনও অবধি মায়ের পরিচয় দ্বারাই স্বীকৃত ছিল। এই পুনালুয়া পরিবার এরপর জোড়বাঁধা পরিবারের দিকে দিক নেয়। আকাদেমি পত্রিকা ৮ এ সেরিনা জাহান এ প্রসঙ্গে বলেছেন ^২ এই জোড়বাঁধা পরিবার প্রথা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীদের দুরবস্থা শুরু হয়। নারী হরণ ও ক্রয় করা সামাজিক অভ্যেসে পরিণত হয়। উদ্ধৃত সম্পদের মালিকানা শ্রম বিভাজনের নীতি অনুসারে পুরুষের হাতে চলে আসে। এই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় বহির্জগৎ ও গৃহ প্রতিপালন – উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষ উচ্চক্ষমতাদিকারী হয়। অথচ বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার যেহেতু মাকে অবলম্বন করে হতো ফলে এক অবশ্যম্ভবী টানাপড়েনের সূচনা হতে থাকে। এঙ্গেলস মনে করেন এই উদ্ধৃত সম্পত্তির কারনেই পুরুষ পরিবারে ও সমাজে নিজের অবস্থান পোক্ত করে ফেলে।

অর্থাৎ এক বৃহৎ ধরনের পালাবদল ঘটে গেল। গোষ্ঠীর পুরুষদের সন্তানরা স্থান পেল গোষ্ঠীতে কিন্তু সেই গোষ্ঠীর মেয়েদের অন্য গোষ্ঠীর পুরুষদের সঙ্গে যৌন সংসর্গের ফলের সন্তানদের ঠাই হল না গোষ্ঠীতে। অর্থাৎ কৌমে মেয়েদের আর কোনো অধিকার রইল না। পিতার পরিচয় নির্ধারণ করে দিল কৌমের অবস্থান। সেখান থেকেই হয়তো আজকের বাবার বাড়ি কথাটা চলে এসছে। এরপর এই পরিবর্তিত অবস্থায় ধীরে ধীরে নারীর কাছে বশ্যতা ও যৌন সংসর্গে কঠোর বিশ্বস্ততা দাবি করা হল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হয়ে গেল। সমষ্টি বিবাহ প্রথাও বন্ধ হয়ে গেল। এবং কালক্রমে এল এক পতি-পত্নী পরিবার বা monogamous family।

এইভাবে নারী – পুরুষের বৈষম্যমূলক অধিকারচেতনা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিবারের মধ্যে স্বীকৃত হল। পুরুষের আধিপত্যের উপর ভিত্তি করেই এই family বা পরিবারের কাঠামো গড়ে উঠল। যেখানে নারীর ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল সন্তান উৎপাদন করা ও গৃহের কাজকর্ম করা। এবং ঘরের এই শ্রম বিনা মূল্যে ও গুরুত্বে দাবির আকারে পর্যবসিত হল।

এইভাবে নারীর দাসত্বের বীজ বপন হল পরিবারে যা উত্তরাধিকার সূত্রে এই পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে আধুনিক পরিবারেও ভ্রূণ আকারে রয়ে গেছে। অর্থাৎ পরিবারের সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই নারীকে অধস্তন হিসেবে রাখা হয়েছে। আর তাকে প্রতিনিয়ত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে সাংস্কৃতিকভাবে নির্মাণ করে চলা হয়েছে, হচ্ছে। এই অনৈতিক অমানবিক কাঠামোক ধর্মীয় তত্ত্বের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠা পেল। সমস্ত ধর্মের মধ্যেই নারীর এই অবদমনকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। নারীর থেকে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক এই বৈষম্যের স্থিতিবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে, মেয়েদেরকে করতলগত রাখার অভিপ্রায়ে নারী পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক সামাজিক বিধি নিষেধের তালিকা তৈরি হল। এই বৈষম্যের মান্যতার সমর্থন রাখা হল সব ধর্মগ্রন্থে। তাই বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থে আমরা দেখি নারী পুরুষের জন্মবৃত্তান্তের মধ্যেও আছে নারী পুরুষের মধ্যকার এই উচ্চ-নীচ ভেদ। তাদের জন্য আলাদা উপদেশও অনেক ক্ষেত্রে।

ধর্ম ও সমাজ একসঙ্গে নারী পুরুষকে সামাজিকভাবে তাই নির্মাণ করে থাকে। প্রাকৃতিক যে ভিন্নতা নিয়ে, আরো নির্দিষ্টভাবে বললে দৈহিক গঠনের যে ভিন্নতা নিয়ে নারী পুরুষ জন্মায় সেই ভিন্নতা কিছু ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে আলাদা শ্রেণিভুক্ত করে। কিছু হরমোনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দৈহিক, বাহ্যিক কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। যেরকম গলার স্বর, শারীরিক গঠন, ত্বক। এছাড়া সন্তান উৎপাদনের দীর্ঘ প্রক্রিয়াও নারীদেরই বহন করতে হয়। সন্তান উৎপাদনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনেকসময়ই পুরুষদের মতো নারীদের অ্যাডভেঞ্চার বা জীবনের নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নিজের অস্তিত্বের উদযাপন করতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে সমাজের যে মূল্যবোধ মহত্ব সংযোজিত আছে তা অনেক পরে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথমদিকে মেয়েদের এই নিয়ে কোন গর্বিত হওয়ার বোধ ছিল না। সংসারের একঘেয়েমি

কাজে নারীরা জড়িয়ে পড়তে শুরু করে। গৃহকাজে ও সন্তান প্রতিপালনের ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এভাবে নারীদের জীবন।

নারী পুরুষ শারীরবৃত্তীয়ভাবে পৃথক। শরীর ও মন আন্তঃসম্পর্কে যুক্ত বলে নারী পুরুষের অন্তর্জগৎও তাই খানিক আলাদা হতে বাধ্য। এতো গেল প্রকৃতিগত পরিবর্তনের কথা। কিন্তু এর বাইরে আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো যাকে আমরা ও যার দ্বারা আমরা প্রভাবিত ও প্রতিপালিত হয়ে আসছি তা নারী পুরুষের জগতের মাঝে কৃত্রিমভাবে কিছু সীমারেখা টেনে দিয়েছে যা বহু বছর ধরে মান্য হতে হতে কালক্রমে সামাজিক নিয়ম ও তার পরে প্রায় অবিচল প্রাকৃতিক নিয়মের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরের পরে নারীকে ধীরে ধীরে গৃহের কাজের মধ্যে আবদ্ধ করে তাকে দুর্বল ক্ষমতাহীন ও অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর করে রাখা হয়। নারীর ঘরের যাবতীয় কাজ সংসার প্রতিপালনের মতো কষ্টসাধ্য ও আয়াস বহুল কাজের কোনো মান্যতা দেওয়া হয়নি। সেগুলো সবই বিনা পারিশ্রমিকের কাজ হয়ে থাকায় ও অর্থ সমাজের সম্মান ক্ষমতা প্রতিপত্তির মূল মাপকাঠি হওয়ায় সমাজে নারীর গুরুত্ব কমতে শুরু করে। কিন্তু তব্বের যেহেতু কোনো লিঙ্গ নেই, তাই কোনো বিশেষ লিঙ্গের মানুষের প্রতি পক্ষপাত করলেও বা শুরুতে কোনোভাবে কোনো বিশেষ লিঙ্গের দ্বারা নির্মিত হতে শুরু করলেও তা সমস্ত শ্রেণির সমস্ত লিঙ্গের মানুষের দ্বারাই কম বেশি পরিপুষ্ট হতে থাকে। এরপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরাও নিজেদেরকে অপেক্ষাকৃতভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ, দুর্বল অসহায় ক্ষমতাহীন এবং পরজীবী বলেই গণ্য করতে শেখে। তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব হীনমন্যতা তাদের ভাষার মধ্যে প্রকাশ পায়। এই হীনমন্যতা তাদের জন্মবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হতে শুরু করে আমাদের বিশেষ সামাজিক নির্মাণে।

যখন সে শিশু থাকে এবং তাকে সাধারণ লিঙ্গের মধ্যে ফেলা হয় ব্যাকরণগত ভাবে, তখনও আসলে শিশুর লিঙ্গ নির্মাণ হতে থাকে পরিবার সমাজের হাত ধরে ধরে। কোনো বাচ্চা ছেলে কাঁদলে আমরা অনায়াসে তাকে থামানোর জন্য বলে থাকি – ‘এমা মেয়েদের মতো কাঁদে নাকি’। শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলনার উপকরণ, তার জন্য প্রিয় রঙ সবই নির্বাচিত হতে থাকে তার লিঙ্গের উপর নির্ভর করেই। ছোটোরা প্রথমে শেখে অনুকরণের মধ্যে দিয়ে। বাড়ির পরিবেশে তারা বাবা মা বা অন্যান্য পরিবারের সদস্য বা সদস্যদের যেরকম ভূমিকা পালন করতে দেখে তা থেকে ছেলে বা মেয়ের সংসারে সমাজে কার্যভূমিকা কী হতে পারে সেই সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ নিয়ে বড়ো হতে থাকে।

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখতে পাব অনেক সময়ই বাচ্চা ছেলেরা বলে থাকে, আমি মেয়েদের সঙ্গে খেলি না। যে বাচ্চা ছেলেটি পুতুল খেলতে ভালোবেসে ফেলে পাশের বাড়ির কোনো বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে, একটু বড়ো হলে খুবই হালকা চালে বাড়ির বা আশেপাশের বড়োরা তাকে বলে দেয় যে সে ছেলে, পুতুল খেলা তার জন্য নয়। বা মেয়েদেরই গোলাপি রঙের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য থাকার কথা, ছেলেদের খেলনাবাটি নয় বন্দুক গাড়ি-ই হয়ে ওঠে তাদের খেলার, কল্পনার সামগ্রী। এই সমস্ত ট্যাবু নিয়ে একটি শিশু ধীরে ধীরে ছেলে বা মেয়ে শিশু হয়ে উঠতে থাকে। অনেক পরিবারে ছেলে শিশু নিয়ে বেশি আদিখ্যেতা বা গুরুত্ব থাকে যা মেয়েদের নিয়ে থাকে না অনেকসময়। বৈষম্য ও লিঙ্গগত হিংসাকে স্বাভাবিক ভেবে একটি মেয়ে শিশু বড়ো হয়ে উঠতে থাকে।

বয়ঃসন্ধিতে এসে মেয়েরা হঠাৎ করে আরো বেশি ‘মেয়ে’ হয়ে উঠতে থাকে। এবং সাধারণ জৈবিক প্রক্রিয়া ঋতুস্রাব নিয়ে সমাজের সমস্ত কুসংস্কার মাথায় করে তাদের আলাদা এক জগৎ নির্মিত হতে থাকে। যা খুবই গোপন, যা নিয়ে কথা বলা প্রায় নিষিদ্ধর মতো। আর অনেকটা লজ্জা মিশে থাকে এই স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াকে নিয়ে। তারা তাদের

দেহকে অপবিত্র ভাবে শেখে। সেখানে ছেলেদের আর কোনো প্রবেশাধিকার থাকে না। তৈরি হতে থাকে তাদের নিজেদের অন্তর্জগৎ। ঠিক এই সময়ে এসে নারী পুরুষের যে বিভেদ ছোটো থেকে তৈরি হতে শুরু করে, তার সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরি হয়ে যায় শারীরবৃত্তীয় কিছু পরিবর্তন সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

এই সময় ছেলেদের টেস্টোস্টেরন (testosterone) ও মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেনের (estrogen) প্রভাবে ছেলে ও মেয়েদের শরীরেও প্রভূত পার্থক্য দেখা যেতে থাকে। ছেলেদের গলার স্বরে পরিবর্তন হয়। গম্ভীর হয়। মেয়েদের শারীরিক গঠনও পৃথক হতে শুরু করে ছেলেদের থেকে। সুস্পষ্টভাবে তাদের দেহগত পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। ছেলে মেয়ে উভয়েই তাদের শরীর নিয়ে সচেতন হতে শুরু করে। আর এই পরিবর্তন আর সমাজের কড়া পাহারা ছেলে মেয়েদের কাছে পরস্পরকে ভিন গ্রহের জীব করে তোলে। অথচ, বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক কৌতূহলও থাকে উভয়ের উভয়ের প্রতি। কিন্তু সহজ বন্ধুতা গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। বয়ঃসন্ধিতে পা দেওয়ার সময় থেকেই মূলত ছেলে মেয়ের জগৎ পৃথক হতে শুরু করে। তারা যে আলাদা কর্মে আচরণে ব্যবহারে এই কথাটা তারা যেমন আগের প্রজন্মদের দেখে বড়ো হতে থাকে তেমন তাদেরকেও সচেতনভাবেও আলাদা করে বড়ো করে তোলা হয়।

এবার কথা হল, এই যে ছেলে মেয়ের জগতের ভিন্নতা তারও মাত্রাভেদ আছে। অর্থাৎ, দেশ কাল বিচারে ছেলে মেয়ের ভিন্ন জগতের মাত্রাগত ভেদ আছে। এখন দেখার বিষয় লিঙ্গ ভেদে যে জগৎ আলাদা হয়ে যাচ্ছে তার উপর ধর্ম আরোও কোনো আলাদা মাত্রা বা প্রভাব ফেলছে কি না এবং কীভাবে মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ অন্য স্বর, ভাবনা তুলে ধরছে।

ইসলাম ধর্ম সারা পৃথিবীর মানুষকে ধর্ম পরিচয়ে এক সূত্রে আবদ্ধ করে। সারা পৃথিবীর মুসলিমের প্রধান পরিচয় মুসলিম বলে ধর্মগুরুরা দাবি করে থাকেন। ইসলাম ধর্মের উৎপত্তি আরবে। ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ তুর্কিদের হাত ধরে। তারপর মোগলরা দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল এ দেশে। তিনরকম ভাবে এদেশে ধর্মান্তরণ ঘটেছে।

- ১। ইসলামের শান্তির বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে হিন্দু ধর্মের নিচু তলার লোকজনেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে।
- ২। জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে।
- ৩। রাজা বা শাসক শ্রেণি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে দেশের প্রজা বা অনুগামী লোকজনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে অনুপ্রাণিত হয়ে।

Eaton চার ধরনের পদ্ধতিতে বাংলায় ইসলাম এর আগমন ঘটেছে বলেছেন।^৩ যথা-

- ১। স্থানান্তরণ বা অন্য স্থানে পুনর্বাসন
- ২। তলোয়ার বা গায়ের জোরে যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।
- ৩। শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা বশত অনেক সাধারণ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন
- ৪। এছাড়া ইসলাম ধর্মে জাতিভেদের অনুপস্থিতি সামাজিক সম্মানের প্রতি অনুরাগবশতও অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত মুসলিম। অর্থাৎ তারা হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আরব পাঠানের বংশানুগত উত্তরাধিকার এদের জিনে কম। এছাড়া ভারতে ইসলামের সুফি ধারারও একটা বড়োসড়ো প্রভাব আছে। না খেতে পাওয়া সামাজিক সম্মান না পাওয়া নিম্ন বর্ণের মানুষেরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল তখন তারা কোরান হাদিস জেনে করেনি। বস্তুত, তাদের জীবনে কোরান হাদিসের জায়গা

খুবই কম ছিল। তারা আগের হিন্দু ধর্মের আচার ও ইসলামের সঙ্গে সমতা রেখে মোটামুটি রফা করেই দিন কাটাতে। বাংলায় যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান ছিলেন না। কিন্তু এদের সঙ্গে সাধারণ নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের যোগাযোগ খুবই কম ছিল। তবে পরবর্তীকালে এদের সঙ্গেও বৈবাহিক সূত্রে এদেশীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানরা কিছু অংশে মিশে গেছে।

ইসলামের দুটি ধারা - ১। শরিয়ত ও ২ সুফি। এদের মধ্যে সুফি ধর্মের সঙ্গে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হওয়ার সুযোগ ও পরিসর বেশি ছিল। সুফি ও হিন্দু ধর্মের ভক্তি আন্দোলনের একত্রীকরণ হয়েছিল। ৭ম - ৮ম শতাব্দীতে ভারতে ভক্তি আন্দোলনের জোয়ার আসে। যা শুরু হয়েছিল দক্ষিণ ভারত থেকে ও পরে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ভক্তি আন্দোলন প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্ম যা প্রায় আচার রীতি নীতির বেড়াজালে আটকে পড়েছিল তাকে পরিশুদ্ধ করে। এরপর ১২ - ১৩ শতাব্দীতে ভারতে সুফি ধর্মের প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন সুফি সাধকদের দেখা মেলে এই সময়। এর ফলে যেমন একদিকে শরিয়তি ইসলাম ধর্ম যার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি দূরত্ব প্রথম থেকেই ছিল, তা খানিক কমতে সাহায্য করে অন্যদিকে বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমান, যারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোরান হাদীস পড়েননি তারাও ইসলামের এই ধারার সঙ্গে খানিক একাত্মবোধ করতে পারলেন। দরগা ফকির পীর ধরেই তারা ইহলোক তরে যেতে চাইলেন।

সুফী প্রভাব বাংলায় কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব থেকে পারস্য বোখারা সমরকন্দ হয়ে সুফি মতবাদ বিভিন্ন মুসলমান দেশগুলোতে আসে। এনামুল হক এ বিষয়ে তার সুচিন্তিত অভিমত রেখেছেন^৪ তিনি জানিয়েছেন সুফি ধর্মের আবির্ভাব বাংলায় করে হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে মুসলিম শাসনের আগেই তা হয়েছে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ভারতে সুফি ধর্মের

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়েই সুফির কোনো শাখা বাংলাতেও এসে পড়ছে কি না তা বিবেচ্য।

এরপরে তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে মুসলমান অধিকারের আগে থেকেই বঙ্গে সুফি প্রভাব পড়েছে।^৫

কিন্তু উনিশ শতকে যখন বাংলার নবজাগরণ শুরু হল, সেই সময় যারা এগিয়ে এলেন, নেতৃত্ব দিলেন তাদের মধ্যে কোনো মুসলিম নাম ছিল না। ইংরেজ শাসন কালে তাই যখন ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে হিন্দু বাঙালি এগিয়ে গেল শিক্ষা দীক্ষায়, মুসলমান বাঙালি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ইংরেজি ভাষার প্রতি অনীহা, টোল শিক্ষা ব্যবস্থায় অভ্যস্ত বাঙালি মুসলিমরা টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের স্কুলে ভর্তি হতে পারল না। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই চাষবাসের কাজ ছেড়ে পূর্ণ সময়ের জন্য ছাত্র হতে পারল না। তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। উল্টোদিকে ইংরেজি ভাষার প্রতি এক ধরনের অনীহা থেকেও তারা দূরে রয়ে গেল। সমাজের উচ্চ কোটি হিন্দু যে ইংরেজ সভ্যতার শুভ ও কল্যাণকর দিকগুলো নিয়ে এগিয়ে গেল মুসলিম বাঙালি তার থেকে পিছিয়ে রইল।

এছাড়া এই বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে একধরনের অস্তিত্ব সংকটও দেখা দিল। যে হিন্দু ধর্ম ছেড়ে তারা বেরিয়ে এসছে সেখানে তারা বরাবরের মতো যেমন অপাঙ্ক্তেয় হয়ে রইল অন্যদিকে এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদেরকে অন্য ‘সহি’ মুসলিমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না। তারা আর ‘সাচ্চা মুসলমান’ হতে পারল না। এই দ্বিবিধ সংকটের থেকে আজও বাঙালি মুসলিমরা সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি। দেশভাগের সময় বাংলাদেশে যে সব মুসলিম থেকে গেলেন ও যারা এদেশ থেকে চলে গেলেন, বাংলাদেশি মুসলমান হিসেবে তারা এক নতুন পরিচয় পেয়ে এই সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলিমের এই সংকট তাদের পরিচয়ের এক বিশেষত্ব হয়ে রয়ে গেল। এখন দেখা যাক, মুসলিম সমাজের

অন্দরমহলের নারীদের কথা। তা ঠিক কতটা আলাদা হয়ে গেল হিন্দু নারীদের তুলনায়। বহুদেববাদ পৌত্তলিকতা সমন্বিত হিন্দু ধর্মের সঙ্গে আচার আচরণে একেশ্বরবাদের প্রবক্তা ইসলাম ধর্মের পার্থক্য বহু দিকেই আছে। তবে যেকোনো ধর্মের ক্ষেত্রেই, যেহেতু সব ধর্মই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক কণ্ঠকেই কোথাও মজবুত করে, তারই খসড়া লিপি বহন করে, তাই দেখা যায় আচার আচরণের বাহ্যিক দিকটা মেয়েদের জন্য যতটা কঠোর ছেলেদের জন্য ততটা নয় বা তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম খানিক আলাদা।

ইসলামে নারীর স্বাধীনতা, স্থান – এ বিষয়টা এমনিই বেশ বিতর্কিত। সেই বিতর্কে যাওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন এই নিবন্ধের নেই। তবে যেটুকু বাঙালি মুসলমান নারীর চিন্তা জগতকে নির্মিত হতে সাহায্য করে থাকে আমরা সেই অংশগুলো আলোচনা করব প্রয়োজন অনুসারে। বাঙালি মুসলিমরা সন্তান জন্মাবার পর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আকিকা দিয়ে থাকে। তবে একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবার, তারা অনেক সময় এই নিয়ম উপেক্ষা করে যায়। আকিকার ক্ষেত্রে ছেলে হলে দুটো ছাগল বা ভেড়া দেওয়ার প্রথা ও মেয়ে হলে একটি ছাগল বা ভেড়া দেওয়ার কথা। আকিকাহতে সাধারণত সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে নবজাতকের জন্য আশীর্বাদ ও তার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পশু বলি দিয়ে ত্যাগ নিবেদন করা হয়। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে এই আচারে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এও দেখা যায় যাদের আর্থিক সঙ্গতি কম তারা সব ছেলে মেয়ের জন্য না পারলেও তার মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্তান থাকলে তার জন্য আকিকাহ দেয়। বাকি মেয়েদের জন্য দেওয়া হয় না।

তবে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এই আচার পালনে তেমন কঠোর নিয়ম নেই। আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে অনেকেই আকিকাহ দেন না ছেলে মেয়েদের জন্য। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে জন্মাবার শুরুতেই ধর্ম এই বৈষম্যের শিলমোহর মেরে দেয় যেখানে

ছেলে মেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, যেখানে একটি পরিবার তার শিশুকে বড়ো করে তোলে। নারী পুরুষ উভয়ের ভাষাতেই আমরা এর প্রভাব পাব। তাদের কথা বলার বিষয়ও পালটে যায় এর সঙ্গে সঙ্গে।

এছাড়া পোশাকের ক্ষেত্রে শরিয়তের সুস্পষ্ট বিধান আছে। ঋতুমতী হওয়ার পর মেয়েদের জন্য হিজাব আবশ্যিক। যেখানে হিজাবে হাত পা পুরো শরীর এবং মাথার চুল ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। বহু ইসলামিক রাষ্ট্রে বরখা, নিকাব, হিজাব ও চাদর পরা হয়।

বাংলার মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বোরখা হিজাব নিকাব পরার রেওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কিছু জায়গায় একটু সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের অনেক সময় চাদর পরতে দেখা যায়। চাদর পরার এই প্রবণতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার মুসলিমদের মধ্যে খুব বেশি। ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও সব জায়গায় বোরখা নিকাব হিজাব চাদর পরার প্রবণতা সমান নয়। চাদর পরার প্রবণতা আফগানিস্তান ও ইরানের মধ্যে বেশি। পীর দরগা অধ্যুষিত জায়গাগুলিতে তাই অনেককে চাদর পরতে দেখা যায়। তবে অনেক আগের প্রজন্মের মধ্যে তাও ছিল না। সাধারণত তাদের পোশাক পরার বিষয়ে ইসলামের এই রীতি প্রায় মানা হত না বললেই চলে। শাড়িতেই বেশিরভাগ বাঙালি মুসলিম মেয়েরা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও মেয়েদের জোরে হাসি, জোরে চলাফেরা করা, ইত্যাদি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে থাকে।

ঋতুস্রাব চলাকালীন মেয়েদের যে যে ধর্মীয় বিষয়ে থাকা যায় না সেগুলি হল-

- ১। নামাজ পড়া যায় না
- ২। রোজা রাখা যায় না
- ৩। মসজিদে ঢোকা যায় না
- ৪। কোরান বা কোনো ধর্মীয় পুস্তক পড়া যায় না।

এছাড়া মুসলিম মেয়েরা জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কবরস্থানে মাটি দিতে যেতে পারে না। আজান দিতে পারবে না। ইদের নামাজ পড়াতে বা পড়তে ইদগাহে সম্মিলিত হতে পারে না।

ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইনটা একবার দেখে নেওয়া যাক। ইসলামে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে সমান নয়। বাবার সম্পত্তির ১/৩ অংশ মেয়েরা ও ২/৩ অংশ ছেলেরা পায়। এই বৈষম্যমূলক অংশের যুক্তি হিসেবে বলা হয়, ইসলামিক আইনে পরিবারের সমস্ত অবিবাহিত মেয়ে (বোন) শিশু স্ত্রী মা বাবার সমস্ত দায়ভার ছেলেকেই বহন করতে হয়। সেক্ষেত্রে এই দায়িত্ব মেয়েদের নেই। বরং অন্যদের ‘দায়’ হয়ে থেকেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তাই তাদের উত্তরাধিকার অংশও কম।

বিয়ের ক্ষেত্রেও মুসলিম বিবাহ রীতি আছে। সেটি একধরনের চুক্তি প্রায়। এবং এক্ষেত্রে দেনমোহর নামে কিছু টাকা মেয়েকে বিয়ের সময় ছেলেকে দিতে হয়। বিয়ের সময় বা দাম্পত্য জীবন চলাকালীন এই টাকা ছেলেকে দিয়ে দেওয়ার বিধি। বিধবাদের বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের নিয়ম শিথিল। এছাড়া ইসলাম বিশেষ বিশেষ কিছু শর্ত ও পরিস্থিতিতে ছেলেরা চারটে বিয়ে করতে পারে।

তালাক বিষয়টাও ইসলামে বেশ জটিল একটি পদ্ধতি। সম্প্রতি অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রের মতো ভারতে ইনস্ট্যান্ট তিন তালাক বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বামী একপাক্ষিকভাবে পরপর তিন বার তালাক বলে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো। এর আগে এই তিন তালাকের শোচনীয় পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন অনেকেই। তবে স্বামী বিভিন্ন কারণে তিনমাস ব্যাপী সময় নিয়ে তিন বার তালাক বলে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারে। এবং তারপর তিন মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুনরায় অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে। (যাতে আগের

স্বামীর সন্তান গর্ভে থাকলে পরবর্তীকালে তার পিতৃত্ব নির্ণয়ে কোনো সমস্যা তৈরি না হতে পারে)।

তবে, ‘খুলা’র মাধ্যমে ইসলামে স্ত্রী অক্ষম ও অযোগ্য স্বামীর থেকে বিচ্ছেদ চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তির উপর আর তার কোনো অধিকার থাকবে না। তবে সন্তানের দায়িত্ব থাকবে পিতার উপর। এছাড়া ইসলামে নিকাহ- হালালা বলে একটি বিষয় আছে তালাকের যথেষ্ট ব্যবহার রোধের জন্য। সেটা হল স্বামী যদি তালাক দেওয়ার পর অনুতপ্ত হয় এবং আবার তাকে ফিরে পেতে চায় ও উভয়ে তাতে সম্মতি দান করে তবে তাদের পুনরায় বিয়ের আগে স্ত্রীর অন্য কারোর সঙ্গে বিয়ের পর ডিভোর্স দিয়ে তারপরে তা সম্পাদন করতে হবে। এই বিষয়টাকে নিকাহ- হালালা বলা হয়।

এইবার এই শরিয়তি আইন বাঙালি মুসলিম নারীদের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছে বা তার অন্তর্জগতে কীভাবে নির্মাণ করেছে ও তা তাদের ভাষায় কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। বাংলার মোট জনসংখ্যার মোট ২৭ % মানুষ মুসলিম। এবার বিভিন্ন জেলার মধ্যে বাংলা ভাষার উপভাষাগত পার্থক্য তো আছেই সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্মের আচার আচরণ গত কিছু পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। উত্তর ২৪ পরগণায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা মালদহ , মুর্শিদাবাদ জেলাতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে যে ক ধরনের মুসলমান পাওয়া যায় সেগুলো হল –

১। হানাফী

২। সাফি

৩। আহমাদিয়া

মালদাহ ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে খোঁটা মুসলিম, বাদিয়া মুসলিমের খোঁজ পাওয়া গেছে। এদের ভাষায় আঞ্চলিক প্রভাব তো আছেই তাছাড়া কিছু অন্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার মত।

যেকোনো ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ যত কম অন্য ভাষা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসবে তত সেই ভাষা অপরিবর্তনীয়ভাবে আদি রূপটাকে সংরক্ষণ করে। কারণ ভাষার আদান- প্রদান সেক্ষেত্রে হবে না। সাধারণভাবে মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায় কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ঘরের কাজ সাধারণত মেয়রাই করে থাকে। এর ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে মেয়েদের যোগাযোগ কম হওয়ার দরুণ মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের ভাষার পার্থক্য হয়ে যায়।

মেয়েদের জগৎ অনেকসময়ই তাদের ঘর-কন্যা ও সংসারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে থাকে। এছাড়া ধর্মাচরণ ও আচার বিচার মেয়েদের পায়ে পায়ে বেড়ির মতো করে যেভাবে ঘোরে ছেলেদের তেমন নয়। প্রায় সমস্ত ধর্মেই স্ত্রী-আচার বলে একটা বিষয় ধর্মের সঙ্গে আলগাভাবে যুক্ত থাকলেও পুরুষ – আচার বলে কোনো কিছুই কোনো ধর্মে প্রায় নেই। কিন্তু ধর্মের মূল ফতোয়া ধর্ম গুরু বা প্রধান নিয়ম- নীতির মূল চালনা শক্তির আধার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় পুরুষেরা।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সমাজে অন্য অনেক উপকরণের মতো ধর্মও একটা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যার মূল ও মৌলিক বিষয় বিশ্বাস। কোরানের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। যাকে প্রশ্ন করার জায়গা কম। কারণ ইসলাম অনুসারে, কোরান অব্যর্থ, অপরিবর্তনশীল। তাই সেখানকার নির্দেশাবলীর প্রতিও বিনা প্রশ্নে আনুগত্য স্বীকার করার নিদান আছে। কোরানে স্বামীকে স্ত্রীর অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা তাদেরকে শ্রদ্ধা করার মত কথাও কোরানে আছে। কিন্তু প্রায় সব ধর্মের মতোই ইসলামেও ধর্মের, সমাজের, পরিবারের

ও পরিবারের কর্তার আনুগত্যের বিনিময়ে ভালো ব্যবহার সহানুভূতি শ্রদ্ধা পাওয়ার কথা প্রকারান্তরে বলা আছে ।

এই হল মোটামুটি কিছু মূল বিষয় শরিয়তের তাত্ত্বিক বিষয় যার উপর ভিত্তি করে ইসলামে মেয়েদের বৈষম্যমূলক দিকগুলি উঠে এসেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই শরিয়তি আইন কতখানি বাঙালি মুসলিম নারীকে, তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা তার ভাষা ব্যবহারের মধ্যে অনুসন্ধান করার প্রয়াস থাকবে। বাঙালি মুসলিম মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার হার বাঙালি মুসলিম ছেলেদের তুলনায় বেশি। প্রাথমিক শ্রেণিতে তাদের ড্রপ আউটের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় কম। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় যে, বাড়ির ছেলেদেরকে অনেকসময়ই পরিবারের অর্থাগমের জন্য রোজগারের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। কেউ কেউ বাবাকে কাজে সাহায্য করে আর কেউ বা অন্য কোনো শহরে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়। যা মেয়েদেরকে দিয়ে করানো হয় না। ফলে মুসলিম মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার হার বেশি। কিন্তু এর পাশাপাশি মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার চল এখন বেশি। আগের প্রজন্মের অনেকেই, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষদের মধ্যে নারী পুরুষ কেউই কোরান নামাজ সম্পর্কে জানে না। প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে অনেকে রোজাও রাখেন না। তবে এখন কম বয়সি মেয়েদেরকে শরিয়তি শিক্ষা দিতে তৎপর বেশ কিছু পরিবার। তার একটা কারণ বিভিন্ন খবরের কাগজের পাত্র - পাত্রীর বিজ্ঞাপনের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। ‘নামাজী কোরান জানা মেয়ে’ একটি বিশেষ এবং অতিরিক্ত গুণ হিসেবে যুক্ত হচ্ছে ইদানীং মুসলিম বিয়ের বাজারে। তবে এই ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের ক্ষেত্রে, আরবি ভাষার বিবিধ পুস্তকগুলি শুধুমাত্র “রিডিং” পড়তে শেখানো হলেও আরবি ভাষা অর্থাৎ তার অর্থ তারা প্রায় কেউই জানে না। অন্ধের মতো অর্থ না জেনে সেগুলো পড়তে থাকে তারা। ছেলেদের অনেককেই হাফেজ

পড়ানো হয়। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে হাফেজ ইমাম বা মৌলোবী যেহেতু তারা হতে পারে না, তাই সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের চর্চার ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

কোরান, আমপারা বা কিতাবের ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে অজু করে মাথার চুল ঢেকে, পায়ের গোড়ালি অবধি ঢেকে নিষ্ঠা সহকারে পড়তে হয়। অনেকক্ষেত্রে কোনো মেয়ে কোরান পড়তে না জানলে শ্বশুর বাড়িতে এসে তাকে কোরান পড়া শেখানো হয়। তবে নিম্নবিত্ত পরিবারে সেটা খুব একটা হয় না। তাদের জীবন যুদ্ধের সংগ্রামে এইসবের জন্য সময় মনোযোগ নেই।

মুসলিম মেয়েদের বিয়ের বয়সেরও রকমফের আছে। মুর্শিদাবাদ মালদহতে মেয়েদের বিয়ের বয়স তুলনামূলক কম। গ্রামের দিকে স্কুলের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে যায়। কেউ কেউ কলেজের প্রথম দিকে আর খুব কম জনই কলেজের গভি পেরোতে পারে। এদের বেশিরভাগেরই আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয়। তুলনায় উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মেয়েদের বিয়ের বয়স কিছুটা বেশি। আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারব যে এই চার জেলায় মুসলিম মেয়েদের পরিস্থিতির একটা বড়োসড়ো পার্থক্য আছে। ইসলামে, কয়েকটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর কয়েকটি সম্পর্কের মধ্যে নিজেদের আত্মীয়- স্বজনদের মধ্যে বিয়ে বৈধ। যেমন – নিজের মামা, কাকা, ভাই, দাদা, বিমাতা, সৎ বাবা, স্ত্রীর বোন বা দিদি, শাশুড়ি, শ্বশুর ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিয়ে অবৈধ। এছাড়া অন্য সম্পর্কগুলোর মধ্যে বিয়ে বৈধ।

মুর্শিদাবাদ মালদা বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলে মুসলিম বিয়েতে পণের রেওয়াজ সাংঘাতিক মহামারীর মতো আকার ধারণ করে আছে এখনো। অথচ, ইসলামে শরিয়ত অনুযায়ী এই পণ নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সেখানে দেনমোহরের কথা আছে, যা বিয়ের সময় চুক্তিপত্রে বলা হলেও বাঙালি মুসলিমরা অনেকে এই দেনমোহর স্ত্রীদেরকে আর ফেরত দেয়

না, তা শুধু নাম মাত্র উল্লেখিত হয়ে থাকে চুক্তিনামায়। তবে তালাক বা ডিভোর্সের সময় এই দেনমোহর ফিরিয়ে দেয় অনেকেই। উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা ইত্যাদি জায়গায় পণের চল কিছুটা কম। অন্তত প্রকাশ্যে বিয়ের সময় দাবি হিসেবে পণ থাকে তুলনামূলকভাবে কম পরিবারে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কৌশলে বিয়ের আগে বা পরে উপহার সামগ্রী হিসেবে পণেরই প্রায় নামান্তর বিভিন্ন দামী দামী জিনিস দেওয়া হয় পাত্রপক্ষকে।

আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম একক হল পরিবার। ধীরে ধীরে যৌথ পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তৈরি হচ্ছে ভারতের সর্বত্র। কখনো কাজের সুবিধের জন্য কখনো বনিবনা না হওয়ার জন্য যৌথ ব্যবস্থা ভাঙছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে। গ্রামের দিকে যাদের জমি-জমা পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস তাদের ক্ষেত্রে এখনো যৌথ পরিবার আছে। বা পারিবারিক ব্যবসা থাকলে তাও অনেকক্ষেত্রে একসঙ্গে থাকার কারণ। শহর অঞ্চলে যারা কাজের চাকরির জন্য এসে থাকছেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের আলাদা সংসার পাতেন। তবে গ্রামের দিকে এখনো বহু পরিবার একসঙ্গে থাকে। পারিবারিক গঠন মানুষের জীবন-যাপনে প্রভাব ফেলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে আরোও বেশি ফেলে। শ্বশুর বাড়ি এবং ‘বাপের বাড়ি’ এই দুই জায়গাতেই রেজিস্টার পরিবর্তন হওয়ায় তাদের ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এছাড়া অনেকসময়েই দেখা যায়, শ্বশুর বাড়িতে অন্যরকম ভাষার প্রচলন থাকলে তাদের ভাষাতেও তার প্রভাব ফেলে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ – ব্যবস্থায় পরিবারের প্রধান হয় সাধারণত সবথেকে প্রবীন পুরুষ বা অনেকসময় রোজগারে স্বাবলম্বী পুরুষ যার রোজগারে সংসার চলে। ইসলাম ধর্মেও তার ব্যতিক্রম নেই। স্বামীর খেদমত করা, শ্বশুর – শাশুড়ীর খেদমত করা মুসলিম নারীরা তাদের পালনীয় বিধির মধ্যেই মনে করে থাকে। এবং লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল বিবাহিত নারীদের শ্বশুর বাড়ি ও বাপের বাড়িতে কথা বলার ধরন বেশ কিছু ক্ষেত্রে আলাদা, আবার তাদের

সঙ্গে অবিবাহিত মেয়েদের কথার ভঙ্গিতেও বেশ পার্থক্য ধরা পড়ে। শ্বশুর বাড়িতে, বিশেষ করে যৌথ পরিবারে মেয়েদের কথার মধ্যে সিদ্ধান্তের বদলে বেশিরভাগ সময়ই অনুমতি প্রার্থনা বা সংশয় এর আভাস পাওয়া যায়। যেমন –

১। “ম্যাঘ ল্যাগিছে মনে হচ্ছে? ল্যায় ? কাপড়গুলান তুলে আনবো?” (মাফুজা বেগম মুর্শিদাবাদ, সালার)

২। “জানিনা বুন। বড়োদের মুখে মুখে তর্ক করতে নাই। যা বলে শুনতে হয়।” (হাজেরা বিবি, মুর্শিদাবাদ)

ঘর – গৃহস্থালি, সংসার ইত্যাদি বিষয় দিয়েই বেশিরভাগ সময় তাদের চিন্তা ভাবনা আবর্তিত হয়। ভাষার মধ্যেও আমরা সেইসব বিষয়ই উঠে আসতে দেখি। এছাড়া অবিবাহিত মেয়েদের ভাষার বিষয় ও বিবাহিত মেয়েদের কথার বিষয়ের মধ্যেও পার্থক্য থাকে।

ছোটো থেকে মেয়েদের মধ্যে তাদের জীবন যাপনের মূল উদ্দেশ্যকে সচেতনভাবে ও কখনো সামাজিকভাবে চেতনায় গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত ভাবনাকে অসচেতনভাবে তাদের মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়ার একধরনের সামাজিক অভ্যাস প্রায় সব ধর্মের মধ্যেই খেলা করা যায়। মেয়েদের কাছ থেকে বীরত্ব বা সাহস প্রত্যাশা করা হয় না। তাদের কাছে সামাজিক ও সাংসারিক কাজে দক্ষতা দাবি করা হয়। বীরত্বের বদলে নমনীয়তা, শান্ত স্বভাব ও বাধ্যতা আশা করা হয়। ফলে ভুল না করে ফেলার বা নিজেকে নিখুঁত হিসেবে তুলে ধরার এক দায় তাদের ভাষার মধ্যেও ফুটে ওঠে। এছাড়া মেয়ে হয়ে জন্মেছো, পরের বাড়িতো যেতেই হবে – এইরকম শব্দ বা বাক্য বন্ধ পরিবার বা আত্মীয় – স্বজন বা পাড়া – প্রতিবেশি বা সমাজের থেকে বা এই সব জায়গা থেকেই শুনে বড়ো হতে হয়নি এমন মেয়ে এই দেশে বিরল। ফলত, পরিবারের লোকজনও কোথাও মেয়েদেরকে সেই ‘পরের বাড়ির’ মতো করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এবং যা যা তার বাড়িতে মেনে নেওয়া হচ্ছে

তার অনেক কিছুই সেই পরের বাড়িতে মেনে নেওয়া হবে না – এই সত্য ধারণা নিয়ে বেশিরভাগ মুসলিম মেয়েও বড়ো হয়ে ওঠে। তাছাড়া তাদের সামনে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবেও অনেক সময় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় এক সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবিকে, যেখানে সেই সুখ, সেই শান্তি তাকে অর্জন করতে হবে তার বিবিধ শখ আহ্লাদ ও সর্বোপরি বিভিন্ন বিষয়ে তার ত্যাগ ও আডজাস্টমেন্টের বদলে। এবং পড়াশোনাটাও অনেকক্ষেত্রে এই বৃহৎ প্রকল্পেরই একটি অংশমালা। যেভাবে তাকে ঘরের কাজ জানতে হবে, সেলাই জানতে হবে, নামাজ পড়তে জানতে হবে সেইভাবেই তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকুও পেতে হবে তার হবু স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির উপযুক্ত হওয়ার জন্য।

তবে এই প্রবণতা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মেয়েদের জন্যই এই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে আর্থ-সামাজিক – সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো, শিক্ষার হার ইত্যাদি বিষয়ের হেরফেরে তারতম্য ঘটে যায় বেশ কিছু বিষয়ে। মুসলিম মেয়েদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ কথোপকথন ঘটে নিজেদের অন্দরমহলে মেয়েদের সঙ্গে, বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে। এছাড়া পরিবারের বাইরে নিজেদের ধর্মের লোকজনের সঙ্গে ও একেবারে বাইরে অপরিচিতদের সঙ্গে।

প্রতি ক্ষেত্রে রেজিস্টার পরিবর্তিত হওয়ায় তাদের ভাষাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। বাংলা ভাষার মধ্যে আরবি ফার্সি উর্দু হিন্দি চিনা ইংরেজি পর্তুগিজ ওলন্দাজ সংস্কৃত ইত্যাদি বহু ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে এবং তা বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করেছে। তবে ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ কোরান আরবিতে রচিত হওয়ায় ও অনুশাসন আচার গুলোর প্রধান মাধ্যম আরবি ভাষা হওয়ায় মুসলিমদের মধ্যে আরবি শব্দের ব্যবহার বেশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে। এছাড়া, ফার্সি উর্দু শব্দের ব্যবহারও তাদের মধ্যে কিছু বেশি ধর্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে। মেয়েদের মধ্যে এই শব্দগুলোর সংরক্ষণ আরো বেশি। মেয়েরা যখন একেবারে নিজেদের

মধ্যে কথা বলে, তখন অনেকক্ষেত্রে তাদের বাক্য গঠন, শব্দ চয়ন আলাদা হয়। অনেক বেশি ইঙ্গিতপূর্ণও হয়। বিভিন্ন ধ্বন্যাত্মক শব্দের নিজস্ব ব্যবহারও তাদের মধ্যে বেশি থাকে। সব বয়সী মেয়েদের ভাষাও একরকম নয়। সব অঞ্চলেরও নয়।

মুর্শিদাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের যে মেয়েটি স্কুলে যায় না দারিদ্রের জন্য, বিড়ি বেঁধে সংসারের অর্থাগামে সাহায্য করে এবং জানে তার জীবনের চরম সফল রূপটা হল একটা নিরাপদ সাংসারিক জীবনের বলয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, তার ভাষা আর দক্ষিণ ২৪ পরগণার যে মেয়েটি কলেজের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনাগত জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকে তাদের দুজনের ভবিষ্যতের ছবিরও যেমন মিল নেই, ভাষাতেও নেই। দুজন বাংলা ভাষাতে কথা বললেও। আঞ্চলিক প্রভাব কাটিয়েও, আর্থিক বৈষম্যের স্তর ভেদ করেও তাদের চেতনায় যে মিলটাকে খুঁজে পাবো তা তাদের বাঙালি মুসলিম মেয়ের এই পরিচিতিটাকে।

মুসলিম মেয়েদের অন্তঃপুরের শিক্ষা

প্রথাগত শিক্ষা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই পরিবার থেকে আমাদের শেখা শুরু হয়ে যায়। অন্তঃপুরের শিক্ষা পরিবারের এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের মেয়েদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এবং এই অন্তঃপুরের কাঠামো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পালটে যায়। পালটে যায় তার গতি প্রকৃতি বিষয়বস্তুও। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে এই অন্তঃপুর তৈরি হয়েছে। ফলে অনেকসময়ই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাষ্যই অন্তঃপুরে ঘোষিত ও প্রবর্তিত হতে থাকে। মুসলিম সমাজের অন্তঃপুরও ব্যতিক্রমহীনভাবে উপরোক্ত কথার প্রতিধ্বনি করে। তবে তার বিশেষ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে নির্দিষ্ট আর্থ - সামাজিক ধর্মীয় পরমন্ডলে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা মারাত্মক পিছিয়ে। তাদের সঙ্গে অবাঙালি উচ্চবিত্ত আশরাফ মুসলমানদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। এরা বেশিরভাগ

ক্ষেত্রেই নিম্নশ্রেণির হিন্দু। যাদের হিন্দু ধর্মে কোনো সম্মান ছিল না। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে আমাদের দেশে যখন ইংরেজি শিক্ষা চালু হল, নানা কারণে মুসলিমরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারল না। উনিশ শতকের নবজাগরণের কোনো আলোই বাঙালি বুভুক্ষু দরিদ্র শ্রমজীবী মুসলিমদেরকে স্পর্শ করেনি সেভাবে। সেই সময় মেয়েদের পড়াশুনা এমনিতেই নিষিদ্ধ ছিল হিন্দু ইসলাম সব ধর্মেই। তবু ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু মেয়েদের লেখাপড়ার কথা ভেবে হিন্দু সমাজের অনেকে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু মুসলিম সমাজে যেখানে পুরুষরাই পড়াশুনা থেকে দূরে রইল সেখানে মেয়েদের প্রথাগত শিক্ষা শুরু হতে লেগে গেল অনেকটা সময়। মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরো ভয়ানক হল। ইসলামে মেয়েদের পর্দা প্রথা ও অবগুণ্ঠনের নির্দেশ আছে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এক অন্তঃপুর তৈরি হতে যা সাহায্য করে। যার উত্তরাধিকার এখনকার মুসলিম মেয়েরাও খানিক বহন করে চলেছে। এখন এই অন্তঃপুরের পাশাপাশি প্রথাগত শিক্ষাও তারা গ্রহণ করছে। স্কুল মাদ্রাসা কলেজ ইউনিভার্সিটি ইত্যাদিতে তাদের যোগদান বাড়ছে। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা সহ সামাজিক আদব কায়দার সিংহভাগের পাঠ এখনো বাড়ির অন্তঃপুরেই হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূল সাধারণত প্রোথিত থাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুষুম্নাকান্ডের মধ্যে। সমাজ এবং ধর্ম উভয়েই উভয়কে পুষ্ট করে। এবং প্রচলিত সমাজের নানা বৈষম্য ও আচারকে প্রশ্ন না করে মেনে চলার প্রথম পাঠ মেয়েরা গ্রহণ করে পরিবার থেকেই, সমাজ থেকেই, অন্তঃপুর থেকেই। ফলে মেয়েদের সার্বিক জীবন যাপনে অন্তঃপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাদের নিজস্ব জগৎ, একান্ত খোলামেলা আড্ডারও জায়গা এই অন্তঃপুর।

‘অন্তঃপুর’ এই শব্দটির দিকে মনোনিবেশ করলে দেখতে পাব, বাড়ির মধ্যে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত একটি বিশেষ স্থান হল অন্তঃপুর। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘অন্তঃপুর’ শব্দটির অর্থ করেছেন, পুরের মধ্যস্থ পুর ; রাজস্বীগণের গৃহ, অবরোধ, অন্তরমহল। অর্থাৎ বাইরের

সবার গতিবিধি সেখানে নেই। এবং অনেকক্ষেত্রে অন্তঃপুরচারীরা বাইরে সর্বসমক্ষেও সবসময় বেরোন না। বাড়ির মধ্যে নিজেদের, শুধু মেয়েদের এক জগৎ।

পরিবারের সাধারণ কাঠামোর মধ্যেই নারীকে অধস্তন হিসেবে রাখা হয়েছে। আর তাকে প্রতিনিয়ত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে সাংস্কৃতিকভাবে নির্মাণ করে চলা হয়েছে, হচ্ছে। এই অনৈতিক অমানবিক কাঠামোকে ধর্মীয় তত্ত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হল। সমস্ত ধর্মের মধ্যেই নারীর এই অবদমনকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। নারীর থেকে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হল। আরবে উৎপন্ন ইসলাম ধর্মও নারীর অবস্থান সম্পর্কে ভিন্ন কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। বরং তা বহু ক্ষেত্রেই নারী স্বাধীনতার সাংঘাতিক বিরোধী। ফলে নিশ্চিহ্নভাবে এক অন্দরমহল বা অন্তঃপুর তৈরি হতে পারল। যেখানে মেয়েদের এক নিজস্ব জগৎ নির্মিত হল। এই অন্তঃপুর মুসলিম মেয়েদের চেতনা ভাবনা মনন নির্মাণে অনেকখানি সাহায্য করল। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা অন্তঃপুরের গঠন প্রকৃতি ও অবিকৃত নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বদল ঘটে। তবে এই অন্তঃপুরের শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে পরম্পরার মত করে এগিয়ে চলে। এখনকার আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম নারীর মধ্যেও তার উত্তরাধিকারের বীজ পাওয়া যাবে। যার প্রতিফলন আমরা তাদের ভাষাতে পথেয়াল করব। আধুনিক সময়ে তা গ্রহণ করা বা না করা অনেকসময়ই কিছু আলোকপ্রাপ্তা শিক্ষিত নারীর সিদ্ধান্ত হতে পারে, যার সুযোগ আগে খুবই কম ছিলরো

কিন্তু প্রথাগত স্কুলের শিক্ষার থেকেও আর এক ধরনের শিক্ষা মেয়েরা তাদের পরিবার থেকে পায়। পরিবারের অন্তঃপুর থেকে পায়। এই অন্তঃপুর আসলে পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় নির্মিত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা প্রচলিত সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর একটা বিষয় আমরা খেয়াল করলে দেখব, ধর্মীয় আচার অনুশাসনের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য মেয়েদের কাছে যেরকমভাবে আশা করা হয়, পুরুষদের কাছে তেমন নয়।

বাঙালি মুসলমান সমাজে শরিয়ত এর কঠোরতা মেনে চলার প্রবণতা এমনিতেই কম। তবে ধর্মীয় অনুশাসন মেয়েদের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি।

এ প্রসঙ্গে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে লেখা আবদুর রহমানের প্রবন্ধে^১ মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। এই সময় থেকে আমরা বহুদূরে এসে দাঁড়িয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ে মুসলমান সমাজ ও তাদের নারীদের অবস্থানেরও পালা-বদল ঘটে গেছে অনেক। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রারম্ভে মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা সম্পর্কে এই মতামত আমাদেরকে এই সমাজের নারীদের অবস্থান ও নারী শিক্ষার উপলক্ষকে বুঝতে সাহায্য করবে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যত দ্রুত মুসলমান নারীদের শিক্ষার অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল শোচনীয় আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে তা হয়ে ওঠেনি। ফলে অনেকক্ষেত্রেই এই মানসিকতা অনেক পরিবারের অন্তঃপুরেরই ভিত্তি হয়ে রয়েছে।

এখনও মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুরে মেয়েদেরকে উপরোক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কোরান পাঠ শেখানো হয়। অনেক সময় দেখা যায় ‘নামাজ শিক্ষা’ নামক ধর্মীয় বিধি সম্বলিত বই ও তাদের জন্য নির্ধারিত থাকে। কিতাব, আমপারা ও তারপর কোরান – এইভাবে ধর্মীয় আরবি বই পড়ানো শেখানো হয়। এছাড়া অনেক বাড়িতে হাদিস এর বই রাখা থাকে। যা একজন পড়ে ও বাকিরা শোনে।

এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসন যেমন –

১। মেয়েদের জোরে হাসতে নেই। বা হাসলেও সেই হাসি যেন অন্তঃপুরের মধ্যেই থাকে, বাইরে সেই হাসির শব্দ না পৌঁছানোই সমুচিত। হাসি মানুষের খুবই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু মেয়েদের যাবতীয় স্বতঃস্ফূর্ততাকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ভয় পেয়ে এসছে। তাই হাসির উপরও ফতোয়া জারি থাকে বিভিন্ন পরিবারে। মুসলমান পরিবারেও মেয়েদের

উচ্চকিত হাসির বদলে শব্দহীন বা মৃদু শব্দে স্মিত হাসি হাসতে বলা হয়, বিশেষ করে জনসমক্ষে।

২। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই। গলার আওয়াজে স্বরক্ষেপণে যথাসম্ভব নম্রতা আশা করা হয়। জোরে কথা বলা ছেলেদের জন্য অনেকসময় ব্যক্তিত্বের বা দৃঢ়তার পরিচয় হলেও একই ব্যবহার মেয়েদের জন্য অভব্য আচরণের মধ্যে পড়ে।

৩। হাঁটাচলা হবে মৃদু। অন্যান্য আচরণেও কোনোরকম দারুণ এর পরিবর্তে শান্ত নমনীয়তাকে মেয়েদের ভূষণ বলে দাগিয়ে দেওয়ার রাজনীতি অন্তঃপুরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম সাফল্য।

৪। বড়োদের সামনে বিশেষ করে বাড়ির পুরুষ অভিভাবকদের সামনে যথাসম্ভব নম্র ব্যবহার রাখা। তাদের অভিভাবকত্ব অনুশাসন ও আদেশকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়াকে আদর্শ ও ভালো মেয়ের উদাহরণ হিসেবে সামনে রাখা হয়।

৫। পুরুষের যেমন বাইরেটাই সহজ পরিসর, উল্টোদিকে অন্তঃপুরের আবেষ্টনীকেই মেয়েদের সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। সেখানে যখন তখন রাস্তা-ঘাটে যাওয়া বা বাড়ির বাইরে আড্ডা দেওয়া, অনেকক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকা মেয়েদের জন্য সহবতের অভাব হিসেবে ধরা হয়।

৬। বাড়ির পুরুষ সদস্য ছাড়া অন্যান্য পরিবার বহির্ভূত পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা নিন্দনীয়। প্রয়োজন অনুসারে দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলার অনুমোদন থাকলেও নারীপুরুষের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ সাধারণত থাকেনা মুসলমান পরিবারে। বরং তা গর্হিত অপরাধ হিসেবেই ধরা হয় অনেকসময়।

৭। এছাড়া অনেকসময় দেখা যায় যে পরিবারের খালা, ফুপু বা মামার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা বা সম্পর্ক খুব খোলামেলা নয়। তার একটি কারণ বোধহয় এই যে এইসব সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বৈধ ইসলামে। তাই সাধারণ ভাই বোন এর সম্পর্ক হলেও ভাই বোনের মত সহজ সরল সম্পর্ক হয় না। দূরত্ব বজায় থাকে। আর এই শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ দান অন্তঃপুর থেকেই মেয়েরা পেয়ে থাকে।

৮। মুসলিম পরিবারে বড় ভাইদেরকেও সমীহ করার প্রবণতা দেখা যায়। এবং বাড়ির বড়ো ভাইদের যে অবস্থান, তা বোনদের থাকেনা। অনেকসময় বড়ো দিদি হোক বা বোন হোক দাদা বা ভাইদের টুকিটাকি কাজ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভারও মেয়েরা নিয়ে থাকে। তাদের ঘর গোছানো, ঘর সাজানো, অনেকসময় জামা-কাপড় কেচে দেওয়া, গুছিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কোনো ব্যক্তির গৃহকর্মের একেবারে নিজস্ব কাজগুলোর দায়িত্ব অর্পিত হয় মেয়েদের উপর। এবং অন্তঃপুরের শিক্ষা এই বৈষম্যকে মেয়েদের কাজের অন্তর্ভুক্ত করে তাকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে নিতে শেখায়।

৯। কিছু অভিজাত ও উচ্চবর্ণের মুসলিম পরিবারে বড় ভাই আপা আব্বা মা দের কেও আপনি বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ আছে। আর এই সম্বোধনের শিক্ষা তারা অন্তঃপুর থেকেই পায়।

১০। ইসলামে প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের মাথার চুল, পায়ের গোড়ালি অবধি ও পুরো হাত ঢেকে রাখার নির্দেশ আছে। তবে এই নির্দেশ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব শিথিল পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে। তবে আজান দেওয়ার সময় মেয়েরা মাথা ঢেকে ফেলে। এই শিক্ষা অন্তঃপুর থেকেই আসে। অনেক সময় ছোটোরা বড়োদের অনুকরণ করেও শেখে।

১১। এছাড়া গৃহস্থ প্রতিপালনের শিক্ষাও তাদের দেওয়া হয়। ঘরের কাজকর্ম জানা, রান্না করতে জানা এবং ইসলামিক ঐতিহ্যপূর্ণ খাবার দাবার, পিঠে ইত্যাদি বানাতে শেখা এসমস্তের পাঠই অন্তঃপুর থেকেই তারা পায়।

১২। এছাড়া কলেমা পড়ানো শেখানো হয়। হাদিস কোরান সম্পর্কে জানানো হয়। সেখানে মেয়েদের কী কী কর্তব্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেই সম্পর্কে জ্ঞান-দানও বাড়ির অন্তরমহলেই হয়। নামাজ, রোজা মহরম বা অন্যান্য বিশেষ রোজা করতে শেখে তারা অন্তঃপুর থেকেই। ইসলামিক বিধিতে কোনটা ফরজ বা অবশ্য পালনীয় বিধি কোনটা সুন্নত বা ঐচ্ছিক সেসব সম্পর্কে ধারণাও তারা এখান থেকে পায় বেশিরভাগ সময়।

মেয়েদের ঋতুস্রাব চলাকালীন কোন কোন ধর্মীয় আচারে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেনা, এসময় কী কী করণীয় বিধি তার ধারণাও এখান থেকেই পেয়ে থাকে। কোনো কোনো জায়গায় ঈদের দিন মেয়েরা বাড়িতে নামাজ পড়ে। সেখানে নামাজের নির্দেশ ও নেতৃত্ব দেয় একজন, যিনি ঈদের নামাজ পড়াতে পারদর্শী। এই নামাজ পড়াটাও নবীন প্রজন্ম শিখে নেয় তাদের থেকে।

ইসলামিক শিক্ষা বাঙালি মুসলমান পরিবারে ছেলেদের জন্য বেশ শিথিল। (ইদানীং অবশ্য ছেলেদের কোরান হাদিস জানাটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে) তাদের কোরান হাদিস জানা নিয়ে খুব কড়াকড়ি নেই সব পরিবারে, তুলনায় দেখা যায় এগুলো মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত গুণ হিসেবে যুক্ত হয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন অংশে মেয়েদের ক্ষেত্রে গৃহকর্মে নিপুণা লেখার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের ক্ষেত্রে নামাজী ধার্মিক হিসেবে উল্লেখ করে বিয়ের জন্য আবেদন করা হয়। উল্টোদিকে ছেলেরাও নামাজী ধার্মিক মেয়ে চাই বলে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।

আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো মেয়ে বিয়ের আগে কোরান হাদিস না জানলে বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়ির অন্তঃপুরে তাকে সেই শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এরকম নজির খুব একটা দেখা যায় না।

১৩। গৃহকর্মের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক শিক্ষা হিসেবে সেলাই- ফোঁড়াই, নকশী কাঁথা সেলাই, টেবিল ক্লথ তৈরি, উলের কাজ, সুর করে গজল বলতে শেখানো, কোরান তলোয়াত বা আবৃত্তি করা ইত্যাদি শেখানো হয়।

১৪। বড়োদের মুখে মুখে তর্ক করা বা কোনো কিছুর প্রতিবাদ করা সহবতের অভাব হিসেবে ধরা হয়। তাদের সামনে হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি জোরে কথা বলা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে।

১৫। অনেকসময় শুধুমাত্র ঘরের মহিলা সদস্য ছাড়া অন্য যে কোনো পুরুষ সদস্যের সামনে আসতে মেয়েরা ওড়না ইত্যাদি পরে আসে যা ইসলামিক আদব কায়দার মধ্যে পড়ে।

১৬। তমিজ বা আচার-আচরণ সংক্রান্ত কড়া অনুশাসন মুসলমান পরিবারগুলোতে থাকে। এবং সেই নিয়ম মেয়েদের জন্য শিথিল নয়।

১৭। বিভিন্ন আত্মীয়বাচক সমস্ত শব্দ যা কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালির থেকে আলাদা সেগুলোও ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে পরিবার বা অন্তপুর থেকেই শেখে। যেমন –

বাবা- মা

মা – মা/ আম্মা

দাদা- ভাইয়া

দিদি- আপা, বুবু

শ্বশুর – আব্বা

পিসি – ফুফু/ বেটি/ ফুম্মা

মাসি – খালামা

মেসো- খালু

জ্যাঠা- বড়ো আব্বা

কাকু – কাকা/ চাচা

জ্যাঠি- বড়ো মা

জামাইবাবু – দুলাভাই

ইত্যাদি মুসলমান পরিবারের নিজস্ব আত্মীয়বাচক শব্দ তারা পরিবারের পুরমহিলাদের কাছেই শেখে। কিছু পরিবারে বাবা মা ভাই বোন স্বামী – সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই ‘আপনি’ সম্বোধনে ডাকা শেখানো হয়।

১৭। অনেক বনেদি পরিবারে বড়োদের কথার উত্তরে ‘জি’ বলে সাড়া বা উত্তর দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এছাড়া বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে যারা গুরুজন তাদেরকে উপযুক্ত সম্বোধনের শেষে ‘জি’ যুক্ত করে ডাকার প্রবণতা আছে। যেমন- আম্মাজি, আব্বাজি, ফুপাজি, ইত্যাদি।

১৮। এছাড়া কারোর সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় ইসলামি কায়দায় আসসালামু আলাইকুম ও প্রত্যুত্তরে অলাইকুমাসসালাম বলার রীতি শেখানো হয়।

১৯। পারিবারিক সমস্ত অসুবিধের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে তাকে চলতে হবে - এই গুরুভারের কৃতিত্বের স্বপ্ন দেখানো শুরু হয় অন্তঃপুরেই। তার ফলে মেয়েরা এটা জেনেই বড়ো হতে শুরু করে যে তারা সমাজে পরিবারে যতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে, নিজেদের জায়গা

শখ আহ্লাদ এর বিনিময়ে যতটা অন্যেদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে ততটুকুই তার মূল্য রূপে পরিগণিত হবে। একটি একক ব্যক্তি হিসেবে নিজের জীবনে নিজের কিছু করা নয়, নিজের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে নয়, অন্যের জীবনের হাসি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জোগান দেওয়ার মধ্যেই তার জীবনের সার্থকতা। এই পরিকাঠামোর সঠিক ও সুসম্পন্ন বাস্তবায়নের জন্য এরকম একটি কথাও অন্তঃপুরে জানানো হয় যে মেয়েদের সহ্য করার ক্ষমতা বেশি, তাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাও বেশি। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের জীবনে তারা নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়েও পরিবারের সকলের কথা ভাবার মতো মানসিকতা অর্জন করে।

১৯। মুসলমান অন্তঃপুরের অনেক শিক্ষার মধ্যে একটি বিষয় এটাও থাকে স্বামীর খিদমত করা, তার সেবা করা, তার মনোরঞ্জন করা। স্বামীর ঘরই তার ঘর তার পরিবারের আনন্দই তার জীবনের লক্ষ্য –এই ভাবনা অচিরেই তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রবণতা থাকে।

ফলে অনেকক্ষেত্রেই তার জীবন আবর্তিত হয় অনাগত ও কল্পিত দাম্পত্য জীবন ও শ্বশুর বাড়িকে ঘিরে। ছেলেরা যেখানে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে জানে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, কঠিন ও রুঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকা সেখানে মেয়েদের মধ্যে এক অতি তরল, বাস্তব-জীবন বোধ রহিত একটি ভাবালুতা দেখা যায়। এবং স্বামী সংসার থেকে অনুমোদন লাভকেই জীবনের মোক্ষ হিসেবে ভাবতে থাকে। তার আত্মরক্ষা ও গ্রাসচ্ছাদনের সমস্ত ভার অন্যের উপর দিয়ে তার বিনিময়ে সংসারে বিনা মূল্যে উদয়াস্ত খেটে নিজের জীবনের সার্থকতা খোঁজার চেষ্টা করে। সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা, শরিয়তি আচার-আচরণের সূক্ষ্মতাকে অবলম্বন করে জীবন-ধারণ করে। নিজেদের এই ছককেই তারা আদর্শ মেয়ের জীবনধারণের উপায় হিসেবে জানে। অনেকসময়ই অন্য মেয়েদের মধ্যে এর অনুপস্থিতি তাদেরকে পীড়া দেয় এবং এই অন্য রকমকের, ছক ভাঙাদের প্রতি তারা

বিদ্বৈষভাবাপন্ন হয়। এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ একটি মেয়েকেই অন্য মেয়ের বিরুদ্ধে দাড়া করিয়ে দেয় সুকৌশলে।

কোনো মেয়ে যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন তার “বাপের বাড়ি” অনেকাংশেই ‘শ্বশুর বাড়ি’র উপযোগী বউ, স্ত্রী, মা এবং আরো নানাবিধ সম্পর্কের চরিত্র যাতে সুসম্পন্ন করে তুলতে পারে তার একটি প্রশিক্ষণশালার মতো কাজ করে। যেখানে তার মূল দপ্তরে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী মেনে কাজ শিখতে হয়। এবং ভুল হলে আমরা দেখি যে চেনা কথা-

“পরের বাড়ি যেতে হবে না?” বা “পরের বাড়ি এসব মেনে নেবে?”

বা “শ্বশুর বাড়ি গেলে বুঝবে কত ধানে কত চাল” – এই সমস্ত সতর্কতা ও সাবধান বাণী শুনেই পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় প্রতিটা মেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। বাঙালি মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুরও সেই প্রকল্প নিয়েই কোনো মেয়েকে বড়ো করে তোলে। শুধু যেরকমভাবে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যপ্রণালী ও তাদের প্রশিক্ষণ আলাদা হয় সেরকমভাবে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মেয়েদের প্রশিক্ষণে কিছু পার্থক্য থেকে যায়। তা মূলত ধর্ম কেন্দ্রিক, শরিয়তি নির্দেশ নির্ভর যেগুলো। আর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এখানকার মেয়েদের বিয়ের বয়স, সাক্ষরতার হার উভয়ই কম বলে এদের উপর এই প্রকল্পের বোঝা অনেক ভারী হয়ে দেখা দেয়। আর সমস্ত নিয়ম রীতিকে প্রশ্ন করতে শেখানোর মতো মুক্ত চিন্তা-ভাবনার বাতায়ন তৈরি হয়না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ফলে যা তারা মেনে এসছে, কেন মানবে বা কেন মানছে এইসব প্রশ্ন ব্যতিরেকে তাদের শিক্ষা তারা অন্য প্রজন্মকে দিয়ে যায়। তবে প্রথাগত ইসলামিক শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে স্কুল কলেজে তাদের যোগদান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তি আইনের সংস্কারের বিভিন্ন দাবি তারা জানাচ্ছে। ইন্সট্যান্ট তিন তালাক থেকে শুরু করে নিকাহ-হালালার মতো প্রচলিত শরিয়তি ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সারিতেই তাদের কণ্ঠস্বরকে

আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই কণ্ঠস্বরের সংখ্যা কম হলেও তাদের এই নতুন ভূমিকা সমস্ত মুসলমান সমাজকে বিশেষত নারীদের উজ্জীবিত করছে নিঃসন্দেহে।

একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন অন্যদিকে সমাজ মেয়েদেরকে নির্মাণ করে সুচারুভাবে। একটি ছেলে আর মেয়ের অন্তর্জগৎ তাই বেশিরভাগ সময়ই পৃথক হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. বেবেল, অগাস্ট, নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে, অনুবাদ কনক মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯০, পৃ. ১২

২. জাহান, সেরিনা, *একেবারেই মেয়েলি কথা*, আকাদেমি পত্রিকা ৮, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৫

৩. Eaton, Richard M. The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, London, 1993, P. 117

“ Migration theory

Religion of the Sword thesis, stresses the role of military force in the diffusion of Islam in India and

A third theory commonly advanced to explain Islamization in India is what I call the Religion of Patronage theory

To this end a fourth theory, which I call the Religion of Social Liberation thesis, is generally pressed into service ”

৪. হক, এনামুল, বঙ্গে সূফী প্রভাব, রায়মন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ.

“কোনো প্রামাণিক ইতিহাসের অভাবে, বঙ্গদেশে কোন সময় হইতে সর্বপ্রথম সুফী-প্রভাব পড়িতে আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ভারতে সুফী-প্রভাব পড়িতে আরম্ভ করে। ভারত তখনও স্থায়ীভাবে মুসলমান কর্তৃক বিজিত হয় নাই; অতএব একভাবে বলিতে পাড়া যায়, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব হইতেই ভারতে সুফী-প্রভাব পড়িয়াছিল, এবং মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তাহা হইলে কি এই সময় হইতেই ভারতের পশ্চিম প্রান্তের একটি ভাবতরঙ্গ বঙ্গদেশেও আসিয়া পড়িয়াছিল?”

৫. হক, এনামুল, বঙ্গে সুফী প্রভাব, র‍্যামন পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ (চতুর্থ মুদ্রণ), পৃ. ২১

“সুহরবদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শয়খ জলাল-দু-দীন তবরীযীর (মৃত্যু-১২২৫ খ্রীঃ) আগমনের পর হইতেই বঙ্গে বন্যপ্রবাহের ন্যায় সুফী-প্রভাব পড়িতে আরম্ভ হয়।” তবে সুফি মতবাদ কালক্রমে তার মৌলিক সত্তাটা বঙ্গদেশে আর বজায় রাখতে পারেনি। এদেশের সংস্কার যোগসাধন পদ্ধতিকেও তা আত্মীকরণ করতে থাকে।

৬. রহমান, শেখ আব্দুর, শিক্ষার ভিত্তি, সম্পা: সেকালের শিক্ষা উজ্জ্বল উদ্ধার, অপূর্ব সাহা, আলাপ প্রকাশন, হাওড়া, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ১৩১

“আমরা যে দ্বী-শিক্ষার বিপক্ষে তাহা নহে। যদি শিক্ষার মতো শিক্ষা হয়, তবে সর্বান্তঃকরণে আমরা তাহার সমর্থন করিব। যে শিক্ষায় জ্ঞান-ভক্তির বিকাশ হয়, ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, এবং যাহার প্রভাবে বিলাস বাসনা তিরোহিত হয়, যদি সেইরূপ শিক্ষার প্রবর্তন হয় তবে কে না সেই শিক্ষার পক্ষপাতি হইবে? প্রকৃতপক্ষে মোহলেম ললনাগণকে

শিক্ষিতা করিতে মোছলেম সমাজের উপযোগী শিক্ষা দান করিতে হইবে। পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সুফল প্রসব করিবে না। স্যামিজ, কামিজ আঁটিয়া, গাড়ী চড়িয়া বুড়া বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে গমন করা মোছলেম মহিলাগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সে কালে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী এবং স্বামীই মোছলেম ললনাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতেন। গৃহই তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃত বিদ্যালয় ছিল।

পুরমহিলারা বালিকাগণকে পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি এবং পতিভক্তির সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। নামাজ রোজা করাইতেন। কোরান, হাদিছ, ইতিহাস প্রভৃতি পবিত্র গ্রন্থ হইতে শিক্ষাপ্রদ আখ্যায়িকা সমূহ বিবৃত করিয়া তাহাদিগের চরিত্র গঠন করিতেন। রন্ধন, গৃহরক্ষণ, পরিজন পালন এবং অতিথি ও অভ্যাগতের সেবা প্রভৃতি বিষয় উত্তমরূপে শিখাইতেন। আরও শিখাইতেন, নিত্যাবশ্যকীয় শিল্পকলা, সূচীকারজ্য এবং বহুবিধ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে গৃহস্থালীতে যাহা আবশ্যক মোছলেম বালিকাগণ তৎসম্বন্ধে রীতিমতই শিক্ষা পাইতেন। তবে ইদানীং বটতলার অথবা অশ্বখতলার নভেল নাটক পাঠ, সচিত্র প্রেমপত্র লিখন, রঙ্গালয়ে গমন, বিচিত্র বসন ভূষণে অঙ্গরাগ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয় যেমন শিক্ষার অঙ্গ হইয়াছে, যে শিক্ষায় রচি বিকৃত হয় তাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

শেখ আবদুর রহমান “শিক্ষার ভিত্তি” (আল এসলাম/ ৫ম ভাগ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা/ কার্তিক, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম নারীর অধিভাষা নির্মাণে ধর্মের প্রভাব

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৪% মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম অনুসরণকারীর সংখ্যা বিচারে। বহু ভাষা বহু ধর্মের দেশ ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু ধর্ম ইসলাম। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের সঙ্গে ভারতীয় মুসলিমদের চরিত্রগত ও জাতিগত যে প্রভেদ আছে তা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ধর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগতকে পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে। কোনও মানুষের বা গোষ্ঠীর চিন্তাজগতের সীমানা নির্দেশ করা দুরূহ এবং সার্বিকভাবে অসম্ভবও। তবুও স্থূলভাবেই কিছুটা মুসলিম মেয়েদের চিন্তাজগতের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেগুলি হল –

- ঘর – গৃহস্থালি
- মেয়েদের একান্ত নিজস্ব জগৎ
- বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ
- বিভিন্ন মানবিক সম্পর্ক এবং অনুভূতির জগৎ

তবে মুসলিম মেয়েদের এই জগৎ স্থির অনড় নয়। কিন্তু যেকোনো একটি সময়কে কোনো ভাষার আধাররূপে আমরা যদি ধরতে যাই দেখব, সেখানে আসলে থাকে অনেকগুলো সময়ের সমাহার। বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্নভাবে একই সময়ে সঞ্চিত থাকে বিভিন্ন সময়ের ভাষা। তাদের এই পারস্পরিক সহাবস্থানের সম্মিলিত বৈচিত্র্যই কোনো ভাষার প্রাণস্পন্দন। আণুবীক্ষণিক স্তরে গিয়ে ভাষাকে কাঁটাছেড়া করলে দেখা যাবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী আছে কথা বলার। আছে কিছু বিশেষ শব্দের প্রতি পক্ষপাতও। কিন্তু

সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যকে সরিয়ে রাখলেও আমরা বুঝতে পারব যে বয়স ভেদে মুসলিম মেয়েদের ভাষায় তারতম্য হয়ে যাচ্ছে। কোনো ক্ষেত্রে এই তারতম্য সিগনিফায়ারের, আবার কোনো ক্ষেত্রে সিগনিফায়ার এক থাকলেও সিগনিফায়ারের স্তরগত মাত্রাগত পরিবর্তন চলে আসছে। বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যাক।

সময়ের নিয়ম অনুযায়ীই দেখব যে কিছু কিছু শব্দ গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে পুরোনো শব্দের তালিকায় আর কিছু শব্দ নতুন শব্দ হিসেবে যোগ হচ্ছে। এবার খুব স্বাভাবিকভাবেই সেইসব পুরোনো শব্দগুলো সংরক্ষণ করেন বৃদ্ধারা। আর নতুন শব্দগুচ্ছ কম বয়সীরা গ্রহণ করে তাদের কথোপকথনে। বদলায় সংস্কৃতি বদলায় ভাবনা চিন্তা, মূল্যবোধ। তার হাত ধরে বদলায় ভাষাও। পুরাতন আর নবীনের দ্বন্দ্ব যেমন থাকে তেমন তারা তাদের সহাবস্থানও খুঁজে নেয় নিজেদের মতো করে।

ভাষার উপরিতলের স্তর বা E_0 বা Expression of object language এবং মস্তিষ্কে সেই শব্দটির সমার্থক অনুবাদ বা অধিভাষা (meta language) সবার ক্ষেত্রে সমান হয় না। একই object language এর meta language world বা স্থান এবং time বা সময় অনুযায়ী পালটে পালটে যেতে পারে। অর্থাৎ ভাষার বক্তা ও শ্রোতার উভমুখী প্রক্রিয়াকে model of world and time এ বেঁধে ফেলা যায়। এই world বা স্থান অনেকরকম হতে পারে। কাল্পনিক হতে পারে, বাস্তব জগত হতে পারে রূপকথার দুনিয়া হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের চিন্তা যোগ্য যে কোনো স্থানই হতে পারে। আমরা এই নিবন্ধে খেয়াল করার চেষ্টা করব, মুসলিম মেয়েদের কথার মধ্যে তাদের কতরকমের স্থান (world) এবং সময় (time) এর পারস্পরিক সহাবস্থান আছে। সমগ্র গোষ্ঠী বা class এ কতরকমের world এবং time এর সমন্বয় ঘটছে।

তবে এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মনে রাখব, অধিভাষা বা meta language নির্ণয় সবসময়ই বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের সাপেক্ষে হয়ে থাকবে যখনই কেউ কারোর অধিভাষা অনুসন্ধান প্রয়াসী হবেন। শ্রোতার ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও বক্তার সামাজিক রাজনৈতিক আঞ্চলিক কখনো বা ব্যক্তিগত পরিসর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান যত কম থাকবে তত বক্তার অধিভাষার জগৎ ধরা দুরূহ হয়ে পড়বে। তবে একথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে বক্তা ও শ্রোতা কেউই সামগ্রিকভাবে কারোর অধিভাষার জগতের সন্ধান পেতে পারবেন না। প্রত্যেক মানুষের অধিভাষার জগৎ দুর্জয় ও বিমূর্ত। তাই এই নিবন্ধে অনেকের ব্যক্তিগত উপাত্ত সংগ্রহ করে যৌথ কৌম চেতনাকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কীভাবে তাদের সামূহিক যাপনে সংস্কৃতিতে একটি নির্দিষ্ট অধিভাষা জায়গা করে নিচ্ছে তা বোঝার প্রয়াস রয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য ব্যক্তিভেদে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকবে অধিভাষাতে এখানে সেই দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি।

অধিভাষাকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এই বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতান্তর আছে। কেউ কেউ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ভাষা (natural language) কে অধিভাষা (meta language) হিসেবে গুরুত্ব দিতে চাননি। কোনও কৃত্রিম ভাষাকে object language এর meta language হিসেবে অগ্রাধিকার দিতে চেয়েছেন। আবার উলটো উদাহরণও অপ্রতুল নয়।

আমাদের এই সন্দর্ভে object language হিসেবে নেওয়া হয়েছে মুসলিম মেয়েদের ভাষাকে। আর তার অধিভাষা নির্ণয়ে আমরা natural language কেই বেছে নিয়েছি। এবং সেটাও একই ভাষা। অর্থাৎ বাংলাই। অর্থাৎ একটি ভাষা থেকে তার অধিভাষা তার মস্তিষ্কে কীভাবে অনূদিত হয়; একই ভাষা, একই শব্দ একই বাক্য বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে অর্থের পার্থক্য তৈরি করে, বিশেষত মুসলিম মেয়েদের মধ্যে তা কোনো বিশেষ অর্থ সৃষ্টি

করে কি না তাই এই সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়। আমরা এখানে আলোচনার শুরুতেই বুঝতে পারছি, দুটি মূল সূচক দিয়ে আমরা আমাদের উপভাষাগোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি।

এক – লিঙ্গগত সূচক – নারী

দুই – ধর্মগত সূচক – ইসলাম

অর্থাৎ, আমরা ধরে নিচ্ছি প্রাথমিকভাবে যে, লিঙ্গগত পরিচয় যা সামাজিকভাবে নির্মাণ হয় এবং ধর্মীয় পরিচয় ভাষাকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে মুসলিম মেয়েদের একটি আলাদা শব্দার্থতত্ত্বের এবং অধিভাষার জগৎ তৈরি হয়।

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, কীভাবে সমাজ ও ধর্ম মেয়েদের একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গ-ভূমিকায় দেখতে চায়, এবং কাক্ষিত সেই ভূমিকায় অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করে। এখন এই অধ্যায়ে ধর্ম ও সমাজ কীভাবে মুসলিম নারীদের অধিভাষার জগৎ নির্মাণ করতে সাহায্য করে তা আলোচনা করা হবে। ইসলাম ধর্ম অন্য ধর্মের মতোই একটি সুনির্দিষ্ট জীবনধারণের রূপরেখা বা নির্দেশিকা প্রদান করে। সেখানে যেমন দেশ শাসনব্যবস্থা অর্থনীতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি নিদান দেওয়া আছে, নারী পুরুষ সম্পর্কেও তাদের সুনির্দিষ্ট আদেশ আছে। বলা বাহুল্য নারী পুরুষ সম্পর্কে এই নিদান একেবারেই একরকম নয়।

শরিয়তি আইন ও বিধি ব্যবস্থা মুসলিম জন মানস ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি শরিয়ত বাঙালি মুসলিম মেয়েদের চিন্তাজগত ও অধিভাষা নির্মাণে কীভাবে সহায়তা করে এবার সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক জীবন

জন্ম

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান আর ধর্মের খুব বেশি সহাবস্থান দেখা যায় না। আবার আধুনিক সময়ে সব ধর্মই বিজ্ঞানের সূত্রগুলোকে প্রামাণ্য ধরে নিজেদের মতামতকে বিজ্ঞানের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছে। হিন্দু খ্রিস্টান ইসলাম এবং আরও অন্যান্য ধর্মে নারী পুরুষের উদ্ভব সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা আছে। এর মধ্যে ইহুদি খ্রিষ্টান আর ইসলাম ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশেষ করে নারী আগমনের ঘটনাটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

খ্রিষ্টান ধর্মে আমরা দেখব প্রথম মানব হিসেবে আদম আসছে। আর তারই সাহচর্যের প্রয়োজনে পৃথিবীর প্রথম নারী ইভ আসেন। অর্থাৎ নারী আসছেই পুরুষের প্রয়োজনে, পুরুষের মনোরঞ্জে। এবং সেই নারী তৈরি হচ্ছে কী থেকে? আদমেরই হাড় থেকে। ভগবানের নিষেধ করা গাছের ফল খেতেও আমরা দেখব ইভ আদমকে প্রলুব্ধ করছে।

ইসলাম ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মের এই গল্প থেকে খানিক সরে এলেও গল্পের মূল কাঠামো একই আছে। এখানেও প্রথম মানুষ হিসেবে আমরা আদমকে দেখি। তারপরে হাওয়া। যদিও ইসলামে আদম এবং ইভ একই সঙ্গে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গাছের ফল খায়। এক্ষেত্রে ইভ তাকে প্রলুব্ধ করেছে এরকম কিছুই উল্লেখ নেই। কিন্তু আমরা খেয়াল করব, নারীর জন্ম হচ্ছে পুরুষের পরে। খানিক পুরুষেরই প্রয়োজনে। বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক থেকে শুরু করে আমাদের সাহিত্যেও নারীর জন্ম পুরুষের পিছু পিছু।

সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে যে^১ আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করছেন আর তার থেকেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করছেন। অর্থাৎ, আদম থেকেই তার সঙ্গিনী অর্থাৎ নারীকে সৃষ্টি করছেন। এখানে উল্লেখ্য, কোরানে হাওয়ার নাম উল্লেখ নেই। হাদিসে আছে। এবং পুরুষের জন্যই নারীর আবির্ভাব তাও জানাচ্ছে ইসলাম। পুরুষেরই প্রয়োজনে ও পুরুষের আরামের জন্য নারী আসছে। পুরুষদের জন্য পুরুষদের থেকে নারী সৃষ্টি হচ্ছে। নারী পুরুষের মাঝে ভালোবাসা ও করুণা সৃষ্টি করছেন আল্লাহ।^২

এছাড়া সুরাহ যুমারের ৬ নং আয়াতেও দেখব আদমের থেকে তার জোড় বা সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ আছে।^৭ বুখারি শরীফে বলা হয়েছে হাওয়া আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি। জানানো হচ্ছে হজরত মহম্মদ মন্তব্য করছেন যে নারীদেরকে সদুপদেশ দিতে হবে কেননা তাদের আচরণ বক্রতাপূর্ণ।^৮ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, হাদিস নিয়ে মুসলিম সমাজে অনেক বিতর্ক আছে। সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে কোন হাদিসকে তারা অধিক গুরুত্ব দেবে বা গ্রহণ করবে এই বিষয়ে। কিন্তু সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে সবথেকে বেশি পঠিত গৃহীত হাদিস হল বুখারী হাদিস। ফলে কোরানে উল্লেখ না থাকলেও বাঙালি মুসলিম সুন্নি পরিবারে এই গল্পটি বেশ জনপ্রিয় এবং প্রচলিতও।

অর্থাৎ কোরান হাদিস মিলিয়ে ইসলামিক যে ধারণা পৃথিবীর প্রথম মানব মানবীর তাতে মোটেই দু'জন একইরকম গুরুত্ব পাচ্ছে না। পৃথিবীর প্রথম মানবী প্রথম মানবের অধস্তন হিসেবেই চিত্রিত এখানে। বাঙালি মুসলিম পরিবারে খুব কম জনই কোরান অর্থ সহকারে পড়ে কিন্তু বাংলা হাদিস অনেকেই পড়ে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে। অল্প শিক্ষিত মুসলিম গৃহবধূরা অনেক সময়ই তাদের অবসর সময়ে বাংলায় বিভিন্ন নামাজ শিক্ষা বই, ধর্মীয় নির্দেশাবলী যুক্ত পুস্তক এবং হাদিস পড়ে থাকে। নামাজ শিক্ষা ও অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের মূল ভিত্তিও কোরান হাদিসই। ফলে ধর্মের এই সব বিষয় তারা যেমন অনেক সময় ধর্মীয় গুরুদের কাছে শোনে অন্যদিকে নিজেরাও পাঠ করে। তাদেরও বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে নারী পুরুষ সমকক্ষ নয়।

এতো গেল কোরান হাদিসে বর্ণিত আদম হাওয়ার উপাখ্যানে বৈষম্যের কথা। এবার একটু দেখে নেওয়া যাক, কোরানে সাধারণভাবে নারী পুরুষের জন্ম নিয়ে কোন বিশেষ নিদান আছে কিনা। আমরা জানি আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আজও পুত্র সন্তান অধিক কাম্য বেশিরভাগ পরিবারে। তা কোন নির্দিষ্ট ধর্ম জাতি স্থানে আবদ্ধও নয়। সুরা

আন-নাহলের আয়াত ৫৮-৫৯ কোরানে কন্যা সন্তানকে সুসংবাদ বলা হচ্ছে ^৫। এবং যারা কন্যাসন্তান হলে মনস্তাপ করে তাদের নিকৃষ্টও বলা হচ্ছে। এছাড়াও প্রথম সন্তান কন্যা হলে তা সমৃদ্ধির সৌভাগ্য সূচকও ধরা হয়। কিন্তু, জন্মের পর ইসলামে সন্তানদের জন্য আকিকা করার কথা বলা আছে। সন্তান জন্মানোর পর আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের বহিঃপ্রকাশরূপে কোরবানির দিয়ে আকিকা করার বিধান আছে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখব, পুত্র সন্তানের জন্য দুটি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল কোরবানি দেওয়ার বিধান। এই বৈষম্য কী পুত্র সন্তানের অধিক গুরুত্বই প্রকাশ করে না? পুত্র সন্তান হলে আনন্দ ও আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের রূপক কোরবানি দ্বিগুণ হওয়ার কারণ কোরানে বর্ণিত নেই। প্রকারান্তরে, এই নির্দেশ পরিবারে সমাজে পুত্র সন্তানের অধিক গ্রহণযোগ্যতা অধিক শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিষ্ঠা করে।

পোশাক- পরিচ্ছদ সম্পর্কে বিধান

সূরা আন-নুরের ৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে^৬ – বিশ্বাসী সৎ চরিত্রবান মহিলারা তাদের দৃষ্টি এবং পোশাক সম্পর্কে সচেতন ও সংযত থাকে। মাথা গ্রীবা ও বক্ষদেশ আবৃত রাখার নির্দেশও আছে। এছাড়া কাদের সামনে তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে ও কাদের সামনে পারে না সেই সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে বিতর্কিত গবেষক রাশাদ খলীফা যিনি কোরানের অনুবাদ করেছিলেন তিনি আরবি শব্দ ‘খিমার’ এর অনুবাদ মাথার কাপড় বা হিজাব বলে করতে চাননি। তিনি বলতে চেয়েছেন যে কোন বস্ত্রখণ্ডই খিমার হতে পারে এবং এই আয়াত দিয়ে মেয়েদের মাথায় কাপড় দিয়ে রাখতে বলা হয়েছে কোরানে তা প্রমাণ হয় না। এই বিতর্ক বাদ দিয়েও বলা যায় যে সাধারণভাবে মুসলিম সমাজে মেয়েদের মাথায় কাপড় দেওয়া বিষয়টি সর্বসাধারণের মধ্যে বিপুলভাবে গৃহীত। এর ঠিক আগের আয়াতে পুরুষদের দৃষ্টি সংযত ও

যৌনাঙ্গকে হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে।^১ কিন্তু নারী সম্পর্কে বিশেষভাবে কোনো কোনো সম্পর্ক বা মানুষ ব্যতিরেকে সৌন্দর্য প্রকাশ না করার বিষয়ে কড়াকড়ি দেখতে পাচ্ছি আমরা। অর্থাৎ নারীর সৌন্দর্য বা দেহ সৌষ্ঠবকে (যেহেতু সৌন্দর্য সম্পর্কে কোন সংজ্ঞা এখানে দেওয়া নেই এবং সবার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাই সাধারণভাবে নারী শরীর দেহ সৌষ্ঠবকেই সৌন্দর্য বলে গ্রহণ করলাম) আবৃত রাখার এক সুস্পষ্ট নির্দেশ আমরা দেখছি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজের দেহ নিয়ে যে লজ্জা যে ভয় গড়ে ওঠে তাকে রক্ষা করার যে দায় তাদের উপর চাপানো হয় তারই খানিক ইঙ্গিত আমরা যেন এখানে দেখতে পাচ্ছি।

সূরা আল-আহযাবে বলা হচ্ছে মুমিন নারীদের শরীর ও চেহারায় উপর তাঁদের বস্ত্র বা চাদর ঢেকে রাখতেন। সূরা আল-আহযাব মুমিন নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে। বস্ত্রখণ্ডের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে যাতে তারা সহজেই পবিত্র নারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। যদিও বস্ত্রের দৈর্ঘ্যের কোনও মাপের কথা বলা নেই কিন্তু নারীদের জামা কাপড়ের দৈর্ঘ্য তার চারিত্রিক গুণাবলীর মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক একইভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ধর্ষণ স্ত্রীলতাহানি ইত্যাদি ঘটনায় মেয়েদের জামাকাপড়ের অশিষ্টতা নিয়ে যেভাবে কথা বলে থাকে যেন।

প্রথমেই বলে নেওয়া যাক, ইসলামে মেয়েদের পর্দা মানেই হিজাব নয়। এর রকমফের আছে। যেমন-

১। হিজাব – স্কার্ফ। যা মাথা এবং ঘাড়ের উপরের অংশ ঢেকে রাখে। কিন্তু মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে।

২। নিকাব – এটা সাধারণত মুখমণ্ডল, মাথা ঢেকে রাখে। শুধু চোখ দুটো দেখা যায়।

৩। বোরখা – এটা আফগানিস্তানের মুসলিম মেয়েরা বেশি পরে। কালো বা গাঢ় রঙের পোশাক যা মাথা থেকে পা অবধি গোটা শরীরই ঢেকে রাখে। মাথা থেকে মুখ অবধি আর এক বস্ত্রখণ্ড নামিয়ে রাখা যায় ও প্রয়োজনে তা মাথার উপরে তুলে মুখ অনাবৃত করা যায়।

হিজাব শব্দটি প্রাক ইসলামিক যুগ থেকেই প্রচলিত। প্রথম লিখিতভাবে মেয়েদের পর্দা করার কথা পাওয়া যায় আসিরিয়ান মহিলাদের মধ্যে। তবে ক্রিস্টদাস ও বেশ্যারা এই পর্দা করতে পারত না। অবিবাহিতা মেয়েরা বিবাহের পর পর্দা করত। পর্দার অর্থ সামাজিকভাবে দাঁড়িয়েছিল – ইনি আমার স্ত্রী। ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে শাল বা পর্দা মাথার উপরে পরার চলন প্রচলিত ছিল। গ্রিক, রোম থেকে পারস্যে এই পর্দা পরার প্রভাব যায়। ইজিপ্ট এবং ইহুদিরা তৃতীয় শতাব্দী (খ্রিস্ট পূর্ব) থেকে একইরকম প্রথা শুরু করে। বিবাহিত মহিলাদের মধ্যেই এই প্রথা দেখা দেয়। কেননা তাদেরকে তাদের স্বামীর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মনে করা হয়। তাই তাদের সৌন্দর্য সর্ব সমক্ষে প্রকাশযোগ্য নয়।

যদিও কোরানে সর্বসমক্ষে মেয়েদের পর্দা ব্যবহার করার কথা স্পষ্টভাবে বলা নেই। কিন্তু মহম্মদের স্ত্রীরা পর্দা মেনে চলতেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় ১৫০ বছর পর সারা পৃথিবীতে ইসলামিক দেশগুলোতে সমাজে পর্দার ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। তবে অর্থনৈতিকভাবে যারা এগিয়ে ছিল, উচ্চবিত্ত পরিবারের লোকজনরাই তাদের মেয়েদেরকে জনসমক্ষে থেকে এভাবে পর্দার আড়ালে রাখতে পারলেন। কিন্তু যেসব পরিবারে মেয়েদের শ্রম ছাড়া তাদের সংসার চলা দুরূহ, খুব স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পর্দা প্রথার ব্যবহার বিলাসিতার মতো।

বাঙালি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে সাধারণভাবে পর্দা প্রথা নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি নেই। বিবাহিত অবিবাহিতদের মধ্যে তুলনা টানলে বিবাহিতদের মধ্যে মাথায় শাড়ি বা কাপড়

দেওয়ার প্রবণতা বেশি। কিছু পরিবারে অবিবাহিত মেয়েরা মাথায় ওড়না বা স্কার্ফ ব্যবহার করে থাকে। তবে আজান দেওয়ার সময় বেশিরভাগ মুসলিম মেয়েদেরকেই মাথায় ওড়না দিতে দেখা যায়; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আজান দেওয়ার সময় কথাও থামিয়ে দেয় মেয়েরা। আজান মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। যদিও আরবি ভাষায় দেওয়া আজানের অর্থ তারা উপলব্ধি করতে পারে না কিন্তু এর পবিত্রতা এবং শুদ্ধতা বিষয়ে এদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। এবং আজানের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের শালীনতা বিষয়ে তারা সজাগ হয়। মাথা আবৃত করে আজানের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

এখানে আমরা দেখব, আজান কীভাবে মুসলিম মেয়েদের জন্য তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠছে। তাদের অন্তর্জগৎ আজানের যে অর্থ ধারণ করে আছে তা অবশ্যই অন্য ধর্মের মেয়েদের থেকে যেমন আলাদা তেমন মুসলিম ছেলেদের থেকেও কিঞ্চিৎ আলাদা। বেশিরভাগ জায়গাতেই মেয়েদের জন্য আলাদা মসজিদ নেই বা মসজিদে মেয়েদের জন্য নামাজ পড়ার পৃথক ব্যবস্থা নেই। নামাজের ডাক শুনে ছেলেরা যখন নামাজ পড়তে মসজিদে যায় তখন মেয়েরা ঘরে নামাজ পড়ে। আর যেসব ছেলে মেয়ে নামাজ পড়ে না তাদের মধ্যেও মেয়েদেরকে আজানের সময় মাথা ঢেকে ফেলতে দেখি। ছেলেরা কিন্তু এমন করে না।

একই শব্দ, ধর্মের একই অনুশাসন পৃথকভাবে মুসলিম মেয়েদের চেতনার অংশকে নির্মাণ করেছে। হিজাব সম্পর্কে আরও ঠিকভাবে বললে পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ইসলামে নারী পুরুষ উভয় লিঙ্গ সম্পর্কেই নির্দেশাবলী আছে। উভয়কেই শালীন ভদ্র এবং দৃষ্টি আকর্ষণ না করে এমন পোশাক পরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও পর্দা প্রথা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই নির্ধারিত হয়েছে। প্রকাশ্যে জনসমক্ষে অন্য পুরুষদের থেকে তাদেরকে আড়ালে থাকার কথা আছে। এই দুই লিঙ্গের মধ্যে এক ব্যবধান তৈরি করার জন্য মেয়েদের জন্য নির্ধারিত হচ্ছে অন্দরমহল আর পুরুষদের জন্য বাইরের মহল। যেখানে নারীই হয়ে উঠছে

দেখার বিষয়, তার সৌন্দর্য হয়ে উঠছে উপভোগের বিষয়, তার উপস্থিতি তার স্পর্শ পুরুষের গোপন কুঠুরির কামনার বিষয় হয়ে উঠছে। তাই পুরুষ নারীকে দেখে তার নজর নিচে করে নেবে। আর নারী পর পুরুষের নজর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। ইসলাম সহ সব ধর্মে এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই কাঠামো বলবত। এই কাঠামো মেনেই তৈরি তার নিয়ম কানুন। আর এই নিয়মের আওতাভুক্ত হয়ে নারীও নিজেকে বিশেষ করে তার শরীরকে উপভোগের ভোগের কামনার বস্তু হিসেবে বুঝতে শিখেছে। তার মূল্যও সে মেপে নিতে চেয়েছে তার শারীরিক সৌন্দর্যের মাপকাঠিতেই।

ঋতুস্রাব ও বয়ঃসন্ধি

ঋতুস্রাব নিয়ে আমাদের সমাজের সর্বত্র ট্যাবু আছে। বিভিন্ন ধর্ম হল এই সম্পর্কিত বিষয়ের ট্যাবুর আঁতুড়খানা। ঋতুস্রাব চলাকালীন পূজা-পাঠ, নামাজ রোজা কোরান পাঠ বা মন্দির মসজিদ সহ বিভিন্ন ধর্মস্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ। ইসলামেও সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঋতুস্রাব চলাকালীন নিষিদ্ধ। নামাজ রোজা কোরান পাঠ কোনোকিছুই ঋতুস্রাব চলাকালীন ইসলামে করা যায়না।

এছাড়া ঋতুস্রাব এই স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াটি শিশু বা বালিকা থেকে নারীতে উত্তীর্ণ করে দেয়। সমাজ সেইভাবেই দেখে। একটি নারীর গর্ভধারণ করার ক্ষমতা তাকে বড়োদের কোঠায় ফেলে দেয়। এবং মেয়েদের জন্য যে আলাদা আলাদা বিধি নিষেধ নির্ধারিত থাকে সমাজের কাছে ধর্মের বিভিন্ন ফতোয়ায় তা শুরু হয় মেয়েদের ঋতুচক্র শুরু হলেই। ফলে ঋতুচক্র একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মেয়েদের জীবনে। ঋতুচক্রকে সমাজ ধর্ম কীভাবে দেখতে শেখাচ্ছে তা তাদের অধিভাষা নির্মাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে। ঋতুস্রাব চলাকালীন ও তার পরে তাদের নিজেদের শরীরকে বিশুদ্ধ করে তোলার জন্যও বিশেষ রীতি আছে। গোসল ওজু এবং পাক হওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে শরিয়তে।

ঋতুস্রাব চলাকালীন বিবাহিত মেয়েদের জন্য সহবাসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রয়েছে স্বামী স্ত্রী দুজনের জন্যই। ঋতুচক্র নিয়ে অপবিত্রতার এই ধারণা অন্যান্য অনেক ধর্মের মতো ইসলাম সম্মতও।^৮

ধর্ম নির্বিশেষে ঋতুচক্র নিয়ে নারী পুরুষ কেউই কথা বলতে খুব একটা স্বচ্ছন্দ নয়। বরাবরই পিরিয়ড একটি দূষিত বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিককালের শবরীমালা মন্দিরের কেসটির কথা মনে পড়বে। যেখানে ১০-৫০ বছরের মেয়েদের অর্থাৎ যারা ঋতুমতী থাকেন জীবনের যেসব পর্যায় বা অধ্যায় জুড়ে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। ইসলামে ঋতুমতী অবস্থায় নারী সঙ্গ বা যৌনসহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সন্তান প্রসবের পর যে রক্ত নির্গত হয় মেয়েদের যৌনাঙ্গ থেকে তাকে ‘নিফাস’ বলা হয়। নিফাস চলাকালীনও মেয়েদের অপবিত্র বলে মনে করা হয় এবং সেইসময়ও মেয়েরা ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পালন থেকে বিরত থাকে। ইসলামিক এই বিধিনিষেধ তাদের ভাষায় বিশেষ করে শব্দার্থতত্ত্বে গভীর প্রভাব ফেলে।

বিয়ে সংক্রান্ত আচার এবং ইসলামিক বিধি

দেশ-কাল ভেদে বিয়ে এবং তার সঙ্গে জড়িত আচার অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য দেখা যায় সমগ্র পৃথিবীতে। বিভিন্ন জাতি উপজাতি ভেদে আমাদের ভারতবর্ষেও বিভিন্নরকম বিবাহপ্রথা দেখা যায়। মনুর বিধান ছিল ঋতুমতী হওয়ার পূর্বে কন্যার বিবাহ দিতে হবে এবং বিবাহিতা নারীকে সতীত্বের সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হবে।

ভারতের সর্বত্র একই বিবাহের রীতি প্রচলিত নয় একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর ভারতে পিতৃকুলের উর্ধ্বতন সাতপুরুষ এবং মাতৃকুলের উর্ধ্বতন পাঁচ পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারতে মামাতো বোন ও পিসতুতো বোন বাঞ্ছনীয়

পাত্রী। দক্ষিণ ভারতে তামিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে আমার সঙ্গে ভাগ্নির বিবাহও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে যা কল্পনাতে। এছাড়া ভারতের কোন কোন জায়গায় এখনো বহুপতি গ্রহণের প্রথা আছে বলে অতুল সুর জানাচ্ছেন। আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা শাশুড়িকে বিবাহ করে এবং লাখের বাগানই ও ডাফলা জাতির লোকেরা বিধবা বিমাতাকে বিবাহ করে।

এছাড়া বর্তমানে ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ গুজরাট মহারাষ্ট্র ওড়িশার বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত। তবে সহোদরা ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হিন্দু সমাজে কখনই প্রচলিত ছিল না। বঙ্গদেশে কিছুদিন আগে অবধিও কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুপত্নী গ্রহণের ইতিহাসতো আমাদের সবারই জানা। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের বিয়ের ইতিহাস একমাত্রিক তো নয়ই এমনকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কখনো সামাজিক আচার প্রসূত হয়ে কখনো আইনত তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসছে।

মুসলিমদের নিজস্ব শরিয়তি আইন আছে বিধিবদ্ধ বিবাহ বিষয়ে। যে কোন মুসলিম মেয়ে যে কোন মুসলিম ছেলেকে বিবাহ করতে পারে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা বর্ণভেদের কোন জায়গা শরিয়তে নেই। তবে মুসলিম ছেলেরা মুসলিম মেয়ে ছাড়াও খ্রিস্টান বা ইহুদী মেয়েদেরকেও বিবাহ করতে পারে। মেয়েদের জন্য এই নিয়ম নেই। মুসলিম সমাজে বিয়েটা একটি সামাজিক চুক্তির মতো প্রায়। এই সম্পর্কের সঙ্গে সাত-জন্মের সম্পর্কের ধারণা যুক্ত নয় হিন্দু ধর্মের মতো। ইসলাম ধর্মে জন্মান্তরবাদের কোন ধারণাও নেই। ফলে বিবাহ সম্পর্ককে ওইভাবে দেখার সুযোগও নেই। বিবাহ মুসলিম ধর্মে ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কাজগুলির মধ্যে না পড়লেও সুন্নত। এবং ছেলে মেয়েদের বিবাহকে ইসলামে প্রবলভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়।

সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে -^৯ আল্লাহর প্রতি যে নারীর ইমান নেই তা বিবাহের যোগ্য নয়। অন্য ধর্মাবলম্বী বা যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে সেই সমস্ত মুশরিক নারীদের ও পুরুষদেরকে বিবাহ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিয়ের পাত্র-পাত্রী হিসেবে ঈমান বা আল্লাহের প্রতি আস্থা বিশ্বাসই যোগ্যতা বলে বিবেচিত ইসলামে। বিবাহ সম্পর্ক নিষিদ্ধ কোন কোন ক্ষেত্রে তাও স্পষ্ট নির্দেশ করা হচ্ছে সূরা নিসার ২২ নং আয়াতে^{১০}। পুরুষদের উদ্দেশে বলা হয়েছে এখানে যে, যেসব নারীদেরকে পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করেছে তাদেরকে বিবাহ করা যাবে না।

এরপর ২৩ নং আয়াতে বলা নির্দিষ্টভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে ” যে তার মা বোন ফুফু খালা ভাইয়ের মেয়ে বোনের মেয়ে এছাড়া দুধমাতাদের শাশুড়িদের, কন্যা বা কন্যাসম মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া যাবে না। সূরা আন নূরে আমরা দেখব (আয়াত-৩২) অবিবাহিতদের বিয়ে, দাস দাসীদের বিয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সূরা মায়িদাহতে (আয়াত -৫) বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় দেনমোহর দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। এবং বিবাহ বহির্ভূত গোপন প্রণয়কে পাপ বলা হচ্ছে। সূরা নিসাতেও দেখব, স্ত্রীর প্রাপ্য দেনমোহর তাকে দিয়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

মুসলিম বিবাহ রীতি বিশেষ করে পুরুষদের চার বিবাহের স্বীকৃতি খুবই সমালোচিত ও নিন্দিত আধুনিক সময়ে। যে সময়ে কোরানের এই রীতি তৈরি হচ্ছিল সেই সময় আরবে পুরুষেরা বহু সংখ্যক নারী বিবাহ করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী সন্তানদের প্রতি কোনোরকম দায় দায়িত্ব পালন করত না। ফলে সমাজ জুড়ে এক অরাজকতা চলছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এই নিয়ম হয়তো সুরাহামূলক প্রকল্পের মতো ছিল। আমরা যদি খেয়াল করি, হিন্দু সমাজের মধ্যেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল যা আইন করে রদ হয়েছে ১৯৩৯ সালে। কিন্তু কোরানের এই নিয়মের কোনো রদবদল হয়নি। যেসব আধুনিক ইসলামিক সমালোচক

এই বহুবিবাহ সমর্থন করেন না তারা কোরানের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, চার বিবাহের জন্য যে শর্ত ইসলামে আছে তা এমনিই রক্ষা করা মুশকিল। যদিও এই দুর্বল যুক্তি খুব বেশি ধোপে টেকেনা। এর প্রতিযুক্তি হিসেবে রাখা যেতে পারে মেয়েদের সামর্থ্য থাকলে বা সবাইকে সমানভাবে দেখতে পারলে তাদের কি চারটে বিবাহ করার অনুমোদন ইসলাম দেবে? উত্তর আমাদের সকলের জানা।

সূরা নিসার আয়াত ৩-৪ এ বলা আছে^{১২} – পুরুষরা নিজেদের পছন্দমতো এক দুই তিন বা চার জনকে বিয়ে করতে পারবে। তবে যদি তাদের প্রতি ন্যায় বিচার না করতে পারে তাহলে বিয়ে থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। এই সুরারই ১২৯ আয়াতে বলা হচ্ছে^{১৩} – স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করলে তারা বিফল হতে পারে কিন্তু কোনো একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়াকে অনুৎসাহিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের বিবাহ পদ্ধতি ও বিধি কম বেশি শরিয়তের এইসব নিয়ম কানুন দিয়েই চালিত হয়। তবে পুরুষের বহুবিবাহ সামাজিক ব্যবহারিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণে এমনিই সংকুচিত হয়ে গেছে। তবুও কোরানের এই শিথিলতার সুযোগ নিয়ে একেবারেই যে মুসলিম পুরুষের বহুবিবাহ হয় না এমন নয়।

‘নিকাহ’ শব্দটি বিবাহের প্রতিশব্দ হিসেবে মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত। এই ‘নিকাহ’ এর আরবিতে আক্ষরিক অর্থ ছিল যৌন মিলন। তবে কোরানে এই শব্দটি বিয়ের চুক্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনমোহরের পরিবর্তে একটি চুক্তিপত্রে নারী পুরুষ উভয়ের সম্মতিতেই এই চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয় উপযুক্ত সাক্ষীর উপস্থিতিতে। এবং দুজনেরই সম্মতি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো জায়গায় আবার ‘নিকাহ’ বলতে দ্বিতীয় বিবাহকে বোঝানো হয়ে থাকে।

আমরা যদি এবার একটু বিধির বাইরে এসে আনুষ্ঠানিকতার দিকে তাকাই তাহলে দেখব, হিন্দু বাঙালির থেকে মুসলমান বাঙালির বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আবার দীর্ঘ দিন দুটি সম্প্রদায় পাশাপাশি থাকতে থাকতে এবং বাঙালি মুসলমান যেহেতু অনেকাংশেই নিম্নবর্ণ হিন্দুদের উত্তরাধিকার বহন করে থাকে, তাই হিন্দুদের অনেক লোকাচারও এদের বিয়ের অনুষ্ঠানে জায়গা করে নিয়েছে। তবে স্থান ভেদে এর বৈচিত্র রয়েছে। এইরকম বেশ কিছু লোকাচার অবাঙালি মুসলিম বিয়েতে আমরা অনুপস্থিত দেখব। অর্থাৎ বাঙালি মুসলিমদের বিয়ের সামগ্রিক বিষয়টি একইসঙ্গে বেশ অভিনব ও মিশ্র সংস্কৃতির ফল।

বাঙালি মুসলিম বিয়েতে মুর্শিদাবাদ মালদা অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় হলুদ মাখানোর পর্বটি চলে বেশ কিছুদিন ধরে। প্রায় ১০-১৫ দিনও কোথাও কোথাও চলে। তবে এখন ব্যস্ততার জন্য এই মেয়াদ অনেক জায়গাতেই কমে আসছে। মুর্শিদাবাদের সালার কান্দি ভরতপুর প্রভৃতি ব্লকে দেখা যায় যে, হলুদ মাখানোর এই দিনগুলিতে তাদের স্নানও করানো হয় না। গাত্রবর্ণ ফর্সা করার জন্য। যদিও হলুদ জীবাণুনাশকও। বিয়ের অনুষ্ঠানে হলুদের ব্যবহার বহু প্রাচীন এবং বহুল সমস্ত জাতি এবং ধর্মের মধ্যেই। বাঙালি মুসলিম বিয়ের অনুষ্ঠানকে মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে –

১। গায়ে হলুদ

২। ক্ষীর বা খুবড়া / পান-চিনি

৩। বিয়ে

৪। বৌভাত

এইবার অঞ্চল ভেদে এই অনুষ্ঠানগুলোর নাম ও ক্রিয়াকর্মের কিঞ্চিৎ রকমফের আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেও এগুলো বেশ খানিক বদলে বদলে গেছে কালের প্রয়োজনে ও নিয়মেই। ক্ষীরের অনুষ্ঠান পাত্র পাত্রীর নিজ গৃহে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এবং প্রচুর খাবারের আয়োজন থাকে। আত্মীয়পরিজন পরিবারের লোকজন গুরুজনরা বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার খাইয়ে আশীর্বাদ করে। সঙ্গে থাকে উপহার উপঢৌকন।

মুসলিম বিয়েতে মেহেন্দি প্রায় সব জায়গার মেয়েরাই পরে থাকে। এরপর দিন মূল বিয়ের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। মূল অনুষ্ঠান খুবই সংক্ষিপ্ত। মূলত কলেমা পড়ানো হয় পাত্র পাত্রীকে আলাদা স্থানে। এবং পৃথকভাবে বিয়ের চুক্তিপত্র গুনিয়ে তাদের সম্মতি গ্রহণ করা হয়। মৌখিক বা লিখিত যেকোনভাবে সম্মতি দিলেই তা আইনসিদ্ধ বলে গৃহীত হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখন লিখিতভাবে মুসলিম বিবাহ আইন চুক্তিবদ্ধ হয়। তবে এর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় মালা বদল, পাত্রের হাতে পাত্রীকে সাঁপে দেওয়ার মতো অনুষ্ঠান রাখা হয়। তবে তা মূল শরিয়তের নির্দেশ নয়। মনে হয়, এইগুলি বাঙালি হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে অনেকাংশে প্রভাবিত।

বিয়ের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট কোনো তিথি নেই কোনো নির্দিষ্ট মাসেরও বিষয় নেই। যে কোনো সময় যে কোনো মাসেই তা সম্পন্ন হতে পারে। পাত্র পাত্রীর ঠিকুজি কুষ্ঠি বিচারেরও প্রশ্ন নেই। এছাড়া বাঙালি হিন্দু ধর্মের যেসব আচার আছে যেমন সিঁদুর দান, সম্প্রদান, অগ্নি সাক্ষী রেখে সাত বার প্রদক্ষিণ এইসব কোনকিছুই মুসলিম বিয়েতে নেই। তবে মুর্শিদাবাদে বিশেষ করে আমরা দেখব, নিজস্ব ঐতিহ্যের বিয়ের গান প্রচলিত আছে। মালদা উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে আমরা গান ছড়া বিয়ের উৎসবকে কেন্দ্র করে গাইতে দেখব। তবে মুর্শিদাবাদে মুসলিম বিয়ের গানের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। আবার আমপাতায় সিঁদুর দিয়ে ঘটে স্থাপন করা, কুলোতে ধান দূর্বা রাখা এসবের মধ্যে

আমরা হিন্দু আচারের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করব। যে সমস্ত আচার মুসলিম বিয়েতে মেয়েরা করে থাকে সেখানে এই সমস্ত আচারের সংমিশ্রণ আমরা খেয়াল করতে পারব। তার কারণ অনুমান করাও শক্ত নয়। কারণ এই সমস্ত স্ত্রী আচার ধর্মান্তরণের পরেও মহিলারাই ধরে রেখেছে তাদের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৫-২০ বছর আগেও মুসলিম বিয়েতে মেয়েরা সিঁদুর পরতো। লগন হিসেবে প্রসাধন সামগ্রীর সঙ্গে ছেলের বাড়ি থেকে এই সমস্ত সামগ্রী আসত। এবং বিয়ের দিন নব বধূ সাজগোজের অন্যান্য অলংকারের সঙ্গে সিঁদুরও পরতো। এমনকি নববধূ অবস্থাতেও কিছুদিন তা পরে থাকতো। মৃত্যুর পর সধবাদের কবরস্থ করার আগে সিঁদুর পরিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার এই রীতিও প্রচলিত বেশ কিছু গ্রামে। বলা বাহুল্য এই আচারগুলিও একদমই মুসলিম সমাজের আচার নয়। তবে এই সমস্ত আচার যা অন্য ধর্ম বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত তা লুপ্ত হচ্ছে। তবে এই আচার এই অভ্যাস পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষায় পাইনি। এবং যে সমস্ত পরিবারে এই ধরনের আচার আছে বা ছিল তারা কোরান হাদিস সম্পর্কেও অনেক পরে ওয়াকিবহল হতে শুরু করেছে। বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত দরিদ্র মানুষজন এঁরা।

মুর্শিদাবাদের অপেক্ষাকৃত অভিজাত মুসলিম বাড়িতে এই সমস্ত আচারের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়নি। ‘মুসলিম’ এই আত্মপরিচয় সম্পর্কেও এঁরা অনেক বেশি সজাগ যা দরিদ্র নিম্নবিত্ত মুসলিম পরিবারে নেই। মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু জায়গা যেমন বেলডাঙ্গা লালগোলা ইত্যাদি জায়গায় জামাত করা লোকজন এইসব অঞ্চলের তুলনায় বেশি। ফলে সেখানকার মানুষজনের মধ্যে ধর্মীয় আচার ব্যবহারের অভ্যাস অনেক বেশি। তাদের বিয়েতেও এরকম অসচেতন হিন্দু ধর্মের লোকাচারের প্রভাব অনেক কম।

উত্তর চব্বিশ পরগণার হাওড়া বসিরহাট অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণাতেও পীর ফকির মাজারের সংখ্যা বেশ বেশি। ফলে সেখানেও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত আচার বা ‘শিরক’

আচরণ (অর্থাৎ যা করলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যা ইসলামে অমার্জনীয় অপরাধ।) জীবন যাপনের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে বাঙালি মুসলিম বিয়ের আচার পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র সমান নয়। তবে বিয়ের যে মূল ভিত্তি আইন তা সব জায়গায়ই ইসলাম অনুসৃত হওয়ায় সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। আমাদের সমাজে বিয়ে বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিয়ে নামক এই প্রতিষ্ঠানটির থাকা না থাকা সমাজে মেয়েদের প্রতি বিভিন্ন আচরণ প্রতিক্রিয়া ও অবস্থানকে সূচিত করে। মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রেও করে বলাই বাহুল্য। ইসলামে আগেই বলেছি অবিবাহিত থাকা খুব বেশি কাক্ষিত নয়। আর কোনও কারণে স্বামী মারা গেলে বা ডিভোর্স হয়ে গেলেও পুনর্বিবাহ খুবই স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত বিষয়। এখানেও আমরা দেখব, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মুসলিম বাঙালিদের বিধবাদের বা ডিভোর্সিদের বিবাহ সংক্রান্ত ধারণা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ইসলামে প্রথম থেকেই বিধবা বা ডিভোর্সিদের পুনর্বিবাহের বিষয়টি সহজ স্বাভাবিকভাবেই গৃহীত ছিল। এবং হিন্দু রমণীদের বিধবাদের সঙ্গে সাদা শাড়ী, অলংকার সাজগোজ রহিত নিরামিষ ব্রত স্বপ্নাহার বিষয়ের একটি যোগসূত্র পাওয়া যায় তাও ইসলামে অনুপস্থিত।

সধবার চিহ্ন স্বরূপ হিন্দু মহিলাদের যেমন শাঁখা সিঁদুর নোয়া ইত্যাদি ধারণ করার প্রথা আছে, মুসলিম নারীদের জন্য শরিয়তের তেমন বিধিবদ্ধ কঠিন কোনো নিয়মের উল্লেখ নেই। তবে সাধারণভাবে নাকফুল পরাকে বিবাহিত মহিলাদের পরিচয় রূপে ধরা হয়। কিন্তু কুমারী মেয়েরাও অনেকসময় নাকের দুল পরে থাকে তাতে কোনও বিধি নিষেধ নেই। উল্লেখ্য, মধ্য প্রাচ্যের ইসলামিক দেশে বিবাহিত মুসলিম মেয়েদের সঙ্গে নাক ফোটানো বা নাকে দুল পরার কোন সংযোগ আমরা দেখি না। পাকিস্তান ভারত এবং বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নাক ফোটানোকে অনেকসময় বিবাহিত নারীর অত্যাবশ্যিকীয় অলংকার রূপে

সামাজিকভাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে এটি এইসব অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত, ইসলামের সঙ্গে বা শরিয়তি আইনের সঙ্গে এর কোন সংযোগ নেই।

দাম্পত্যের সম্পর্ক নিয়েও আমরা দেখব কোরানে বেশ কতগুলি কথা বলা আছে। সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে আছে^{১৪} স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। কারণ অর্থনৈতিক দায়ভার ন্যস্ত থাকে পুরুষদের উপর তাই তাদের এই ক্ষমতা আছে। অবাধ্য স্ত্রীকে কথা না শুনলে তার সঙ্গে অসহযোগিতা করা এবং তারপরেও না শুনলে শাসন করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে এখানে। এখানে স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্বের কথা সরাসরি স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে।

এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, মেয়েরা পুরুষের অর্থেই প্রতিপালিত হবে এবং ভালো স্ত্রীর সংজ্ঞাও নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে বাধ্যতার প্রেক্ষিতে। ইসলাম মেয়েদের উপর কোন অর্থনৈতিক দায়িত্বও তাই ন্যস্ত করেনি। পুরুষদের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্যের মধ্যে রাখা হয়েছে সংসারের ভরণ পোষণকে। যদিও এখনও মুসলিম সমাজে বেশিরভাগ মেয়েরাই স্বনির্ভর নয় অর্থনৈতিকভাবে তবুও সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও কর্মরতা মেয়েরা আছে। আর কায়িক পরিশ্রমমূলক বা হাতের কাজের বিভিন্ন কূটির শিল্পে মেয়েরা বেশ কিছু আগে থেকেই হাত পাকিয়েছে। গৃহে যে পরিমাণ শ্রম তারা দেয় তা সম্পূর্ণ বিনা বেতনে বলে সেগুলো জীবিকার আওয়াতেই পড়ে না। এটি যদিও কোনো বিশেষ ধর্মের সমস্যা নয়। সমস্যা আমাদের সমগ্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সমস্যা যেখানে মেয়েদের এই শ্রম কোনো মূল্য পায় না। এবং খুবই ভয়ানক হয় যখন তা ধর্ম দ্বারাও সমর্থিত হয়। ঘরের সাংসারিক সমস্ত কাজ এবং সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় নারীদের উপর। ঘর এবং বাইরের বাইনারিতে নারী পুরুষের শ্রম বিভক্ত হচ্ছে। কিন্তু ঘরের কাজের বিশেষ মূল্য কখনোই পরিবার বা সমাজের চোখে নেই। তা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধি কম দক্ষতা কম পরিশ্রমের বলে মনে করে

নারী পুরুষ উভয়েই। কিন্তু এই সমস্ত ধর্মীয় নিয়মকানুনের বাইরে যেটা আরো বেশি সত্যি তা হল ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘরের তথাকথিত আরামটুকুও শুধু নিতে পারেন না মুসলিম মেয়েরা। রোজগারের তাগিদে নিম্নবৃত্ত পরিবারের মেয়েদের কাজে বেরোতে হয়। তবে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বাইরে কাজ করা নিয়ে এক ধরনের অনীহা দেখা যায় পরিবার ও তার নিজের মধ্যেও। এই অনীহা প্রতিবেশী হিন্দু পরিবারে তুলনামূলক কম। দীর্ঘদিন প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুসলিম নারী অন্তপুরের ঘেরাটোপে থাকতে অভ্যস্ত। সেই আগল খুলে বেরোতে তাদের অনেক সময় লাগছে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু এই বেরোনোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমরা সরকারি বেসরকারি কাজের জন্য যেসব ফর্ম পূরণ করি তাতেও দেখব মেয়েদের জন্য অভিভাবকের স্থানে পিতা/ স্বামী করা থাকে। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে পিতাই থাকে বা মাতা। স্ত্রী থাকে না। অর্থাৎ শুধু ইসলামে নয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃস্থলে পুরুষের এই অভিভাবকত্বের ধারণা রয়ে গেছে। এই সুরার পরের অংশটি খুবই আপত্তিকর এবং সেই জন্য সমালোচিতও। যেখানে নারী শুধু তার স্বামীর নিয়ন্ত্রণাধীনই নয় অবাধ্য হলে নারীকে প্রহার করার অনুমতিও দিয়ে দিচ্ছে কোরান।

ফলে কোরানে নারীর অধিকার বিষয়ে যারা খুবই উচ্চকিত ও সদর্থকভাবে নিজের বক্তব্য পেশ করে থাকেন আমরা জানিনা তারা ঠিক কীভাবে এই বিষয়টিকে দেখে থাকেন। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে যেমন কোরানে পারস্পরিক সহযোগিতা ভালোবাসা বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে খুব বেশি সাম্যের কথা আমরা পাই না। এবং ভালোবাসা আর কর্তৃত্বের সহাবস্থান একটু অকল্পনীয় বিষয়ই বটে।

বাঙালি মুসলিম সমাজে একটি কথা খুবই প্রচলিত যে স্বামীর পায়ের তলায় বেহেশত। যদিও এই কথা কোরানের কোথাও বলা নেই। যে হাদিসগুলোকে সঠিক ও খাঁটি মনে করা

হয় সেরকম কোন হাদিসে এর উল্লেখও নেই। অথচ এই বক্তব্যটি মুসলিম সমাজে শরিয়ত সমর্থিত বলেই প্রচারিত। তবে একবার এক নারী সাহাবী রাসূলের কাছে এলেন নিজের কোনো প্রয়োজনে।^{১৫} তিনি নারীদেরকে স্বামীর আনুগত্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর ফযীলতও বর্ণনা করেছেন। “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, আপন লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন সে জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।” (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪১৬৩) অর্থাৎ স্বামীর প্রতি আনুগত্যের কথা হাদিস কোরানে পাওয়া যাচ্ছে।

সব রকম সম্পর্কেই এক ধরনের ক্ষমতার রাজনীতি অন্তঃসলিলার মতো তার অন্তঃস্থলে অবস্থান করে যা সেই সম্পর্কের অভিমুখ বা রসায়ন নির্মাণ করে।

তালাক

ইসলামে তালাক বা ডিভোর্সের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। বিবাহকে ভালোবাসা ও করুণা বা সহমর্মিতার সম্পর্ক বলা হয়েছে (সূরা রুম ; ২১)^{১৬}। ইসলামে বিয়ে কোন স্থির জগদদল পাথরের মতো অনড় বিষয় নয়। বরং প্রয়োজনে অন্যায় বা দুরূহ সমস্যা যা সমাধানযোগ্য নয় সে ক্ষেত্রে তালাককেই শ্রেয় বলে মনে করা হয়েছে। সূরা বাকারার ২৩১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে –^{১৭} পরিস্থিতি বিশেষে শালীনতা বজায় রেখে তালাক শ্রেয়।

তালাকের বিভিন্নরকম পদ্ধতি মুসলিম সমাজে প্রচলিত আছে। যেমন-

১। তালাক বলে – তিনবার তালাক উচ্চারণ করে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। তবে প্রত্যেকবার তালাক বলার পরে একটি তুড় বা একটু ঋতুচক্র সময়কাল বা এক মাস অপেক্ষা করে অন্যটি বলা যাবে। এই মধ্যবর্তী সময়কালকে বিবাহ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার

সময় হিসেবে রাখা হয়। তাৎক্ষনিক আবেগ অনুভূতির বশে তালাক দেওয়াকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয় না।

২। ইলা - সংকল্প নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে চারমাস সঙ্গম না করলে তা বিবাহ-বিচ্ছেদ হিসেবে পরিগণিত হবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৬)

৩। জিহার - স্বামী বিবাহের জন্য সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ের নাম করলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে বাধ্য করাতে পারে। তবে যদি একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয় বা ধারাবাহিকভাবে ২ মাস রোজা রাখে বা ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়ায় তবে আবার পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে। (সূরা মুজাদালাহ; ৩)। তবে এই জিহার এই নিয়ম ইসলাম-পূর্বে সমাজে প্রচলিত ছিল মূলত।

৪। খোলা এখানে স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে এক পাক্ষিকভাবে তালাক নিতে পারে কিছু শর্ত সাপেক্ষ অবস্থায়। যেমন-

৫। মুবারাত - স্বামী স্ত্রীর যৌথ সম্মতিতে বিচ্ছেদ

৬। তালাক-ই-তাফযুজ- স্বামী স্ত্রীকে দিয়ে তালাক উচ্চারণ করায়।

এছাড়া ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন অনুসারে আদালতের সাহায্যেও বিবাহ বিচ্ছেদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যেসব কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ গ্রাহ্য হবে সেগুলি হল -

- চার বছর যদি স্বামীর কোন খবর না পাওয়া যায়। কিন্তু আদালতের রায় ছ মাস অবধি মূলতুবী রাখা হয়। ঐ সময়ের মধ্যে স্বামী ফিরে এলে আর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না।
- দু বছর যদি স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণ ঠিকভাবে না করে।
- সাত বা তার বেশি সময়ের জন্য স্বামীর কারাদণ্ড হলে

- তিন বছর স্বামী দাম্পত্যধর্ম পালন না করলে
- স্বামী যদি নপুংসক হয়। প্রজননশক্তি প্রমাণ করার জন্য স্বামীকে ১ বছর সময় দেওয়া হয়
- দু বছর ধরে স্বামী যদি অপ্রকৃতিস্থ বা উন্মাদ থাকে
- স্বামী কুষ্ঠ বা কোন যৌনব্যাদিগ্রস্থ হয়
- ১৫ বছর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার আগে অভিভাবকদের সম্মতিতে বিয়ে হলে ১৮ বছর এর পর স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করতে পারে
- স্বামী স্ত্রীকে দৈহিক বা মানসিক কষ্ট দিলে।

এছাড়া ইনস্ট্যান্ট তিন তালাক প্রচলিত ছিল ভারতে যা সম্প্রতি আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যদিও এতোগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি ইসলামিক তালাকের ক্ষেত্রে থাকলেও বাঙালি মুসলিম সমাজে খুব বেগতিকের না পড়লে মেয়েরা তালাক দিতে চায় না। কারণ তারা বেশিরভাগই উপার্জনশীল নয়। তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থানে তালাক দিতে পারার মতো সুবিধেজনক অবস্থানে তারা থাকেনা। অনেক আপোষ মীমাংসার মধ্যে দিয়ে তারা সংসারের মধ্যে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে।

তুলনায়, একেবারে শহরের নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের যাদেরকে কাজে বেরোতে হয় তারা অনেক সময় নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার আর্থিক সঙ্গতি থাকলে নিজেদের মতো করে পুনর্বিবাহ করে থাকে। তবে এখানেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষেরা ইসলামের বিবাহ বিচ্ছেদ ছাড়া একাধিক বিয়ে করার আইনি সুযোগ নিয়ে একজনকে পরিত্যাগ করে অনায়াসে অন্য কাউকে নিয়ে সংসার করে।

নিকাহ হালালা

তালাকের পর পুনরায় বিয়ে করা বা একসঙ্গে থাকার নিয়ম ইসলামে খুব সহজ নয়। তালাক প্রাপ্ত স্বামী স্ত্রী আবার একসঙ্গে থাকার আগে স্ত্রীকে অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে এবং তারপর তালাকের পর পুনরায় আগের স্বামীকে বিবাহ করার ছাড়পত্র মেলে। আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না এই দ্বিতীয় বিবাহ যার উদ্দেশ্যই আগের বিবাহে ফিরে যাওয়া তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মণের সামিল। নিকাহ হালালা একটি অমানবিক জঘন্য প্রথা যেখানে তালাক হলে শোষিত মেয়েরাই হচ্ছে। অনেক মৌলবাদী এর পক্ষে সওয়াল করেন এই বলে যে, ইসলাম তালাক বা ডিভোর্সকে উৎসাহিত করে না তাই এই কঠোর প্রথা। বলা বাহুল্য এই যুক্তি খুবই দুর্বল।

ইতিহাসেও আমরা বারবার দেখেছি নারীকে পণ্যের মতো ব্যবহার করে তার ইচ্ছে অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে কখনো সামাজিক আচারের বা ধর্মীয় নিয়মের দোহাই দিয়ে নারীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গমে বাধ্য করা হয়েছে। খুবই দুঃখের বিষয় এই অমানবিক নিয়মের শিকার এখনো পশ্চিমবঙ্গের অনেক মেয়েরা, বিশেষ করে গ্রামে যেখানে স্থানীয় মোড়ল বা ধর্মীয় গুরুদের প্রভাব প্রতিপত্তি আছে সালিশি সভা গুলোতে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার

সম্পত্তির উত্তরাধিকার বা ভাগ বাঁটোয়ারা সুদূর অতীত ইতিহাস থেকেই সমাজে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এবং এর সঙ্গে আবর্তিত হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের ভাগ্যচক্র। নারীকেই যেখানে নিজস্ব ভোগ দখলের সম্পত্তিতে রূপায়িত করতে চেয়েছে সমাজ, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে নারীর হাতে সম্পত্তির দখল সেখানে খুব সহজ নয়।

আমরা যদি হিন্দু ধর্মের কথা ভাবি সেখানে দেখব প্রথমে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। তারপরে কিছু সীমিত অধিকার তারা পায় এবং তারপর ২০০৫ এর সংশোধনীর মাধ্যমে ছেলে মেয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তুলনায় অবশ্য ইসলাম সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার অনেক আগেই দিয়েছে। কিন্তু অবশ্যই তা ছেলেদের সমান নয়। তবে মেয়েদের উপর আর্থিক কোন দায়ভারও ইসলাম চাপায়নি। উল্টোদিকে সংসারের সমস্ত আর্থিক দায়ভার পুরুষের, ইসলাম অনুযায়ী। এছাড়া বৌয়ের সম্পত্তিতে স্বামীর হক নেই। কিন্তু স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার আছে। ফলে কোরানের এই আইন সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের জন্য হয়তো যুগান্তকারীই ছিল। তবে, অধুনা সংসারের গঠন, মেয়েদের দায়িত্ব যেভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে তখন এই আইন বৈষম্যমূলক। কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে যখন আর একজনের দায়িত্বের মধ্যে রাখা হয় তখন তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করা হয় না। সূরা নিসাতে আছে –^{১৮} সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে মেয়ে এবং ছেলের অংশ সমান নয়। দুই কন্যার সমান সম্পত্তি এক পুত্র পায়। একমাত্র কন্যা থাকলে সে সম্পত্তির অংশীদার হয় না। সেক্ষেত্রে, সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক কন্যা ও বাকি অর্ধেক আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন খুবই বিস্তৃত এবং অনেক বিষয়েই অনেক জটিলতার জায়গা আছে। আমরা সেই বিতর্কে বা জটিলতায় যাব না। কন্যাদের বিষয়-সম্পত্তিতে পুত্রদের তুলনায় কম দেওয়ার এই দিকটি আমাদের সন্দর্ভের প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ এর ভুক্তভোগী সমস্ত মুসলিম নারী। অনেকক্ষেত্রে অবশ্য যে অংশটুকু তাদের প্রাপ্য তাও তারা পায় না। মেয়েদের প্রাপ্য সম্পত্তির দাবি করাটাই নিন্দের চোখে দেখা হয়। লোভী হিংসুটে ইত্যাদি অভিধা জোটে। ফলে অনেকেই খুবই দারিদ্রের মধ্যে জীবনযাপন করলেও

পৈতৃক সম্পত্তির হকের অংশ থেকেও বঞ্চিত হয়। বাঙালি মুসলিম মেয়েদের বেশিরভাগের জীবনেই এই বঞ্চনা খুব সাধারণ বিষয়।

যে সমাজে নারী অর্থনৈতিকভাবে যত পিছিয়ে সেই সমাজে নারীর অবস্থান তত শোচনীয়। এখানে কোন নারী কতটা বিলাস-ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করতে পারছে তার কথা বলা হচ্ছে না, বরং সে নিজে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে কি না, সেই আর্থিক ক্ষমতা তার আছে কি না সেটাই বিচার্য।

উত্তর ২৪ পরগণায় মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারকে ফারাজ বলে। এই শব্দটি সম্ভবত, আরবি শব্দ ‘ফারায়েদ’ থেকে এসেছে। আল্লাহ যেসব আবশ্যিক পালনীয় কর্তব্যগুলি রেখেছে তাদেরকে মূলত ফারায়েদ বলে। এর মধ্যে যেমন নামাজ রোজা হজ জাকাত পড়ে তেমন কোরান নির্দেশিত বিধিতে সম্পত্তির বন্টনের কথাও পড়ে। তবে উত্তর ২৪ পরগণায় শুমাত্র মেয়েদের সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কারণ পুরুষের সম্পত্তির ভাগটা এতোই সহজ ও স্বাভাবিক একটা বিষয় যে তা আলোচনায় উঠে আসে না। এখানে অর্থের সংকোচন ঘটেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ফারাজ চাইতে আসা বা দাবি করা মেয়েদের খুবই অসম্মানজনক লোভী বলে মনে করা হয়। সামাজিকভাবে চূড়ান্ত নিন্দনীয়। অনেকে এই সামাজিক সম্মানহানির ভয়েই প্রয়োজন থাকলেও ধর্ম নির্দেশিত প্রাপ্য হক আদায় করতে পারেনা। ফলে মুসলিম মেয়েরা ‘ফারাজ’ বা ‘পৈতৃক সম্পত্তি’ শব্দকে যেভাবে তাদের মস্তিষ্কে অনুবাদ করে, এই শব্দের metalanguage যেভাবে ধারণ করে তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা জানে এইটাতে তাদের অধিকার নেই যদিও ইসলামে এর বিধান আছে। উলটো দিকে আমরা দেখব, মুসলিম ছেলেরা তাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে তাদের বোনেদের প্রাপ্য আছে বলে তেমন মনে করে না। কারণ সামাজিকভাবে এই রীতিই হয়ে চলেছে। অবিবাহিত বোনেদের দায়িত্ব

তারা নিয়ে নেবে ভাবে আর বিবাহিত মেয়েরা তাদের স্বামী শ্বশুরবাড়ির অর্থেই প্রতিপালিত হবে। এই সহজ পিতৃতান্ত্রিক সমাধান পুরুষ নারী উভয়েই এক প্রকার মেনে নেয়। ফলে মুসলিম মেয়েদের এবং মুসলিম ছেলেদের একই শব্দের অধিভাষা এখানে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

তবে খুব মুষ্টিমেয় হলেও কিছু মানুষ কিছু মেয়েরা কোরানের উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যের নিপাত চাইছেন আইনি ভাবে। তারা নিশ্চয় তাদের প্রাপ্য সম্পত্তিকে প্রাপ্য হিসেবেই দেখেন। আবার এখন বেশ কিছু কর্মরতা মহিলা আছেন, যারা বাবা মায়ের দেখাশোনা করেন অর্থনৈতিকভাবে। তাদের প্রাপ্য সম্পত্তিটুকু যাতে তারা পায় বাবা মা সেইদিকে খেয়াল রাখেন। ফলে ইদানীং সচেতন বাবা মা ও মেয়েদেরও দেখা মিলছে যারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। এক্ষেত্রে তাদের ‘ফারাজ’ বা উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত অধিভাষা বদলাচ্ছে।

যৌনতার ধারণা

ইসলামে ‘জিনা’ বলে একটি কথা আছে। ইসলামে যে সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ হারাম বা নিষেধ করা হয়েছে সেগুলিকে জিনা বলা হয়। আমরা দেখব, প্রাতিষ্ঠানিক কোন ধর্মই বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে অনুমোদন করেনি। এছাড়া সমকামিতা পায়ু কাম যা কিছু প্রজননের সঙ্গে যুক্ত নয় তাও ইসলামে জিনা বা হারাম। ইসলামে বিয়ে বা নিকাহ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সামাজিক বৈধ চুক্তি। বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি আমাদের সমাজে কম বেশি তাইই। এবার আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মুসলিম নারী। যৌনতা শব্দটি তাদের মস্তিষ্কে কীরকম অধিভাষার জগত তৈরি করে আছে আমরা এখন সেই বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব।

আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যৌনতা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলার দস্তুর নেই। সাধারণভাবে যৌন সম্পর্ক বলতে নারী পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্কের ধারণা তাও অনেকাংশেই যথাক্রমে ভোগ্য বস্তু ও ভোগীর। নারীর যৌন প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা আলোচনার পরিসর আমাদের সমাজে খুব বেশি নেই। নারীরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কে মূলত এবং অধিকাংশে নিজেকে অন্যের তৃপ্তি দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে জানে। মুসলিম মেয়েদের যে একান্ত কথোপকথন অর্থাৎ মেয়েলি যে আড্ডা অন্তঃপুরের তাতে অনেক যৌন কথাবার্তাও থাকে। সেইসব কথা এবং শব্দগুলোকে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে তাদের অধিভাষাও বেশ কিছুটা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে আমাদের কাছে। যৌন গন্ধী কথাবার্তার রকমফের আছে। বিবাহিত মেয়েদের কথা, অবিবাহিত মেয়েদের কথা বা বিবাহিত এবং অবিবাহিত মেয়েদের যে কথোপকথন তা স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছুটা আলাদা হয়ে যায়।

ছেলেদের কথাবার্তায় নারীদেহ বা নারীদেরকে শারীরিকভাবে কামনা করার যে কথাবার্তা পাওয়া যায় তাতে সুস্পষ্টভাবে নিজেদের যৌন সুখকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবং সেই যৌন সুখ আকাঙ্ক্ষা করার ক্ষেত্রে নারীদেহ কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তাই মূলত তাদের যৌনতা নিয়ে আলোচনার অভিমুখ তৈরি করে। কিন্তু মেয়েদের কথাবার্তার ধরনটি একটু আলাদা। এক্ষেত্রে বিবাহিত এবং অবিবাহিত মেয়েদের আলোচনাতেও পার্থক্য দেখা যায়। বিবাহিত মেয়েদের বেশিরভাগ কথাবার্তাতে খোলামেলাভাবে যে যৌনতার কথা উঠে আসে তাতে প্রাধান্য পায় তাদের স্বামীদের যৌন আচরণ ও তাদের যৌনজীবন। অনেকক্ষেত্রেই তারা নিজেদেরকে তাদের স্বামীর ভোগ্যসামগ্রী হিসেবেই কল্পনা করে। তাদের নিজেদের তৃপ্তি বা আনন্দ সেখানে প্রাধান্য পায়না। বেশিরভাগ মুসলিম মেয়ের নিজেদের যৌনইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা সেটাকে একপাক্ষিকভাবে অন্যের ইচ্ছের তৃপ্তির বিষয় ভাবে।

সব বয়সের মেয়েদের আলোচনাও একরকম নয়। বিশেষ করে সদ্য বিবাহিত বা বিবাহ উপযোগী বয়সের মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের আলোচনা বেশি। এছাড়া সদ্য বয়ঃসন্ধিতে পা দেওয়া মেয়েদের মধ্যেও একরকম আলোচনা দেখা যায়। এই সমস্ত আলোচনার ধরন গ্রাম শহর শিক্ষিত অশিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদেও এক একরকমের। কেউ একে রুচির ফারাকও বলতে পারে। গ্রামের দিকে সদ্য বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে বা ননদ বউদির মধ্যে এক ধরনের আদিসাত্মক আলোচনার বহুলতা আমরা দেখতে পাব। এই আলোচনা গ্রামের বিভিন্ন প্রতিবেশিনী ও যৌথ পরিবারের বিভিন্ন মেয়েদের মধ্যেও হয়ে থাকে একইসঙ্গে। তবে সেই আলোচনার মধ্যে রসালো আলোচনা যেমন থাকে পুরুষ শরীর নিয়ে অর্থাৎ female gaze থেকে পুরুষ শরীর নিয়ে আলোচনা সেই তুলনায় কম থাকে। এছাড়া নারী শরীর ও তার যৌন তৃপ্তি বিষয়েও বিশদে তারা ওয়াকিবহাল নয়। এছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন কথাবার্তায় যৌনতার অনুষ্ণু মিশিয়ে ইঙ্গিতে কথা বলা গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই রঙ্গ রসিকতা করার প্রবণতা অনেকাংশে কমে যায়। কিন্তু সাধারণভাবে যৌনতার এই ধারণার মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত যে কোন যৌনতাই সমালোচিত হয়। এখান থেকে আমরা মেয়েদের যৌনতা সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের অর্থের meta language কে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। যেমন ইংরেজি ‘সেক্স’ শব্দটি যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা ‘করেছে’/ ‘করা’ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে দেয় তার অর্থ একটি মুসলিম মেয়ের কাছে ঠিক কীরকম ?

তা যে অনেকাংশেই ছেলেদের কাছে এই শব্দটি যা অর্থ বহন করে তার থেকে আলাদা, সে কথা আমরা বলেছি। কিন্তু ধর্মও কি এই ক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? কিছু ক্ষেত্রে করে। কীরকমভাবে করে সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। প্রথমে দেখে

নিই কীরকম পার্থক্য হয় – বেশিরভাগ মুসলিম মেয়েরা যৌন সম্পর্ক বলতে আসলে যা বোঝে তাতে যৌথতার বোধ যত না থাকে তার থেকে অনেক বেশি থাকে অর্পণ করার বোধ। এইটা যে আমাদের পিতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় অনেক মেয়েই মনে করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইসলামে অন্তত, বাঙালি মুসলিম মেয়েদের কাছে ধর্ম সম্পর্কে যেসব সংস্কার বা ধর্মীয় বইপত্র দ্বারা ইসলাম কে জানার সুযোগ ঘটে তা বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমূলকও। আর মূল ইসলাম না জেনে শুধু অর্থহীন কোরান মুখস্ত করে এবং মূল কোরান প্রায় কিছুই না পড়ে যেসব ধর্মগুরুরা বিভিন্ন আদেশ বা ফতোয়া দিয়ে থাকেন তারাও ‘পর্দার আড়ালে থাকা মা বোনেদের’ স্ত্রী হিসেবে যে ভূমিকার কথা বলেন তা অনেকক্ষেত্রে তাদের যৌনদাসীতেও নামিয়ে আনে। ফলে বিবাহিত জীবন, যৌন জীবন সম্পর্কে তাদের মস্তিষ্কে অবস্থিত যে metalanguage তাতে তারা নিজদেরকে নিষ্ক্রিয় ও গৌণ তো ভাবেই তার সঙ্গে যৌনতার মধ্যে যে ক্ষমতার রাজনীতি (পাওয়ার পলিটিক্স) আছে তাতেও নিজেদেরকে তারা ক্ষমতাহীন বলেই পরিগণিত করতে থাকে।

মৃত্যু

মৃত্যুর পর ইসলামে নারী পুরুষ নির্বিশেষে কবর দেওয়ার প্রথা। বিবাহিত মহিলাদের সাধারণত তাদের স্বশ্রববাড়ির জায়গাতেই কবর দেওয়া হয়ে থাকে।

জীবনের এইসব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছাড়াও মুসলিম মেয়েদের পৃথক ও বিশেষ অধিভাষার জগতের একটি বিস্তৃত এলাকা আছে। আমরা তাদের মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

কোরান হাদিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নারী সম্পর্কে যা যা উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে উপরে সেইসব বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হল। কিন্তু আমরা মনে রাখব,

কোরান হাদিসের ঔচিত্য বিষয়ে কোন সন্দর্ভ রচনা আমাদের অভিপ্রায় নয়। ফলে, অনেকেই কোরানের বিভিন্ন অনুবাদ বা ব্যাখ্যা বিষয়ে মতান্তর পোষণ করেন আমাদের বক্তব্য তারও বিরোধিতা বা সমর্থন নয়। আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে কোরান হাদিসের প্রসঙ্গ ততখানিই প্রাসঙ্গিক ততখানিই যতখানি ও যেভাবে তা বাঙালি মুসলমান সমাজে তথা মুসলিম নারীর ভাষার অধিভাষা গঠনে সাহায্য করে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মূল কোরান হাদিস ছাড়াও বহু বাংলায় লেখা ধর্ম পুস্তক যা মূলত এইসব বাংলায় অনূদিত কোরান হাদিস থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে লেখা হয় তাও বিভিন্ন পরিবারে সযত্নে স্থান পায়। খেয়াল করলে দেখব, মুসলিম মেয়েরা বিশেষ করে বয়স্কা ও গৃহবধূরা বিপুল সংখ্যায় এইসব বইগুলির পাঠিকা। এইগুলি খুবই সরাসরি তাদের ধর্ম সম্পর্কে এবং ধর্মে নির্দেশিত নারীদের জীবনাচরণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানার্জনের পাথমিক উৎস।

তবে অনেকেই আছেন যারা অক্ষরজ্ঞানহীন এবং এইসমস্ত লিখিত পুস্তক তাদের অনায়ত্ত সেখানে তারা একমাত্র নির্ভর করেন মুখে মুখে প্রচলিত ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশ যা ধর্মগুরুদের বা মুরব্বিদের দ্বারা বা প্রাচীনাদের মাধ্যমে যা তারা শুনে থাকে। বেশিরভাগ সময়ই তারা কোরান হাদিস ঘেঁটে দেখতে যায় না যে আসলে ধর্মে কী আছে তার পরিবর্তে ইসলাম কোরান হাদিস তাদের কাছে লোক মারফৎ ধর্ম গুরুর বচনের মাধ্যমে বা পরম্পরার মাধ্যমে বাহিত হয়ে যেভাবে ধরা দেয় ধর্ম তাদের কাছে সেভাবেই ধরা দেয়। ফলে তা ভুল হোক ঠিক হোক উচিৎ হোক অনুচিত হোক, যেসব ক্ষেত্রে ধর্ম তাদের অধিভাষা নির্মাণে সহায়ক হয়ে ওঠে সেখানে এই সমস্ত ধারণাই বলবত থাকে। তাই আমরা উপরেও যে সমস্ত কোরান হাদিসকে প্রয়োজনে ব্যবহার করেছি তা বাংলা অনুবাদের। খুব কম সংখ্যক মানুষই এর বাইরে অন্য ভাষার অর্থ পড়ে থাকে। কোরান অনেকে আরবি ভাষায় পড়ে থাকলেও

বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে খুব খুব কম সংখ্যক মানুষই আরবি ভাষা পড়ে তার অর্থ উদ্ধার করতে পারেন।

কিছু বিষয় আছে যা প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম বা শরিয়ত দ্বারা নির্ধারিত, তার অন্যথা সাধারণত মুসলিম সমাজে হয় না। যেমন – বিয়ে, আকিকা, কবর, ঈদ – এই সমস্ত ধর্ম ভিত্তিক ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান। তবুও অঞ্চল ভেদে জাতি ভেদে সেখানেও কিছু কিছু আনুষঙ্গিক আচার পদ্ধতি হয়তো পরিবর্তন হয়ে যায়।

সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিয়ম নীতি এক থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জীবনে তাদের তাৎপর্য আর এক নেই।

‘বিয়ে’ শব্দটিকে যদি আমরা এক্ষেত্রে object language হিসেবে দেখে এর meta language বা অধিভাষা বোঝার চেষ্টা করি, তাহলে দেখব $M_{w,t}$ (Model of world and time) এ ‘বিয়ে’ শব্দের জন্য যেমন মুসলিম মেয়েদের অধিভাষা স্বতন্ত্র হয়ে উঠছে, অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অধিভাষা সব প্রজন্মের জন্যও একরকম নয়। প্রাচীনাদের বেশিরভাগেরই বিয়ে হয়ে যেত কম বয়সে এবং সেইসময়ে বিয়ে ও শ্বশুরবাড়ির যে ধারণা তা এখন আর এখনকার প্রজন্মের মুসলিম নারীদের মধ্যে এক নেই। যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরছে। যেসব পরিবার এখনো আছে তাদের কাঠামোও আগের মতো নয়। পরিবারের স্ত্রীর ভূমিকা গুরুত্ব মর্যাদা পালটাচ্ছে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর আগে মহিলারা তার ‘বাপের বাড়ি’ তে না এসে কাটিয়ে দিতেন। ধূসর থেকে ধূসরতর হয়ে যেত বাপের বাড়ির ছবি, কখনো বা সম্পর্কও। তুলনায়, এখনকার মেয়েদের জীবনে তাদের বাপের বাড়ির সম্পর্ক বা যাতায়াত মহার্ঘ্য নয়। আচারেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। অনেক দিন যাবত চলা অনুষ্ঠান সংক্ষেপিত হয়ে গিয়েছে। বাড়ির বড়োরাই একমাত্র সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহীতাও নন

পরিবারগুলোতে। ফলে আমরা দেখছি, T অর্থাৎ, সময় বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একই শব্দের অধিভাষা বদলে যাচ্ছে।

“ বিয়ে করে পরের ঘরে যাবে না! না বললি হবে!”

“ বিয়ে-শাদি দিয়ি দিইচি। তারা আপন আপন সংসার করছে। আসে মাঝে-সামঝে”

বিয়ে সম্পর্কিত এই বাক্যগুলিতে পুরুষ বা নারীর উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে কথাগুলি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। সামাজিক রীতি অনুসারে এখানে পুরুষদেরকে স্থাপন করা যায় না।

পোশাক-পরিচ্ছদ

মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ এমনই একটা বিষয় যেটা নিয়ে আসলে পুরুষদের মন্তব্য উপদেশ পরামর্শ বেশি আমাদের সমাজে। এমনিতে মুসলিম মেয়েদের যে চিত্র আমরা সাধারণ বাণিজ্যিক মূল ধারার সিনেমা সিরিয়ালে দেখে থাকি তাতে ‘মুসলিম মেয়ে’ এই শব্দটির অধিভাষাতে একটি কালো বোরখা পরিহিত মেয়ের ছবিই উঠে আসে। যদিও বাঙালি মুসলিম পরিবারের বোরখার প্রচলন খুব কম। কিন্তু পোশাক সম্পর্কে তাদের নিজেদের অধিভাষা কীরকম?

আমরা দেখব, বোরখা না হলেও মুসলিম মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ যাতে শালীনতার সীমা লঙ্ঘন না করে তা নিয়ে কোরান হাদিসেও সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। যদিও শালীনতার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট ভাবে বলা নেই। এবং শালীনতার সংজ্ঞা যে দেশ কাল বিচারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব সমাজেই পাল্টায় তা আমাদের অজানা নয়।

নিম্নবিত্ত মুসলিম মেয়েরা যারা কয়েক প্রজন্ম আগের তাদের জীবনে আগেই বলেছি ইসলাম বা শরিয়তের জায়গা তেমন নেই। তাদের মধ্যে আমরা বোরখা, চাদর হিজাবের কোন কড়াকড়িই দেখতে পাব না কিন্তু যত সময় এগিয়েছে তত বাঙালি মুসলিম তার মুসলমান পরিচয় নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক কারণে। ফলে এখন মুসলিম মেয়েদের জীবনে পোশাক পরিচ্ছদের অধিভাষাতে শরিয়তের নির্দেশও একটা কার্যকরী ভূমিকা নেয়। কিন্তু তার সঙ্গে এই বিশ্বায়নের যুগে জামা কাপড় যেখানে শুধু আর ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে না, বস্ত্রশিল্পের ফ্যাশন দুনিয়ার হাল হাকিকত এখন সবার নখদর্পনে। ফলে আধুনিক মেয়েদের জামাকাপড়ে আমরা বৈচিত্রের নতুন দিগন্ত দেখতে পাব। শরিয়ত এবং সিনেমা সিরিয়ালে দেখা মোহময়ী অভিনেত্রীদের অনুসরণ বা নিছক শখ বা পছন্দ বা ইচ্ছে যাই হোক – এই দুয়ের মধ্যে টানাপোড়েন চলে। আবার একদিকে যদি তা পরিবার ধর্ম সমাজ সম্মত না হয় আকর্ষণও থাকে চোরা। কেউ কেউ সমাজের পরিবারের তথাকথিত ভালো মেয়ে হতে গিয়ে এবং ধর্মের অনুশাসন দিয়ে নিজেকে বুঝিয়ে শরিয়ত বা প্রথাগত জামাকাপড়ই পরে। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখব, অন্য কেউ তার পছন্দ মাফিক জামাকাপড় পরলে সমালোচনায় মুখর হয়। আবার আধুনিক সময়ে স্কুল কলেজে নতুন পরিবেশে তারা আধুনিক জামাকাপড় বেছে নেয়। বাড়ি পরিবারের নিয়ম কানূনের মাত্রার উপরও অনেক সময় নির্ভর করে মেয়েটির পোশাক নির্বাচন কীরকম হয়। আবার মেয়েটির ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি নির্ভরতা ভীতি বিশ্বাসের উপরেও নির্ভর করে। আধুনিক সময়ের এই সমস্ত অনেক দিকই মেয়েদের নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদের অধিভাষাতে উঠে আসবে যা আগে ছিল না।

ফলে এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি $M_{w,t}$ তে মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কিত meta language কীভাবে বদলে যাচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

পোশাক সম্পর্কিত কয়েকটি উক্তি আমরা এখানে উল্লেখ করব –

১। “ছিঃ করো! উয়াই আবার কেউ পরে!” (মুমতারিনা সুলতানা, মুর্শিদাবাদ)

২। “আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে না? কোনো পরপুরুষে যেন আমার এই চামড়া না দেখতে পায়! আল্লাহর নিয়ম আছে!” (সামসুন নাহার, তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ)

৩। “না মা, বোরখা আমরা কখনো পরিনি। এই শাড়িই ছোটো থেকে পরে আসছি।”
(আবিদা খাতুন, উত্তর ২৪ পরগণা)

এই সমস্ত কথাগুলি মুসলিম মেয়েদেরই। পোশাক সম্পর্কে তাদের মনোভাব আমরা এখানে দেখতে পাব। এর সঙ্গে সংযুক্ত আর একটি শব্দ এখানে উল্লেখযোগ্য। সেটা হল –

আদব

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে ‘আদব’ বলতে সাধারণভাবে শরিয়ত নির্ধারিত ইসলামি শিষ্টাচারকে বোঝায়। কিন্তু মেয়েদের জন্য আদব আরও একটু সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় অনেক সময়ই। বিনয়, সভ্যতা শিষ্ট আচার আচারণের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জন্য আদব বলতে শিষ্ট শালীন শরিয়ত অনুমোদিতভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের পরিধানও বোঝায়। মেয়েরা নিজেরাও অন্য মেয়েদের জামা-কাপড় নিয়ে মন্তব্য করার সময় এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ, object language হিসেবে ‘আদব’ শব্দটি গ্রহণ করলে এর meta language আমরা দেখব, এটি তাদের ক্ষেত্রে যা বোঝায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে ঠিক একই বিষয় বোঝায় না। ফলে আলাদা হয়ে যাচ্ছে একই শব্দের অধিভাষা মেয়েদের জন্য। আর সময়ের সঙ্গে একে বুঝতে চাইলে দেখব, অনেক আগে এই আদবের ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু খানদানি অভিজাত মুসলিম পরিবারে। নিম্নবিত্ত মুসলিম মেয়েদের মধ্যে এর ধারণা তত প্রকট ছিল না। তারপরে তা ধীরে ধীরে বাঙালি মুসলিম সমাজ গ্রহণ করতে থাকে। তবে

এখন যাদের যাঁরা একেবারে নবীন, ছাত্রাবস্থা চলছে যাদের তাদের মধ্যে অনেকেই এই ‘আদব’ নির্ধারিত জামাকাপড়ের ধারণা থেকে সরে আসছেন। তবুও বৃহত্তর ও অধিকাংশ বাঙালি মুসলিম মেয়েদের জীবনে ও ভাবনায় এই আদব ক্রিয়াশীল। তাঁরা এই শব্দটিকে সেইভাবেই দেখেন। যাঁরা মানেন না তারাও ইসলামে নারীদের জন্য ‘আদব’ শব্দের অর্থ জানেন। অর্থাৎ তাঁদের জীবনে আচরণে অনেক সময় আদবের ধারণা না থাকলেও ‘আদব’ শব্দের এই অধিভাষার সঙ্গে তারা পরিচিত।

আজান

M_{w,t} এর w = মুসলিম সমাজ হলে, যে পাঁচটি স্তরের উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলাম, তার মধ্যে নামাজ একটি। প্রতিদিন ৫ বার নামাজ পড়া ফরজ। প্রতিবার নামাজের আগে মসজিদে নামাজ পড়ার আহ্বান করা হয়। তাকেই সাধারণভাবে আজান বলা হয়ে থাকে। এই আজান শুনে মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ে নামাজে বসে। পুরুষেরা মসজিদে বা বাড়িতে এই নামাজ পড়ে আর মেয়েরা বেশিরভাগই বাড়িতে। তবে নামাজ পড়ুক না পড়ুক বাঙালি মুসলিম মেয়েরা এই আজানের ডাক শুনলে মাথায় কাপড় দেয় অধিকাংশই। অন্য সময় মাথায় কাপড় থাক না থাক আজানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়ার প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার মধ্যেই আমরা দেখতে পাব। ফলে আজান শব্দের এই শব্দটির meta language নারীদের কাছে যেমন পুরুষদের কাছে সেরকম নয়। মেয়েদের অধিভাষাতে নামাজ পড়ার আহ্বান ছাড়াও মাথা আবৃত করার এই অনুশাসনটি যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার, মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মের মেয়েদের কাছেও এই শব্দটির অধিভাষাতে এরকম কোন অনুশাসন যুক্ত নেই। তবে যারা অনেকসময় কর্মরতা তারা কর্মস্থলে অনেক সময় এটা করে উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু মুসলিমরা অনেকসময়ই তাদের ধর্মচরণ প্রকাশ্যে করার মতো মনোবল বা আত্মবিশ্বাস পায় না। তার কারণেও অনেকসময় হয় এটা।

ধর্মীয় যেসব কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিষেধ

- জানাজা

মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজন পরিচিত অর্ধ-পরিচিত সবাই এক জায়গায় একত্রে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা বা দোয়া করে। এই বিশেষ প্রার্থনাকে জানাজা বলা হয়। কিন্তু $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের চিন্তাজগৎ হলে ‘জানাজা’ এই শব্দটির অধিভাষাতে তাদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞাটা খুব স্বাভাবিক হয়ে ধরা থাকবে। কারণ ইসলামে মেয়েরা এইভাবে প্রকাশ্যে জানাজায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে এই শব্দের meta language এ পুরুষেরা নিজেদেরকে যেরকম সক্রিয় ভূমিকায় কল্পনা করতে পারে মেয়েদের অধিভাষা বা meta language এ তা নয়। এই ঘটনা একটি পুরুষদের দ্বারা পালিত আচার তাদের কাছে। ফলে এক্ষেত্রেও আমরা দেখছি একজন নারী আর পুরুষের ‘জানাজা’ শব্দের অধিভাষা মুসলিম মেয়েদের জন্য পৃথক হয়ে পড়ছে।

- কবর জিয়ারত

কবর জিয়ারত শরিয়তে মেয়েরা করতে পারবে কি না সেই বিষয়ে খানিক বিভ্রান্তি ও বিতর্ক থাকলেও বাঙালি মুসলিম সমাজে মেয়েরা কবর জিয়ারত করতে পারে না – এমন মতই বেশি প্রচলিত ও পালিত হতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখব, পুরুষরাই কবর জিয়ারত করে থাকে।

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে কবর জিয়ারত হল প্রিয়জনের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করা। কিন্তু মেয়েদের জন্য এই কাজ নয়। ছেলেদের অন্তর্জগতে স্বাভাবিকভাবেই এই শব্দের অধিভাষা পৃথক দ্যোতনা বয়ে আনে। মেয়েরা এই

কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে না। ফলে এই শব্দের অধিভাষা বা metalangugae এ মেয়েরা নিজেদের জন্য নিষেধসূচক এক আচার হিসেবে দেখে যা ছেলেরা করে থাকে।

- মাটি দেওয়া

মাটি দেওয়া – ‘মাটি’ ও ‘দেওয়া’ এই দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থ পেরিয়ে শব্দ দুটি একসঙ্গে একটি পৃথক অর্থ ও অধিভাষা তৈরি করে যদি, $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হয়। এই কথাটিকে বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের object language হিসেবে গ্রহণ করে এর metalanguage এর দিকে অভিনিবেশ করলে আমরা দেখতে পাব, শব্দ দুটির সাধারণ অর্থ পেরিয়ে একটি বিশেষ অর্থ নির্দেশ করছে। এটিকে রূপক শব্দের আওতায় আমরা ফেলতে পারি। কবর দেওয়াকে মাটি দেওয়া বলা হয়। এই অধিভাষাটি মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েই ধারণ করলেও মেয়েরা এই মাটি দেওয়া মাটি কাটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনা। এই ক্রিয়ার সঙ্গেও মেয়েরা নিজেদের সংযুক্ত করতে পারে না। ফলে এই প্রক্রিয়ার বাইরে থাকে মেয়েরা। তাই w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, এই শব্দের অধিভাষা মুসলিম ছেলেদের থেকে খানিক আলাদা হয়ে যাবে।

- খৎনা

খৎনা মুসলিম ছেলেদের করা হয়। ছেলেদের পুরুষ লিঙ্গাগ্রচর্মচ্ছেদনের প্রক্রিয়া ইসলামে সুন্নত। আমরা দেখব, মুসলিম সমাজে প্রায় সব ছেলেরই খৎনা হয়ে থাকে। ধর্মীয় রীতি সম্মত এই আচার মেয়েদের জন্য যেহেতু প্রযোজ্য নয় তাই এই শব্দের অধিভাষা $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে ‘খৎনা’ শব্দটি একটি পুরুষ ছেলের কাছে যে তাৎপর্য বয়ে আনবে তা স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম মেয়েদের কাছে একই হবে না।

শুধু মেয়েরা ব্যবহার করে এমন শব্দ

- ভাত খেল না

মুর্শিদাবাদে এই কথাটি মেয়েদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। ছেলেরা তুলনায় অনেক কম ব্যবহার করে। এটিকে রূপক বা সাংকেতিক শব্দ বলা যেতে পারে। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ থেকে $M_{w,t}$ তে $w =$ মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে এই শব্দটির অধিভাষা সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হবে।

ভাত খাওয়া বা ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমরা জানি যে, পুরুষই নিয়ে থাকে আমাদের সমাজে। আর ইসলামও অর্থনৈতিক দায়ভার পুরুষদের উপরই চাপিয়েছে। স্বামীর ভাত বা স্বামীর রোজগার করা ভাত খায় তার স্ত্রীরা। যদি তাদের মধ্যে তালাক বা ডিভোর্স হয় তাহলে সেই বিচ্ছেদের পর এই দায়ভার পুরুষের আর থাকে না। তখন এই তালাক বা ডিভোর্সকে মেয়েরা ‘ভাত খেল না’ বলে বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ মুসলিম মেয়েদের (মুর্শিদাবাদের) অধিভাষাতে এই শব্দটি একটি সামাজিক অবস্থা, বিবাহ বিচ্ছেদকে বুঝিয়ে থাকে। এটা কোন ধর্মীয় অনুষ্ণ ব্যতিরেকে মুসলিম মেয়েদের নিজস্ব ভাষা কোড বলা যেতে পারে। একেবারে অন্য এক meta language এর দিকে এটি দিক নির্দেশ করে থাকে।

- সিকসিকেন্দে

এই শব্দটি উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েরা বহুলভাবে ব্যবহার করে থাকে। এর অর্থ যার বেশি বাছ বিচার আছে। এই শব্দটির উৎস শব্দ আজ নির্ণয় করা দুরূহ। কোন মূল শব্দের এটি অপভ্রংশ রূপ তা জানা যায়নি। তবে এই শব্দটি উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েরা ব্যবহার করে যে খাবার দাবার সাজগোজ বা ঘর গোছানো ইত্যাদি কাজে বাছ বিচার করে থাকে তাদের বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ এই শব্দের meta language এ এইসমস্ত দিকগুলি উঠে আসছে। তবে এই শব্দ গ্রামের বৃদ্ধা মেয়েরা বেশি ব্যবহার করে থাকেন।

আন্তে আন্তে শব্দটি নবীনাদের মধ্যে থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আদর্শ ভাষা বলার প্রবণতা থেকে। ফলে $M_{w,t}$ তে অর্থাৎ যেমন $w = \text{world}$ এ উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের দিয়ে প্রতিস্থাপিত হলে এই অধিভাষা এই শব্দের জন্য পাওয়া যাবে না। আবার t অর্থাৎ সময় পরিবর্তিত হলেও আমরা দেখব, এই শব্দটি মালদা মুর্শিদাবাদের নবীন প্রজন্মের মেয়েরা জানলেও তাদের কথা থেকে ক্রমশ পিছু হঠতে শুরু করেছে।

- গা ছটফট ছটফট করছে

এখানে এই পদবন্ধে একটি শারীরিক অবস্থার কথা বলা হলেও আমরা যখন এই পদবন্ধের অধিভাষা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব, খেয়াল করব এর অর্থে এর meta language এ কোন শারীরিক অসুস্থতা বা অস্বস্তির কথা নেই যা আমাদের প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। $M_{w,t}$ তে $w =$ উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে এই শব্দটির ব্যবহার একেবারে তাদের নিজস্ব।

কোন জায়গায় বা কোন কাজে আটকে পড়ে যদি অন্য কোন কাজ কোন বিষয় কোন ক্রিয়া তার সেই সময়ে করা উচিত ছিল তা করতে দেরি হয়ে যায়, তবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই জেলার মুসলিম মেয়েরা দেখব যে এই পদবন্ধটি ব্যবহার করছে। এই শব্দটির ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে, একেবারে ভিন্ন একটি অধিভাষার জগতের সন্ধান দিচ্ছে পদটি। একেও আমরা রূপক শব্দ বলতে পারি যা মুসলিম মেয়েরা ব্যবহার করছে। ছেলেদের মধ্যে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় নি। তবে এই পদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব, কম বয়সী মেয়েরা এই পদটিকে এই বিশেষ অর্থে আর তেমন ব্যবহার করছে না। অর্থাৎ Model of world and time এর নির্দিষ্ট ফ্রেমেই এই অধিভাষা প্রযোজ্য হচ্ছে। অন্য স্থান বা W তে যেমন এর ব্যবহার নেই তেমনি t পরিবর্তিত হলেও এর ব্যবহার সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সরাত

‘সুরাত’ শব্দ থেকে সরাত শব্দটি এসে থাকতে পারে। কিন্তু সরাত শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটা ঠিক সুরাত শব্দের সমার্থক নয়।

‘সরাতের জোর নেই, এখন আর পারি না কাজ করতে’

শারীরিক সামর্থ্যকে সরাত বলা হচ্ছে। শারীরিক সামর্থ্য এখানে মেয়েরা যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে ছেলেদের জন্য সেইসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। রোজগার করার ক্ষমতার সঙ্গে ছেলেদের সরাত বা সামর্থ্য বিচার্য হয় অন্যদিকে গৃহশ্রম ও ঘর কন্য়ার বিষয়ে মেয়েদের সরাত কথাটি চালু আছে। $M_{w,t}$ তে E_o তে ‘সরাত’ শব্দের E_m তে মেয়েদের জন্য অধিভাষা হবে গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত পরিশ্রম বা সামর্থ্যকে বুঝবে। অন্যদিকে, ছেলেদের ‘সরাত’ শব্দের অধিভাষাতে গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত পরিশ্রমের ধারণা যুক্ত থাকে না। আবার সময়ের দিক থেকে দেখলে দেখব, এই শব্দটিও এখন প্রায় বিলুপ্তির দিকে। কিন্তু প্রাচীনরা এখনো এই শব্দটি নিত্য দিনের কথায় ব্যবহার করে থাকে।

সতর

আরবি ‘আস সাতরু’ ধাতুমূল থেকে ‘সতর’ শব্দটি এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হল ‘ঢেকে রাখা’। শরীরের যেসব অঙ্গ লজ্জার কারণে ঢেকে রাখা হয় তাকে সতর বলা হয়ে থাকে। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের চেহারা ও হাত-পায়ের তালু ব্যতীত সর্বত্রকে সতর বা আউরাত বা আচ্ছাদনীয় অঙ্গ বলা হয়। সতর ঢাকার বিধান : আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে মানুষের ওপর যে বিধানটি সর্বপ্রথম ফরজ হয় সেটি হচ্ছে সতর ঢাকা। কোনো মানুষ শৈশব পেরলে এই বিধানটি তার ওপর আরোপিত হয়।

সতর শব্দটির ব্যবহার $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটির ব্যবহার আছে। মুসলিম পরিবার ছাড়া অন্য কোথাও এটা ব্যবহৃত হয় না। সতর শব্দটি এখানে object language হলে এর মুসলিম মেয়েদের metalanguage এ সতর শব্দটির সঙ্গে ইসলামের নির্দিষ্ট অনুশাসন যুক্ত আছে। এবং ছেলে ও মেয়েদের জন্য সতর শব্দটি আলাদা দ্যোতনা আনে। কারণ ছেলে ও মেয়ের ক্ষেত্রে সতর আলাদা হয়।

ফরমাজি/ ফরমায়েশ

উর্দু শব্দ ফরমায়িশ থেকে ফরমাজি শব্দটি এসছে আন্দাজ করা যায়। এই শব্দটি যদিও নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে থাকে।

খাঞ্চগ

ট্রের মতো জিনিস। এটি একটি ফার্সি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব, খাঞ্চগ শব্দটি ও জিনিসটির ব্যবহার বহুল। অনেকসময় বড়ো এই পাত্রে প্রচুর খাবার সাজিয়ে এক বা একাধিক জনকে একসঙ্গে খেতে দেওয়া হয়। নারী পুরুষ উভয়েই খাঞ্চগ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। w = হিন্দু সমাজ হলে, এই শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখব না। এই জিনিসটিও তাদের রন্ধন বা হেঁসেলের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। কিন্তু মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতে খাঞ্চগ শব্দটি তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যেই পড়ে। তাদের গৃহস্থালি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত এই শব্দটি। খাঞ্চগতে আয়োজিত খাদ্যবস্তুর নির্মাতাও মেয়েরাই হয় বেশিরভাগ সময়।

চিলিপচি/ চিলিমচি -

হাত ধোওয়ার পাত্র বিশেষ। সাধারণত কাঁসা বা ধাতব পাত্র বিশেষ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, চিলিপচি ব্যবহৃত একটি পাত্র। আত্মীয় স্বজনদের আপ্যায়নে এটি অপরিহার্য

একটি পাত্র। তবে অধুনা ডাইনিং টেবিল এবং বেসিন আসার ফলে অনেক শহুরে মুসলিমদের মধ্যে চিলিপটি এখন আর ব্যবহার করছে না। তবে গ্রামের দিকে চিলিপটির ব্যবহার এখনও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই চিলিপটির ব্যবহার দেখা যায় না। মেয়েরা আত্মীয় স্বজন এলে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে খাওয়ার পর হাত ধোওয়ার জন্য চিলিপটি এগিয়ে দিয়ে থাকে। ফলে, ‘চিলিপটি’ শব্দের অধিভাষা মুসলিম নারীর জন্য যে ব্যঞ্জনা বয়ে আনে তা বিশেষ দিক তুলে ধরে যা অন্যদের মধ্যে আমরা দেখব না।

তাকাত

শক্তি। ফার্সি ‘তাকাত’ থেকে শব্দটি বাংলা ভাষাতে প্রবেশ করেছে। বাঙালি মুসলিমদের কথোপকথনে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। তাকাত শব্দটি পুরুষ মহিলা উভয়কেই ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে এই শব্দের অধিভাষা বা metalanguage মুসলিম নারী পুরুষের জন্য এক নয়। সাধারণত, তাকাত বা শারীরিক শক্তিকে পুরুষের সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়। যা কিছুটা বিজ্ঞানসম্মতও। অন্যদিকে মেয়েদের শারীরিক শক্তি বা তাকাত কম সে সম্পর্কে তারা নিজেরাও ওয়াকিবহাল। ফলে শারীরবৃত্তীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘তাকাত’ শব্দের অধিভাষা একটি ছেলের ও মেয়ের এক হবে না। অন্যদিকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে, একা একাই অনেকে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন ফলে তথাকথিত পুরুষালি কাজে তারাও অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আবার t = অতীতের সময় হলে, সেখানে মেয়েদেরকে ঘরের অনেক কায়িক পরিশ্রম করতে হতো যা ইদানীংকালে কিছুটা প্রযুক্তির কল্যাণে লাঘব হয়েছে। ফলে তাদের তাকাতের প্রয়োগক্ষেত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেছে। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, $M_{w,t}$ তে t , w পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির অধিভাষা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

তকদির

শব্দটির অর্থ ভাগ্য। এটি একটি আরবি শব্দ। w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘তকদির’ শব্দটির অধিভাষাতে সর্বজ্ঞ আল্লাহর দ্বারা নির্ধারিত ভাগ্যের কথা উঠে আসবে। আল্লাহই সমস্ত কিছুর চালক শক্তি। আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস ‘তকদির’ শব্দের metalanguage এ উঠে আসবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তকদির কথাটি হিন্দু বাঙালিদের ব্যবহার করতে খুব একটা দেখা যায় না।

তৌফিক

অর্থ হল সামর্থ্য। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, এই শব্দটি অধিকাংশ সময়ই ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়। যেমন - ‘আল্লাহ তোমায় সৎ রাস্তায় চলার তৌফিক দান করুন।’ অন্য সময়ে সাধারণত এই শব্দটির ব্যবহার তেমন দেখা যায় না মুসলিম সমাজে। নারী পুরুষ উভয়ই অবশ্য এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। মুসলিম সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজে এই শব্দটির অধিভাষাতে কোন বিশেষ তাৎপর্য ধরা পড়বে না।

নফস

এটি একটি আরবি শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হল সত্ত্বা। ‘মন’ বা অহংবোধ অর্থে নফস শব্দটিকে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই শব্দটি জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত নয়। তবে হাফেজ সাহেব বা মৌলবী বা ধর্ম বা ধর্মীয় পুস্তকের সঙ্গে যারা গভীরভাবে যুক্ত তারা অনেকেই নফস শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। অনেক মেয়েদের মধ্যেও আমরা এর ব্যবহার পাব। $M_{w,t}$ এর এই ফ্রেমে w = প্রবীণা মুসলিম মেয়েদের মনোজগৎ হলে ‘নফস’ শব্দটির অধিভাষাতে আমরা ‘মন’ বা অহংবোধের ধারণা পাব।

অন্যদিকে w = সুফি বা শিয়াদের চিন্তাজগতে ‘নফস’ শব্দের ভিন্ন আর একটি ব্যাপ্তি এক্সটেনশন আছে। ‘নফস’ এখানে মনুষ্য চরিত্রের অপরিশোধিত জৈবিক প্রবৃত্তি বা রিপু; যাকে সুফিরা নফস বলে থাকে। নারী পুরুষ উভয়েরই নফসের অধিভাষায় রিপুর ধারণা ধরা পড়ে। তবে সব বাঙালি মুসলিমরা এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নয়। w = হিন্দু বাঙালি সমাজ হলে, ‘নফস’ কথাটি খুব একটা পরিচিত নয়। তাই তাদের এই শব্দের অধিভাষা মুসলিমদের অধিভাষার মতো হবে না।

সাদকা দেওয়া

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, সামর্থ্য থাকলে জাকাত দেওয়া ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু জাকাতের বাইরেও যে সমস্ত দান করা হয় মানুষের মঙ্গল কামনায় তাকে সাদকা বলা হয়। অর্থাৎ সাদকা ইসলামে বাধ্যতামূলক নয়। কোনো প্রতিদানের আশা না রেখে গরিব মিসকিনদের দান করাকে সাদকা দেওয়া বলে। সাদকা দেওয়া সওয়াবের বা পুণ্যের। আল্লাহ এতে সাদকা দানকারীকে সৎ পথে চলতে সাহায্য করেন। সাদকাও নারী পুরুষ উভয়েই দিতে পারে। এমনকী, মৃত মানুষের নাম করেও সাদকা দেওয়া যেতে পারে। তাতে সেই মৃত ব্যক্তি সওয়াব পেতে পারেন। t বা সময় সাপেক্ষে ‘সাদকা’ শব্দের অধিভাষায় খুব বেশি পরিবর্তন সাধিত হয় নি। এই শব্দটির সঙ্গে ধর্মীয় বিধির অনুষঙ্গ যুক্ত আছে।

ফেতরা

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘ফেতরা’ শব্দটি খুবই পরিচিত একটি শব্দ। গরিব মানুষদের এটা ন্যায্য পাওনা। রমজান মাস পেরিয়ে এক মাস উপবাস ও কৃচ্ছসাধনের পর খুশির ইদ আসে। এই সময় সম্পন্ন মুসলিমরা দুস্থ গরিব মানুষদেরকে দান করতে হয়। সেই দানকে ফেতরা বা ফিতরা বলা হয়ে থাকে। গরিব মানুষদের আনন্দ বিনোদনে সাহায্য

করা এর উদ্দেশ্য। এটি সওয়াবের কাজ। ফেতরা শব্দটির ব্যবহার অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নেই। মুসলমান নারী পুরুষের মধ্যে ‘ফেতরা’ শব্দের অধিভাষাতে তাই রমজান ও ইদের অনুষ্ঠান একসঙ্গে উঠে আসে। এছাড়া ইসলাম দান করাটাকে কখনো বাধ্যতামূলক কখনো ঐচ্ছিক রেখে দীন দুখীদের সাহায্য করাটাকে উৎসাহিত করেছে। নারী পুরুষ উভয়ই ফেতরা পেতে ও দিতে পারে।

বদনা

ওজু করার জন্য বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ঘটির মতো দেখতে নল যুক্ত জল রাখার পাত্র। মুসলিম সমাজে বদনার ব্যবহার ব্যাপক। জল দুধ ইত্যাদি পানীয় রাখার কাজে বদনা বহুকাল আগে থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুসলিমরা এছাড়াও গোসল ওজু ও মল ত্যাগের সময় বদনা ব্যবহার করে থাকে। এইসমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালিদের বদনা ব্যবহার করতে আর ততটা দেখা যায় না। ফলে, $M_{w,t}$ তে $w =$ মুসলিম সমাজ হলে সেখানে ‘বদনা’ শব্দের অধিভাষাতে যে সমস্ত ব্যবহারের দিক উঠে আসবে তা হিন্দু সমাজের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মুসলিম বাড়িতে বদনার ব্যবহার আছে। তবে $t =$ ইদানীং কালে, বদনার পরিবর্তে অত্যাধুনিক বিভিন্ন বাসন পত্র তৈরি হয়ে বদনাকে অনেকটা প্রতিস্থাপন করেছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কিন্তু গ্রামের দিকে অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে বদনা এখনো পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই বদনা অনেকাংশেই মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বরকত

অর্থ হল সৌভাগ্য বা সমৃদ্ধি। $M_{w,t}$ তে $w =$ মুসলিম সমাজ হলে, ‘বরকত’ শব্দটির ব্যবহার বহুল। আল্লাহর কল্যাণময় ইচ্ছে থাকলে জীবন বরকতময় হয়ে ওঠে। এই তাদের বিশ্বাস।

t অর্থাৎ সময়ের সাপেক্ষে এই শব্দের অধিভাষা মুসলিমদের কাছে খুব বেশি বদলানোর সম্ভাবনা কম। কারণ এটি ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে জাত। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েই এই বরকত শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। মেয়েরা গৃহস্থের কল্যাণ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের খুঁটিনাটি নানা ক্ষেত্রে এই বরকত শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যেমন-

“ফকির মিসকিনদের দান খয়রাত করলে আল্লাহ সংসারে বরকত দেয়” (মজিদা খাতুন, উত্তর ২৪ পরগণা)

বরকত শব্দটির সঙ্গে হিন্দু বা অন্য ধর্মের মানুষদের পরিচয় নেই অন্যদিকে আল্লাহর বরকত তাদের জীবনে নিষ্পয়োজনও। এই শব্দটির ব্যবহার তাই একেবারেই মুসলিম সমাজের নিজস্ব। আর দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহর বরকত মুসলিম মেয়েরা তাদের ঘর গৃহস্থালির কাজে সবসময় প্রার্থনা করে থাকে।

মেসওয়াক

দাঁতন করা অর্থে মেসওয়াক ব্যবহৃত হয়। মেসওয়াক করা ইসলামে খুব ভালো ও উপকারী বলে মনে করা হয়। এমনকি রোজার সময় যখন নিরমু উপবাসে থাকে তখন মাজন সহযোগে ব্রাশ করা যায় না। বেশিরভাগ রোজদার মানুষই তখন নিম পেয়ারা বা খেজুরের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করে দাঁত পরিষ্কার রাখে। $M_{w,t}$ এর এই ক্ষেত্রে t যদি বর্তমান সময় থেকে পেছনের দিকে হাঁটি তাহলে দেখব যে, দাঁত পরিষ্কার করার একটি মান্য প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি ছিল মেসওয়াক করা মুসলিমদের মধ্যে। কিন্তু এখন অধিকাংশ মানুষই ব্রাশ টুথপেস্ট ব্যবহার করে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেসওয়াকের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এসছে। কিন্তু ধর্মের দিক থেকে মেসওয়াক করা যেহেতু ইতিবাচক তাই মুসলিম সমাজে মেসওয়াক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ‘মেসওয়াক’ শব্দের অধিভাষা একজন মুসলিমের জন্য পৃথক হয়ে

যাবে। মুসলিম মেয়েদের অধিভাষায় তাই মেসওয়াক শব্দের যে ধর্মীয় এক্সটেনশন ধরা পড়বে তা সাধারণভাবে অন্য ধর্মের মানুষদের অধিভাষায় ধরা পড়বে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শব্দের অধিভাষা খুব বেশি পৃথক হবে না পুরুষদের থেকে।

মিসকিন

এমন অসহায় ব্যক্তিবর্গ যারা ভিক্ষুক নন কিন্তু দুস্থ। প্রকাশ্যে তারা ভিক্ষে চাইতে পারেন না। এমন মানুষদেরকে মিসকিন বলা হয়। ইসলামে এইরকম মানুষদেরকে দান খয়রাত করার কথা বলা হয়েছে। ‘মিসকিন’ এই শব্দটি হিন্দুদেরকে ব্যবহার করতে দেখি না। কিন্তু সম্পন্ন মুসলিমরা ফকির মিসকিনদের মধ্যে জাকাত বা ফেতরা দান করে থাকে ধর্মীয় উপদেশ অনুসারে। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে ‘মিসকিন’ শব্দের অধিভাষাতে হতদরিদ্র মানুষের ছবি ভেসে ওঠে। এই শব্দটিও মুসলিমদের একেবারে নিজস্ব ব্যবহৃত শব্দ।

মোবারক

এর অর্থ অভিনন্দন। ‘ইদ মোবারাক’ কথাটি ইদের দিনে শুভেচ্ছা জানাতে ব্যবহার করা হয়। মুসলিমরা নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে ইদ মোবারাক বলে থাকে। অমুসলিমরাও মুসলিমদেরকে ইদের শুভেচ্ছা জানাতে ইদ মোবারাক বলে থাকে।

$M_{w,t}$ এর ক্ষেত্রে w = মুসলিম সমাজ হলে ‘মোবারাক’ শব্দের অধিভাষাতে ইদের শুভেচ্ছার অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। এছাড়া অন্যান্য আনন্দানুষ্ঠানে মোবারাক জানানোর প্রথা আছে। তবে সেটা কম। আর হিন্দু বাঙালিরা মোবারাক শব্দটা নিজেদের মধ্যে প্রায় ব্যবহার করেই না।

শিরক

আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক করে ফেলাকে শিরক বলা হয়। ইসলামে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য মনে করা অমার্জনীয় অপরাধ। তাতে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। $M_{w,t}$ এর ফ্রেমে w = মুসলিম সমাজ হলে ‘শিরক’ শব্দের অধিভাষাতে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বিষয় উঠে আসে যা অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে এই শব্দের অধিভাষাতে এরকম কোন ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে না।

সওয়াব

এটি একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রতিদান। সমাজের প্রতি মানবিক, ভালো কাজ ও আল্লাহর প্রতি ইমান ও ভক্তির প্রতিদানে আধ্যাত্মিক পুরস্কারকে সওয়াব বলা হয়। নারী পুরুষ উভয়েই এই সওয়াবের পরিমাণ অনুযায়ী জান্নাতে সুখে থাকবে। $M_{w,t}$ এই মডেলে ‘সওয়াব’ শব্দটির অধিভাষাতে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা ও ভালো কাজের ধারণা ধরা থাকে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস বা ইমান ছাড়া সওয়াব অর্জন সম্ভব নয়। ফলে w = অমুসলিম মানুষের চিন্তাজগৎ হলে সেখানে সওয়াব কথাটির সঙ্গে আল্লাহর প্রতি ভক্তি বা ইমানের কোন অনুভূতি বা ভক্তি যুক্ত থাকবে না। বড়োজোর তিনি এর শব্দার্থ জানতে পারেন। তবে মুসলিম নারী পুরুষের জন্য খুব বেশি আলাদা হবেনা ‘সওয়াব’ শব্দের অধিভাষাতে। শুধু বিশেষভাবে যে সমস্ত কাজে মেয়েদেরই সওয়াব হয়, যেগুলো পুরুষদের জন্য নির্ধারিত নয় সেই সমস্ত কাজের ধারণাও মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতে উঠে আসতে পারে।

সালাত

সালাত শব্দের অর্থ নামাজ। ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর মূলত স্থাপিত বলে মনে করা হয় তার মধ্যে নামাজ অন্যতম। এটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরজ বা অবশ্যপালনীয়

কর্তব্যের একটি। নামাজের বিধি নারী পুরুষের জন্য প্রায় একই শুধু কিছু কিছু ক্ষেত্র বাদ দিয়ে। এছাড়া মসজিদে গিয়ে অধিকাংশ পুরুষরাই নামাজ পড়ে থাকেন। অন্যদিকে ধর্মীয় বিধিনিষেধ না থাকলেও মেয়েদের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদ প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে তারা বাড়িতেই নামাজ পড়ে থাকে। ‘নামাজ’ শব্দের অধিভাষাতে তাই ছেলেদের মধ্যে মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ার যে ধারণা থাকবে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই মসজিদের পরিবর্তে ঘরের ধারণা যুক্ত থাকে। এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সঙ্গে সময়ের ধারণা যুক্ত থাকে মুসলিমদের। তবে নামাজ যে সব মেয়েরা পড়ে এমন নয়। এমন কী, বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বয়স্কা মহিলারা অনেকেই নামাজ পড়তে পারেন না। পরের প্রজন্মে শরিয়তি শিক্ষা দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ফলে t বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ‘সালাত’ শব্দের অর্থ পৃথক হয়ে পড়ে। $M_{w,t}$ এর এই ক্ষেত্রে সালাত শব্দের অধিভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের জন্য তাই খানিক বদলে বদলে যাবে। তবে সালাত শব্দটির থেকে নামাজ শব্দটি অনেক বেশি প্রচলিত।

হাসর

হাসর একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হল একত্রিত হওয়া বা জড়ো হওয়া। পরকালের বিচারের জন্য যে মাঠে বা ময়দানে সমস্ত মানুষ প্রাণীকে একত্রিত হতে হবে বলে ইসলাম ধর্মের মানুষজন মনে করেন তাকে হাসরের ময়দান বলে। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে ‘হাসর’ শব্দটির অধিভাষায় একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল ও ইহলোকের কৃত কর্মের প্রতি এক ধরনের ভয় আশংকা উদ্বেগ জন্মাতে পারে। আসতে পারে সংসারের প্রতি সাময়িক বৈরাগ্যও। এই শব্দটিও মুসলিম নারী পুরুষের অধিভাষাতে খুব বেশি পার্থক্য করতে পারে বলে মনে হয় না।

আজাব

আজাব শাস্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আজাব শব্দটির ব্যবহারও ধর্মীয় ক্ষেত্র বিশেষেই সীমাবদ্ধ। কবরের আজাব বা কবরের শাস্তি অর্থে খুব বেশি ব্যবহার হয় মুসলিমদের মধ্যে এই শব্দটি। নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে থাকে শব্দটিকে। পৃথিবীতে কৃত পাপের শাস্তি কবর থেকেই শুরু হয়ে যায়। এই শব্দটিকে E_o ধরলে এর E_m বা অধিভাষা নারী পুরুষের ক্ষেত্রে খুব বেশি পৃথক হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর কোরান হাদিস বর্ণিত আজাবের স্বরূপ যেহেতু অপরিবর্তিতই আছে তাই এর ধারণাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খুব বেশি পাল্টে যেতে পারেনি।

নিয়ত

এটি একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হল পরিকল্পনা করা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘নিয়ত’ শব্দটি খুবই পরিচিত শব্দ। সাধারণত আল্লাহর কোন ইবাদাত বা ধর্মীয় কোন আচার পালনের আগে বা আল্লাহর নামে বরকতের জন্য, নেকির জন্য বা নেহাৎ আল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোনও কিছু করার প্রতিজ্ঞা বা অন্তর থেকে ইচ্ছে প্রকাশ করলে তাকে নিয়ত বলা হয়। যেমন - রোজা করার আগে রোজার নিয়ত করতে হয়, শুধুমাত্র একদিন রোজার মাসে হঠাৎ করে উপবাস করা হয়ে গেলে সেটা রোজা বলে মঞ্জুর করা হয় না। আবার মনের কোনো ইচ্ছে পূরণ হলে অনেকে কয়েক জন ফকির মিসকিনকে খাওয়ানোর নিয়ত করে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত বান্দা সৎ পথে চলার বা ধর্মের পথে চলার কোনো ইচ্ছে প্রকাশ করলে বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে তাকে নিয়ত করা বলা হয়ে থাকে। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েই এই নিয়ত করে থাকেন। ফলে, ‘নিয়ত’ শব্দের অধিভাষাতে একজন মুসলিম ব্যক্তির এই সমস্ত বিশেষ বিষয়গুলির অনুষ্ণ উঠে আসবে। এছাড়া উল্লেখ্য, নিয়ত কথাটি বাঙালি হিন্দুদের ব্যবহার করতে দেখা যায় না।

প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব কিছু আচার অনুষ্ঠান থাকে। আর আমাদের সমাজে ‘মেয়েলি আচার’ বলে পৃথক একটি ধারাই আছে। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা এই বিশেষ শ্রেণি খেয়াল করব। মেয়েলি আচারগুলি সাধারণত ধর্মের মূল তত্ত্ব থেকে আলাদা হয়ে সামাজিক বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক দিককে আত্মস্থ করে নেয়। ‘বাংলার ব্রত’তে অবনীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, হিন্দু ধর্মের অনেক মেয়েলি আচারের মধ্যে লৌকিক পরম্পরা বর্তমান যা মূল বৈদিক ধর্মে নেই।

বাঙালি মুসলিম নৃতাত্ত্বিকভাবে প্রধানত বাঙালি হিন্দুর উত্তরাধিকার বহন করছে। আমরা বাঙালি মুসলিমদের বিভিন্ন মেয়েলি আচারে সেইসব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের চিহ্ন মাঝে মাঝে পাব। তবে এইসব বাদ দিয়েও মুসলিম মেয়েদের জন্য বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান আছে যা তাদের এক পৃথক অধিভাষার জগৎ নির্মাণ করে। অনেক সময় এই অনুষ্ঠানবাচক শব্দগুলো গভীর এক ব্যঞ্জনার দিকে নির্দেশ করে যা শুধু বাচ্যার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না।

$E_o = E_m$ এর ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় অধিভাষা প্রকাশের সঙ্গে ভাষা প্রকাশ এক থাকলেও তা যদি সহজে পাঠকের মর্মে গিয়ে প্রবেশ না করে তাহলে বুঝতে হবে আরও বাড়তি অর্থগত ভাব অধিভাষা স্তরে মস্তিষ্কের ভেতর উন্মোচনের বা decoding এর অপেক্ষায় থেকে যায়। E_m আসলে গভীরতর তাৎপর্য নিয়ে যায় এখানে। E_m ব্যঞ্জিত অর্থ প্রকাশ করে। ব্যঞ্জিত অভিব্যক্তি প্রকাশের এই জগৎকে metaphorical কিংবা symbolic world হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই অধিভাষার জগতকে ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী suggestive world হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। অর্থাৎ,

$$E_o = E_m / E_m^s \text{ যেখানে } s = \text{suggestive world.}$$

আনুষ্ঠানিক শব্দ ছাড়াও আমরা মুসলিম মেয়েদের ব্যবহৃত আরো কিছু শব্দ দেখব যাদের অধিভাষা কোনো suggestive world এর দিকে নির্দেশ করে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা সেইসব শব্দ নিয়েও আলোচনা করব।

আমরা এখন এরকম কিছু শব্দ দেখে নেব

বিয়ের সঙ্গে যুক্ত কিছু আনুষ্ঠানিক বা আচার মূলক শব্দ

গায়ে হলুদ

বিয়ের আগে সব অঞ্চলেই প্রায় গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অনেক জায়গাতে ছেলের বাড়ি থেকে হলুদ আসে। কোথাও আবার আসে না। কিন্তু এই গায়ে হলুদের সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই বিয়ের আগে এই হলুদ মাখানো হয়। ফলে এই শব্দটি একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ক্রিয়া হয়ে ওঠে বিয়ের প্রেক্ষাপটে। গায়ে হলুদ বললেই উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটের বহু জায়গাতেই যে অধিভাষার ছবি মাথায় আসে তা বিয়ের অনুষ্ঠানকে সূচিত করে।

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, বাঙালি মুসলিমের গায়ে হলুদ পর্বে আমরা দেখব বিভিন্নরকম গান ছড়া প্রবাদ অনুষ্ঠিত হয় যা মেয়েদের দ্বারা পালিত হয়। অঞ্চল ভেদে এই সমস্ত গান নাচের অনুষ্ঠানগুলি আলাদা হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদে বিয়ের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গানের একটি দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা পাওয়া যায়। মুসলিম পরিবারে অনেক সময় বিয়ের আগের দিন হলুদ অনুষ্ঠান হয়, আবার কোথাও বেশ কিছুদিন ধরে চলে হলুদের অনুষ্ঠান। ব্যস্ত জীবন যাপনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন অবশ্য বেশিরভাগ জায়গাতেই একদিনই এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

মেহেন্দি পরা

বিয়ের আগে প্রায় সব বাঙালি মুসলিম মেয়েরাই মেহেন্দি পরে থাকে। মেহেন্দি এমনিতেই মুসলিম সমাজে খুবই আদৃত। বলা হয়, হজরত মহম্মদ তার দাড়িতে মেহেন্দি পরতেন। এছাড়াও মেহেন্দি মুসলিম ছেলে মেয়ে উভয়ই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বিয়ের আগে

মেহেন্দি পরা মুসলিম বিয়েতে একটি মেয়েলি আচারের মধ্যে পড়ে। অনেক জায়গাতে বরের হাতেও মেহেন্দি পরানো হয়। পরানোর সময় কম বয়সী বা সমবয়সী মেয়েরা অনেক জায়গাতেই নাচ গান এর উৎসবও করে থাকে। ফলে, $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম বিয়ে হলে সেখানে মেয়েদের হাতে মেহেন্দি পরা একটি মুসলিম বিবাহ রীতির অঙ্গীভূত একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক অভ্যাসকে চিহ্নিত করে থাকে। মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতেও এই শব্দবন্ধটি বা ক্রিয়াটি নিছক ক্রিয়া হয়ে আর থাকে না, বিয়ের অনুষ্ঠান বয়ে আনে। ‘মেহেন্দি’ শব্দটির অধিভাষা তাই সাধারণ শব্দার্থ ছাড়িয়ে যে বিশেষ ব্যঞ্জনা বয়ে আনে মুসলিম মেয়েদের জন্য তা তাদের suggestive world কে নির্দেশ করে।

ইদানীং বাঙালি হিন্দু বিয়েতেও উৎসব উদযাপনকে খানিক দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য ও টিভি সিরিয়াল সিনেমা মারফত অবাঙালি বিয়ের রীতি দেখে তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ‘সঙ্গীত’ ‘মেহেন্দি’র মতো অনুষ্ঠানকে যোগ করে নিচ্ছে বিয়েতে। কিন্তু বাঙালি মুসলিমদের বিয়েতে ‘মেহেন্দি’ পরার রেওয়াজ সাম্প্রতিক কালের নয়।

ওয়ালিমা

বিবাহ উপলক্ষে প্রীতি ভোজকে ওয়ালিমা বলা হয়ে থাকে মুসলিম সমাজে। অর্থাৎ এই প্রীতি ভোজ অনুষ্ঠানও একটি বিশেষ ধর্মীয় সামাজিক আচারকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। সাধারণভাবে লোকজনকে খাওয়ানোর থেকে তাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে এর তাৎপর্য।

এই বিশেষ শব্দটির metalanguage বা অধিভাষাতে তাই নির্দিষ্টভাবে মুসলিম সমাজের বিয়ের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানের দিকে ইঙ্গিত করে। তবে ধীরে ধীরে মুসলিম ছেলে বা মেয়ে উভয়ের মধ্যেই এর ব্যবহার কমছে। নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়স্কদের মধ্যে ধীরে ধীরে এই শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রের কার্ডে আমরা

এই শব্দের বহুল ব্যবহার দেখব। এই শব্দটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ ফ্রেমে যদি $w =$ world বলতে মুসলিম তথা বাঙালি মুসলিম বিশ্বকে ধরি আর সময় বর্তমান কালকে ধরি তবে এই শব্দটি শুধুমাত্র একটি বিশেষ্যপদ নয়, একটি ক্রিয়া বোঝাবে। যার অর্থ বাঙালি হিন্দু সমাজে সেভাবে প্রচলিত নয়। এই শব্দটির অধিভাষা তাই মুসলিম মেয়েদের suggestive world কে চিহ্নিত করে।

নেপ্লাভার

উত্তর ২৪ পরগণায় বিয়ের পরদিন কন্যাযাত্রী বরের বাড়িতে গিয়ে নতুন জামাই ও মেয়েকে নিয়ে আসে। সেই উপলক্ষে, কন্যাযাত্রীদের বরের বাড়ি যাওয়ার অনুষ্ঠানকে নেপ্লাভার বলা হয়। এই শব্দটির প্রচলন অন্য জেলায় খুব একটা নেই। $M_{w,t}$ তে $w =$ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মুসলিম সমাজ হলে, এটি একটি প্রচলিত একটি শব্দ যার ব্যবহার অন্য ধর্মের লোকজনরা করেন না। ফলে, এই শব্দটিও মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ আনুষ্ঠানিক জগতকে আলোকপাত করে থাকে। এই শব্দটির metalanguage এ তাই মুসলিম সমাজের একটি বিশেষ দিক ধরা থাকে। যা খুব আলাদা করে শুধু মেয়েদের জন্য নয়। মেয়ে ছেলে সবার জন্যই।

নিকাহনামা

মুসলিম বিবাহের চুক্তিপত্রকে নিকাহনামা বলা হয়। এই চুক্তিপত্রের অনেক অংশই মেয়েদের অনেক রকম ইসলামিক আইনের জটিলতা থেকে বাঁচাতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই এই চুক্তিপত্রের সমস্ত দিক সম্পর্কে পাত্রীপক্ষ বা পাত্রীর বিশদে জানা থাকে না। তবে দেনমোহরের অংশ ইসলামিক বিয়েতে আবশ্যিক। দেনমোহরের পরিমাণ সহ পাত্র পাত্রীকে নিকাহনামা পড়ে শোনানো হয়। এই নিকাহনামা অনুযায়ীই পাত্র পাত্রীর প্রতি আলাদা আলাদা

দায়িত্ব কর্তব্য ন্যস্ত হয়। এছাড়া বিবাহের প্রকৃতি স্থির হয়। ফলে মুসলিম বিয়েতে নিকাহনামা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সম্প্রদায়ের বিয়েতে এই নিকাহনামা একটি অবান্তর বিষয়। অর্থাৎ $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে এই নিকাহনামা বিয়ের চুক্তিপত্র হয়ে দাঁড়াবে যা খুবই তাৎপর্যবাহী। আবার যদি মুসলিম মেয়েদের কাছে এই নিকাহনামা শব্দটির metalanguage অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া যায় তাহলে দেখব এর সঙ্গে যুক্ত দেনমোহরের পরিমাণ, তা গ্রহণ এই সমস্ত দিক উঠে আসতে পারে। অন্যদিকে, মুসলিম পুরুষ এক্ষেত্রে দেনমোহর গ্রহীতার ভূমিকায় থাকে ফলে ‘নিকাহনামা’ শব্দটির metalanguage পুরুষদের ক্ষেত্রে আলাদা হয়। মুসলিম মেয়েদের নিকাহনামা শব্দের গূঢ় ব্যঞ্জনার দিকটিকে অর্থাৎ আমরা E_m কে E_m^s দিয়ে বোঝাতে পারি। অর্থাৎ suggestive world এর দিকে এই শব্দটির অধিভাষা নির্দেশ করে যা অন্য কারোর পক্ষে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করা মুশকিল।

দেনমোহর

মুসলিম বিয়েতে পণ নেওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিবাহে বরকে কনেকে তার সামর্থ্য, আয় অনুসারে টাকা প্রদান করতে হয়। এটা আবশ্যিক সমস্ত ইসলামিক বিয়েতে। এই টাকাকে দেনমোহর বলা হয়ে থাকে। অনেকসময়, স্ত্রী ‘খুলা’র মাধ্যমে ডিভোর্স চাইলে এই দেনমোহর ফিরিয়ে দিতে হয়। দেনমোহর সম্পর্কিত এই ধারণা একান্তই মুসলিম সমাজের। অর্থাৎ $M_{w,t}$ তে w = ইসলামিক বিশ্ব হলে বিয়েতে দেনমোহরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই দেনমোহরের ক্ষেত্রে যেহেতু মুসলিম নারী ও মুসলিম পুরুষের ভূমিকা এক নয় তাই ‘দেনমোহর’ শব্দের Metalanguage নারী পুরুষ ভেদে আলাদা। দেনমোহরকে স্ত্রীধন বলা হয়ে থাকে। মুসলিম নারীর এই শব্দটির অধিভাষাকে আমরা E_m^s বা suggestive world হিসেবে দেখতে পারি যেহেতু এই শব্দটির অধিভাষার জগৎ একেবারেই আলাদা হবে অন্যদের জন্য।

সেহরি

মুসলিমরা রোজা চলাকালীন নিরম্ব উপবাস রাখে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি এই উপবাস রাখতে হয়। সূর্যোদয়ের আগে রোজদার মানুষ কিছু খেয়ে নেন। এই খাবার খাওয়াকে সেহরি বলে। পাড়ায় পাড়ায় এই সময় সেহরি খেতে ওঠার জন্য মানুষকে সতর্কও করা হয়। সেহরিতে এক এক জায়গার মানুষ এক এক রকম খাবার খেয়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গে। কেউ ভাত খায়, কেউ দুধ কলা বা ফলমূল খেজুর ইত্যাদি ঘরের আয়োজন অনুযায়ী খেয়ে থাকে। $M_{w,t}$ এর w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব, ‘সেহরি’ শব্দের metalanguage এ মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েরই সেহরির সময় খাবারের ধরন এবং রোজার ধারণা সংযুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব, বেশিরভাগ সেহরির জন্য খাবারের আয়োজন মেয়েরা করে থাকে বলে ‘সেহরি’ শব্দের সঙ্গে তাদের নিজস্ব খাবারের আয়োজন করার ভূমিকাও যুক্ত হয়ে থাকে যা ছেলেদের সচরাচর থাকে না।

ইফতার

সূর্যাস্তের পর সারাদিন রোজা রাখার পর খাবার খেয়ে রোজা ভাঙা হয়। একে ইফতার করা বলে। আর যা খেয়ে ইফতার করা হয় তাকে ইফতারি বলে। ইফতারে বাঙালি মুসলমানরা সাধারণত বিভিন্ন রকম ফল, ঘুগনি সিমাই লাচ্চা ইত্যাদি করে থাকে। এছাড়া থাকে বিভিন্নরকম তেলেভাজা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে ইফতার শব্দটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিনের শেষে রোজদার ব্যক্তির অপেক্ষায় থাকে ইফতারের। বিকেলে মাগরিবের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা এই ইফতার গ্রহণ করে থাকে। ইফতার শব্দের metalanguage এ তাই মাগরিবের আজান, সন্কেবেলা, সারাদিন অভুক্ত থাকার পর কাক্ষিত খাবার এইসমস্ত ধারণাই থাকে একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য যা তাদের suggestive world কে সূচিত করে।

মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব, বেশিরভাগ বাড়িতেই ইফতারের খাবারের আয়োজনে মেয়েরা নিযুক্ত থাকে। ফলে মুসলিম মেয়েদের ‘ইফতার’ শব্দের metalanguage এ ইফতার তৈরিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকার কথাও সঞ্চিত থাকে।

রোজা

ইসলামে কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ আছে। তার মধ্যে রোজা একটি। ইসলামিক ক্যালেন্ডারের রমজান মাসে রোজা রাখতে হয় প্রতিদিন। অর্থাৎ এখানে $M_{w,t}$ এর $w =$ মুসলিম সমাজ হলে রোজা শুধুমাত্র উপবাস মাত্রই নয়। শরিয়ত নির্দিষ্ট আবশ্যিক কাজের মধ্যে একটি কাজ যা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মুসলিমকে পালন করতে হয়। এক মাস রোজা শেষের পরই আসে ইসলাম ধর্মের সবথেকে বড়ো উৎসব ইদ। এই এক মাস ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সংযমের মাস। কারোর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি মনোমালিন্য এসময় রাখা যায় না। মিথ্যে কথা বলা যায় না। পাপাচার কামাচার এবং নেশাদ্রব্যের ব্যবহারে রোজা হয় না। অর্থাৎ রোজা ইসলামে শুধুমাত্র উপবাস নয়। সমস্ত লোভ এবং রিপু থেকে নিজেকে সংযত করে রাখার অভ্যাস। ‘রোজা’ শব্দের metalanguage ইসলাম নির্দেশিত এই সমস্ত ধারণা ও সংযমের অভ্যাসকে ধরে রাখে। অন্য ধর্ম সমপ্রদায়ের মানুষেরা এই আচার সম্পর্কে জানলেও তাদের নিজেদের জীবনে তা কোন গুরুত্ব বয়ে আনে না। ফলে এটা তাদের suggestive world কে নির্দেশ করে।

আর মেয়েরা ঋতু চলাকালীন রোজা রাখতে পারেনা। অনেকে পরে সেই রোজাগুলো করে দেয়। ফলে মুসলিম মেয়েদের ‘রোজা’ শব্দের metalanguage এ তাদের ঋতু চলা বা না চলার বিষয়টিও আলাদা করে যুক্ত থাকছে যা মুসলিম ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব না।

৬। ইদ

ইদ মুসলিম সমাজের বৃহত্তম আনন্দানুষ্ঠান। রমজান মাসে রোজা রাখার পর ইদ-উল-ফিতর পালিত হয়। এই ইদে ফেতরা বা গরিব দুঃখীদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিলিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। অবস্থাপন্ন মুসলিমরা দান খয়রাত করেন গরিবদের মধ্যে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই উৎসবে আনন্দ করেন। এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিভিন্নরকম রান্না ও খাওয়াদাওয়া। সকালে ইদের নামাজ পড়েন পুরুষেরা। বাড়িতে মেয়েদের ইদের নামাজ পড়ার কথা থাকলেও খুব কম জায়গায় কম পরিবারে বাঙালি মুসলিম মেয়েরা এই নামাজ পড়ে থাকে। রান্না-বান্না ও আত্মীয় স্বজনকে আপ্যায়নের দায়িত্বে বেশিরভাগ থাকেন মহিলারা। ফলে ইদে পুরুষ এবং নারী একইরকম কাজ করে না। সারা দিন নারী পুরুষের দুইভাবে কেটে যায়। বাড়ির ছোটোরা ও পুরুষেরা যেখানে সবার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দ করে কাটান ঘরের মহিলারা সেখানে ঘরের কাজ ও রান্নাতেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে ফেলেন। ফলে ইদ উভয়ের জন্যই আনন্দ বয়ে আনলেও মেয়েদের ইদ অনেক বেশি অন্তপুরের কর্মব্যস্ততায় কাটে। মেয়েদের অধিভাষাতে ইদ বলতে যা যা ধরা থাকে এবং সেখানে নিজেদেরকে যেভাবে দেখে ছেলেদের ইদের অধিভাষাতে একই জিনিস থাকেনা। কারণ এখানে দৃষ্টিকোণ আলাদা হয়ে যায়। ফলে মুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ইদ নারী পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন metalanguage বয়ে আনে এবং তা একান্তই তাদের নির্দিষ্ট suggestive world কে তুলে ধরে।

বাকরি ঈদ বা ইদ-উজ-জোহা

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, বাকরি ঈদ বা ইদ-উজ-জোহা শব্দটির অধিভাষাতে মুসলিমদের এক ধরনের ত্যাগের উৎসবের ধারণা পাওয়া যায় যাকে আমরা suggestive

world হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, যেখানে $E_o = E_m / E_m^s$ যেখানে $s = suggestive$ world.

কুরবানির সঙ্গে ইসলামিক মিথ যুক্ত হয়ে আছে যার বিশেষ তাৎপর্য ও দ্যোতনা মুসলিমদের কাছে আছে। তাই এই শব্দের বিশেষ অধিভাষা একটি তাৎপর্য বয়ে আনবে যা অন্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই ইদের সঙ্গে ত্যাগের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

এটাকে সাধারণভাবে বাঙালি মুসলমানরা কুরবানি ইদ বা বকরি ইদ বলে থাকে। এই ইদে পোষা গরু ছাগল কুরবানি দিয়ে তার মাংস গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হয়। কিন্তু কুরবানি দেওয়া মাংস কাটা এই কাজগুলো প্রথাগতভাবে ছেলেরাই করে থাকে। মেয়েরা ঘরে থেকে বিভিন্ন রান্না খাবার দাবার তৈরি করে থাকে। নামাজ পড়ার নির্দেশ উভয়ের জন্য আছে। পুরুষেরা বাইরে সবাই একত্রে পড়ে অন্যদিকে মেয়েদের ঘরে পড়ার নির্দেশ থাকলেও খুব কম জন পড়ে। ফলে এক্ষেত্রেও আমরা দেখব, সূক্ষ্ম বিচারে মেয়েদের কাছে কুরবানি ইদ এর metalanguage আর পুরুষের কাছে কুরবানি ইদের metalanguage একরকম নয়।

ইদগাহ

$M_{w,t}$ তে $w =$ মুসলিম সমাজ হলে ইদগাহ শব্দটি একটি খুবই পরিচিত শব্দ যা তাদের কাছে ইদের অনুষ্ণ বহন করে। ইদের নামাজ পুরুষেরা সাধারণত একটি বড় প্রান্তরে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে পড়ে। সেই ময়দানকে বলা হয় ইদগাহ। ইদগাহের আশেপাশে সাধারণত নানা মুখরোচক খাদ্যদ্রব্যের পসরা বসে। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা নতুন জামা কাপড় পরে সবাই মিলে একসঙ্গে ইদগাহ বেড়াতে যায়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরা সাধারণত ইদগাহ যায় না। তাই মেয়েদের কাছে ইদগাহ শব্দের অধিভাষা বা metalanguage

পুরুষদের ইদগাহ শব্দের metalanguage এর মতন নয়। আবার সব বয়সের মেয়েদের কাছেও ইদগাহ শব্দের অধিভাষা এক নয়। যারা ছোটো ছোটো মেয়ে প্রায় শিশু বা সদ্য কিশোরী তারা ইদগাহে যায় ইদের সময়। তাদের ইদগাহ সম্পর্কিত অধিভাষাও তাই বড়োদের মতন নয়। একই মেয়ের সারাটা জীবন পর্ব জুড়ে ইদগাহ শব্দের অধিভাষা তাই একরকম থাকবে না। তা পরিবর্তিত হতে থাকবে।

ইন্তেকাল

ইন্তেকাল শব্দের অর্থ মৃত্যু। $M_{w,t}$ এর w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে মৃত্যু অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে লক্ষ্য করার বিষয় অমুসলিমের মৃত্যু বোঝাতে সাধারণত ইন্তেকাল শব্দটি তারা ব্যবহার করে না। এই শব্দটি আমরা দেখব, যে সমস্ত পরিবারে ধর্মীয় রীতি নীতি আচার আচরণের অভ্যাস বেশি তাদের পরিবারের নারী পুরুষ নির্বিশেষে বেশি ব্যবহার করে। অর্থাৎ এখানে $M_{w,t}$ তে w = ধার্মিক মুসলমান পরিবার। কিন্তু সময়ের (t) সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার শুধু প্রবীণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করেছে, বিশেষ করে বৃদ্ধাদের মধ্যে।

দ্ব্যর্থক শব্দ

মুসলিম সমাজে বেশ কিছু শব্দ আছে যা দ্ব্যর্থক। সাধারণভাবে তা একটি অর্থ প্রকাশ করলেও ইসলামিক বা ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তারা ভিন্ন অর্থ বহন করে থাকে। অর্থাৎ তাদের শব্দার্থ এবং অধিভাষা তখন আলাদা হয়ে যায়।

১। আমল

আমল বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি সময়কাল বা যুগ। এই অর্থ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। অর্থাৎ $M_{w,t}$ এর এই ফ্রেমে w = বাংলা ভাষাভাষী যে কোন মানুষের

মস্তিষ্ক বা ভাষা এলাকার জন্য প্রযোজ্য। কোন নির্দিষ্ট সময়েও এই শব্দার্থ আবদ্ধ নয়। কিন্তু যখন এই শব্দটি বাঙালি মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হয় তখন এটি একটি ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের হিসেব আল্লাহ রাখেন। কেউ যদি ভালো কাজ করে আর সেটা পুণ্য হিসেবে গৃহীত হয় তবে তাকে আমল করা বলা হয়। আল্লাহ নির্দেশিত জীবন পথে চললে এই আমল লাভ হয়।

$M_{w,t}$ এর W হল মুসলিম সমাজ হলে আমল শব্দটির অধিভাষা ও শব্দার্থ পাল্টে যাবে। শব্দার্থ হয়ে যাবে আল্লাহ নির্দেশিত পুণ্য কাজ। আর এর অধিভাষায় তখন আল্লাহ বা শরিয়তে বলা যে জীবন যাপন একজন মুসলিমের জন্য নির্ধারিত সেই সমস্ত কাজ এর অনুষঙ্গ উঠে আসবে। সেখানে মুসলিম নারী পুরুষের জন্য প্রায় একইরকম কাজ থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে তা আলাদা হয়ে যাবে। যেখানে যেখানে নারী পুরুষের জন্য শরিয়ত ভিন্ন বিধান দিচ্ছে। ফলে মেয়েদের আমল এর অধিভাষাও এখানে মুসলিম পুরুষের থেকে খানিক আলাদা হয়ে পড়বে। আর এই আমল শব্দটির ব্যঞ্জনা নিতান্তই তাদের suggestive world কে সূচিত করে।

২। কবুল

‘কবুল’ শব্দের অর্থ হল স্বীকার করা বা রাজি হওয়া। বাঙালি মুসলিম সমাজে সাধারণভাবে এই অর্থেই কবুল শব্দটি যত প্রয়োগ হয় বাঙালি হিন্দু সমাজে সেই তুলনায় কম হয় অনেক। $M_{w,t}$ তে w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে এই একটি মাত্র অর্থেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। ইসলামিক বিয়েকে একটি চুক্তি বলা যায়। বিয়ের আগে পাত্র পাত্রী উভয়কেই সেই চুক্তিপত্র পড়ে শোনানো হয়। এবং উভয়ে সেই চুক্তি অনুযায়ী রাজি হয়ে ‘কবুল’ বললে বিয়ে হয়ে যায় কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে। ফলে বিয়ের এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে কবুল শব্দের metalanguage আলাদা হয়ে যায়। এই শব্দটি উভয়ে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা

বৃহত্তর জীবনের সিদ্ধান্ত বা ঘটনা ঘটে যায়। শব্দই এখানে ঘটনার ক্রিয়া হিসেবে উপস্থিত হয়। ফলে $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম বিবাহ বাসর হলে সেখানে কবুল শব্দটি আর তখন শুধুমাত্র রাজি বলতে ব্যবহৃত হচ্ছে না, শরিয়তের পদ্ধতি অনুসরণ করে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্রিয়া সম্পাদন হচ্ছে।

আর মুসলিম বর কনের ক্ষেত্রেও এই কবুল শব্দের metalanguage আলাদা হয়ে যাবে। তার কারণ নিকাহনামা বা চুক্তিপত্রের বয়ান মুসলিম নারী এবং পুরুষের জন্য পৃথক ভূমিকা ও গুরুত্ব বয়ে আনে। ফলে এক্ষেত্রে $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম কনের মস্তিষ্ক হলে তার অধিভাষা যেমন হবে, মুসলিম পুরুষের মস্তিষ্ক হলে পৃথক হয়ে যাবে। বিয়ে নারী পুরুষ উভয়ের জীবনেই পরিবর্তন আনলেও তা উভয়ের জন্য একই প্রকৃতির হবে না। এই শব্দটিও বিশেষভাবে তাই মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতে একটি নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনাময় ভুবনের (E^s বা suggestive world) দিকে দিক নির্দেশ করে।

কিতাব

কিতাব শব্দটি আরবি শব্দ। এর অর্থ বই। হিন্দি ভাষাতেও আমরা এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখব। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘কিতাব’ এই শব্দটি এমনি বই অর্থে মুসলিম পরিবারে কম ব্যবহৃত হয়। তবে এর আর একটি বিশেষ অর্থে এর ব্যবহার বহুল। মুসলিম সমাজে কিতাব শব্দের অর্থ সংকোচন ঘটিয়ে শুধু মাত্র ধর্মীয় পুস্তক যথা কোরান, আমপারা ইত্যাদি বইকে কিতাব বলার রেওয়াজ আছে। এক্ষেত্রে $M^{w,t}$ এর W = মুসলিমদের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট। নারী পুরুষের ক্ষেত্রে তার খুব বেশি রকমফের দেখা যায়না। ঋতুকালীন বা নাপাক অবস্থায় মেয়েরা এটি স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকে।

ঘর গৃহস্থালি ও মুসলিম মেয়েদের জগৎ

‘সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে’ – এই বাক্যটি আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অতি প্রচলিত এবং জনপ্রিয়। এই বাক্যটি সম্পর্কিত একটি ধারণা আমাদের সবারই কম বেশি আছে। আবার এই প্রবাদও নারী পুরুষ সম্পর্কিত আমাদের ভাবনা, সংসারে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের বোধ নির্মাণ করে। সংসার, নারী এই শব্দগুলো সম্পর্কে আমাদের অধিভাষা তৈরি করে।

এভাবে দেখলে আমরা বুঝব, অধিভাষা ও শব্দের অভিমুখ উভমুখী। উভয়ই উভয়কে খানিক নির্মাণ করে পরিবর্তন করে বা সময় বিশেষে পরিমার্জন করে থাকে। মুসলিম নারী শুধু না সার্বিকভাবেই আমাদের সমাজে নারীর সঙ্গে ঘর গৃহস্থালির নিবিড় সম্পর্কে একাধিপত্য দেখা যায়। তাদের জীবনের বেশিরভাগ সময়ই রান্নাঘর অন্দরমহলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাই ঘর গৃহস্থালিতে তাদের একদিকে যেমন আন্তরিক যত্ন থাকে অন্যদিকে এই সম্পর্কিত ভাষা শব্দের অধিভাষাও পুরুষদের তুলনায় পৃথক। কিন্তু এখানে হিন্দু ও মুসলিম নারীদের জগতে, তাদের অধিভাষায় খুব বেশি পার্থক্য আমরা পাব না। যেখানে যেখানে মুসলিম সমাজ ও ধর্ম প্রভাব ফেলছে সেখানে কিছুটা আলাদা হয়ে যাবে বটে তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সমাজে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষেই সেই অবস্থা খানিক একরকমই বলা যায়।

সংসারে যিনি প্রিয়জনদের জন্য খাবার বানান রোজ তাঁর কাছে বিভিন্ন পদ এবং বিভিন্ন জনের পছন্দের একটা সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়ে যায়। বিশেষ করে যে মেয়েরা মা তারা তাদের সন্তানদের খাবারের পছন্দ জানেন। অনেক সময়ই দেখা যায় অনেক মা তাদের সন্তানদের কথা বলতে গিয়ে তাদের পছন্দের খাবারের কথা বলেন। রান্না এবং প্রিয়জন

তাই প্রায়শই তাদের কাছে সংযুক্ত একটি বিষয়। সন্তান দূরে থাকলে তার পছন্দের খাবার খেতে বসে সন্তানদের স্মৃতি রোমন্থন করে বসেন।

আমরা খেয়াল করব, মেয়েরা অনেকে একসঙ্গে বসে বসে বাসন মাজতে মাজতে বা মশলা বাটতে বাটতে বা রান্না চাপিয়ে অনেকে একসঙ্গে থাকলে গল্পগাছা করতে শুরু করে। সেই গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিভিন্ন বিষয়। কখনো সেখানে থাকে রান্নার বিষয়, ঘরের বিভিন্ন কাজকর্মের বিষয় কখনো বা সংসারের অন্যান্য সদস্যদের বিষয়ে কথা আবার বা বিভিন্নরকম সামাজিক মুখরোচক কেচ্ছামূলক গালগল্পও। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের এখনো তুলনামূলকভাবে সংযোগ কম থাকায় তাদের গল্পের গণ্ডি আবদ্ধ থাকে সাধারণত, ব্যক্তিগত জীবন ও তাদের পরিচিত বৃত্তের মধ্যে।

খাদ্য ও খাদ্য-দ্রব্য অনুষঙ্গে মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগৎ

মুসলিম সমাজে বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তৈরি হয়। এছাড়া বেশ কিছু জিনিসও এই অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয় যা মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির অঙ্গ। এগুলি সম্পর্কে ইসলামে কোনও কঠোর নিয়ম বা নির্দেশ নেই কিন্তু মুসলিম পরিবারগুলিতে এর ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এগুলো অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ব্যবহার করে না। ঘর-গৃহস্থালি হেঁসেলের যাবতীয় কাজকর্ম যেহেতু বেশিরভাগ পরিবারে মেয়েরা করে থাকে তাই খাদ্য ও তার অনুষঙ্গের বিভিন্ন বিষয় তাদের চিন্তা ভাবনায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে থাকে।

বিশেষ বিশেষ কিছু রান্না

- বিফ বা গোস্ত বা গরুর মাংসের বিভিন্ন পদ

পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষা ভাষী মানুষের মধ্যে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের লোকই সংখ্যা গরিষ্ঠ। কিন্তু $M^{w,t}$ এর w যদি হিন্দু সমাজ হয় এবং সময়(t) যদি বর্তমান কাল হয় (প্রাচীন কালে হিন্দুরা গো মাংস ভক্ষণ করতো, অতিথির জন্য খুবই উপাদেয় ভালো পদ হিসেবেও গ্রহণীয়

ছিল) তবে গরুর মাংস খাবার হিসেবে নিষিদ্ধ পরিগণিত হবে। গরুর মাংস এই শব্দবন্ধের অধিভাষাতে ধর্মবিরুদ্ধ নিষেধ এই সমস্ত বিষয় চলে আসবে। কিন্তু একই শব্দের অধিভাষা একদম পৃথক হয়ে যাবে যদি w এখানে মুসলিম সমাজ হয়ে যায়। অর্থাৎ একই শব্দ সম্পূর্ণ বিপরীত অনুষ্ণ নিয়ে আসবে দুটি আলাদা বিশ্ব তথা আলাদা ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য।

- পায়চা

গোরু বা ছাগলের পা দীর্ঘক্ষণ সেদ্ধ করে একধরনের স্বাস্থ্যকর উপাদেয় সুস্বাদু খাবার করা হয় যাকে পায়চা বলে। মুসলিম সমাজে তা খুবই আদৃত একটি বিষয়। $M^{w,t}$ এর w এখানে মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটি মুসলিম সমাজের রান্না খাবার দাবার তথা সংস্কৃতির একটি দিককে তুলে ধরবে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের কাছে এই শব্দটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অজানা বা নিষিদ্ধ বা তাৎপর্যহীন। ফলে একই শব্দের metalanguage স্থান বিশ্ব আলাদা হওয়াতে তার অর্থ অধিভাষা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ছে।

- সিমাই, লাচ্চা

সিমাই লাচ্চা মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খুবই জনপ্রিয় খাবার। ঈদ, মহরম, শবেবারাত ইত্যাদি প্রায় সমস্ত উৎসবেই বাঙালি মুসলিম পরিবারে এগুলো তৈরি করা হয়। ফলে এই শব্দ বা এই খাবারগুলির অধিভাষা তে $M^{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে তার metalanguage আমরা দেখব উৎসবের অনুষ্ণ বয়ে আনছে। কিন্তু w পরিবর্তিত হয়ে গেলে অধিভাষা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

- বিরিয়ানি

বিরিয়ানিকে মুসলিম সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এটি অনেকাংশে সঠিকও। বিরিয়ানি মুঘলদের হাত ধরেই ভারতবর্ষে এসেছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলিম যেহেতু বেশিরভাগই ধর্মান্তরিত মুসলিম তাদের ঐতিহ্যের মধ্যে বিরিয়ানি রান্নার সুকৌশল জানা ছিল

না। হাতে গোনা কয়েকটি অভিজাত বাঙালি মুসলিম পরিবার ছাড়া বিরিয়ানি বহু আগে থেকে রান্না করা হয় না উৎসবে পার্বণে। তবে ইদানীং অনেক মুসলিম পরিবারেই বিরিয়ানি রান্না হয় তবে তা পারিবারিক ঐতিহ্য মারফত পাওয়া নয়। নেহাতই টিভি ইন্টারনেট এর মাধ্যমে জানা রেসিপি থেকে। বিরিয়ানির উপর তাদের সাংস্কৃতিক সূত্রে যে অধিকার পাওয়া হয়নি তাকেই ফিরিয়ে আনার এক ধরনের চেষ্টাও দেখা যায়। অর্থাৎ $M_{w,t}$ এর W বাঙালি মুসলিম সমাজ এবং T বর্তমান সময় থেকে ৫০ -১০০ বছর পিছিয়ে গেলে দেখব ধর্মান্তরিত গরিব মুসলিমরা বিরিয়ানি রাঁধতে জানতো না। কিন্তু t যদি বর্তমান সময় হয় তাহলে দেখব, অনেক মুসলিম সমাজেই ইদের দিন বা এমনি সময়ে বিরিয়ানি রান্না করা হচ্ছে।

একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারে অবশ্য বিরিয়ানি রান্নার চল খুব বেশি এখনো নেই। ফলে অবাঙালি মুসলিম সমাজে বিরিয়ানির যে স্থান তা বাঙালি মুসলিম সমাজে নেই।

- চিলিপচি / চিলমচি

মুসলিম সমাজে হাত ধোয়ার জন্য মেহমানকে বা নিজেদের প্রয়োজনেও একটি বিশেষ পাত্র ব্যবহৃত হয় যা সাধারণত, কাঁসার তৈরি হয়। বাঙালি হিন্দু সমাজে এর ব্যবহার আমরা দেখিনা। $M^{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে ‘চিলিপচি’ শব্দের অর্থ সহজেই বোঝা যাবে। এক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখব, অনেক বাড়িতেই চিলিপচির ব্যবহার কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। গ্রামেও দেখব, বেসিন লাগানোর ফলে অনেকেই আর চিলিপচি ব্যবহার করেন না। ফলে t পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিলিপচির ব্যবহার কমছে আমরা দেখব। এই শব্দের অধিভাষাতে আমরা মুসলিম সমাজের অনুষ্ঙ্গ বয়ে আনে।

দস্তরখান

এটি একটি ফার্সি শব্দ। বাংলা শব্দভাণ্ডারেও যা গৃহীত হয়েছে। দস্তরখান হল একটি লম্বা বস্ত্রখণ্ড বিশেষ যা খাওয়ার আগে বিছিয়ে দেওয়া হয়। সারি সারি মানুষজন খেতে বসে যখন

তখন সবার থালার নিচে ঐ লম্বা দস্তুরখান বিছানো থাকে। এটিও মুসলিম পরিবারেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে ‘দস্তুরখান’ এই শব্দটি তাদের খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি বস্ত্রখণ্ডের ছবি হয়ে ধরা দেবে তাদের metalanguage এ। কিন্তু যেহেতু অন্যধর্মের মানুষের কাছে এর ব্যবহার নেই তাদের কাছে একই শব্দ একই ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে না।

হালাল

‘হালাল’ শব্দের অর্থ ইসলাম অনুযায়ী যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বৈধ। এছাড়া কিছু খাবার কীভাবে খেতে হবে সে সম্পর্কেও বিধি নিষেধ আছে। সেইরকম ভাবে না খেলে তাও হালালের তালিকায় থাকবে না। ইসলামে রক্ত অ্যালকোহল গুকের মাংস হারাম করা হয়েছে। এছাড়া মাংসাশী পশুর মাংসও হারাম। ব্যাঙ, সাপ এর মাংসও হারাম।

যেসব পশুর মাংস হালাল তাদেরকে আল্লাহর নামে এবং একজন বিশ্বাসী মুসলমান জবাই করলে তবেই তা হালাল। জবাই করার নিয়ম আছে। মৃত্যুর আগে তার রক্ত নির্গত হতে হবে। ইসলামে খাদ্যদ্রব্য কে হারাম ও হালাল এই বাইনারিতে রাখা হয়েছে।

$M_{w,t}$ এর এই ফ্রেমে তাই w = মুসলিম সমাজ হলে ‘হালাল’ শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। তা ইসলাম নির্দেশিত বৈধ খাবারের তালিকা তাদের কাছে। এর বাইরে খাবার তাদের জন্য নিষিদ্ধ। হালাল খাবারের বিপরীতেই থাকে হারাম খাবারের ধারণা। ফলে মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই হারাম ও হালাল শব্দের metalanguage এ এই দুই ধারনাই পাশাপাশি থাকে। আর একটা ছাড়া আর একটার অস্তিত্ব নেই। বাঙালি সমাজে আমরা দেখব, হিন্দু ও মুসলিমদের জন্য পৃথক খাদ্য তালিকা আছে (তাতে খুব বড়োসড়ো পার্থক্য

না থাকলেও) যা তাদের ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে। খাদ্য সংস্কৃতির এই প্রভাব তাদের ভাষা এবং অধিভাষার মধ্যেও পড়ে।

ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু অলংকার

কখনো কখনো একটি সমাজে, জাতিতে বা ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশেষ রুচি তৈরি হয়। যা সেই সমাজের সবাই ব্যবহার করে বা গ্রহণ করে থাকে। যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি বাঙালি বিয়েতে কনের লাল বেনারসির ব্যবহার বা খাবারের ক্ষেত্রে লুচি জলখাবার হিসেবে খুবই পরিচিত।

বাঙালি মুসলিম সমাজেও বিশেষ কিছু এমন দিক পাব, যার ব্যবহার যার কদর তাদের মধ্যে অনেক বেশি।

আতর

আতর মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত সুগন্ধি। অন্যান্য সুগন্ধির থেকে এর কদর অনেক বেশি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে শৌখিন লোকজনের মধ্যে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। গ্রামের গরিব লোকজন ও কম দামি আতর কিনে ইদে পার্বণে ব্যবহার করতে থাকে।

আতর যদিও সবাইই ব্যবহার করতে পারে কিন্তু মুসলিম সমাজের সাজ-সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক হল আতর। ফলে $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে আতরকে সেই সমাজের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়। তবে সস্তা আতরের গন্ধ উগ্র বলে শহুরে শিক্ষিত ভদ্র মুসলিম সমাজ এই আতর ব্যবহার করতে চায় না তত আর। আর সত্যিকারের দামি আতর কেনার সামর্থ্য তাদের বেশিরভাগেরই নেই। নারী পুরুষ উভয়েই আতর ব্যবহার করে থাকে।

সুর্মা

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে সুর্মা ইসলামিক সংস্কৃতিতে একটি সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত। শুধু তাই নয় সুর্মা পরা ভালো বলে মনে করা হয়। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে গ্রামের দিকে সুর্মা পরে থাকে। তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছেলেদের মধ্যে সুর্মা পরার চল নেই। তবে ধার্মিক অনেক পুরুষেরা এই সুর্মা ব্যবহার করতে ভালোবাসে হজরত মহম্মদ ও সাহাবারা পরতেন বলে। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বয়স্কাদেরকে সুর্মা পরতে বেশি দেখা যায়। নবীন প্রজন্মের মেয়েদের কাছে প্রসাধনের বিশেষ করে সুর্মার অন্য অনেক বিকল্প হাতের কাছে থাকায় এবং ফ্যাশন ট্রেন্ডের মধ্যে সুর্মা পড়ে না বলে তারা অনেক সময় সুর্মা ব্যবহার করে না। অর্থাৎ t বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুর্মা শব্দটির অধিভাষা আর পুরোপুরি এক থাকছেন। তার গ্রহণযোগ্যতা মেয়েদের মধ্যে কমে যাওয়ার ফলে।

তাবিজ

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘তাবিজ’ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী। তাবিজ যদিও সাজগোজের অঙ্গ নয় তবে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে, অকারণ ভয় থেকে মুক্তি পেতে বা বিভিন্ন অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ভয় বা ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে মুসলিম পুরুষ নারী উভয়ে দোয়া পড়া বিশেষ তাবিজ পরে থাকে।

আমরা খেয়াল করব, বিভিন্ন চলচিত্রে বা মেগা ধারাবাহিকগুলিতে মুসলিম চরিত্র বোঝাতে অনেকসময় তাদের গলায় তাবিজ পরিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ অন্য ধর্মাবলম্বীদের চোখে ‘মুসলিম’ পরিচিতির সঙ্গে তাবিজের একটি ওতোপ্রতো সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেছে যা সাধারণত আমরা বাস্তবে দেখব না।

সবুজ রঙ

মুসলিম বাড়িতে, মসজিদে অনেকেই সবুজ রঙ ব্যবহার করে থাকেন।

সূরা আর রহমান এর ৭৬ নং আয়াতে আছে জান্নাতের সুন্দর নরম সবুজ গদির কথা।^{১৯} আবার সূরা দাহর এর ২১ নং আয়াতে জান্নাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে^{২০} –পাতলা সুন্দর সবুজ পোশাকের কথার বর্ণনা আছে।

অর্থাৎ, কোরানে সুন্দর রঙ এর বর্ণনা করতে গিয়ে সবুজকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আমরা দেখব, ইসলামিক দেশগুলির জাতীয় পতাকায় অনেকেরই সবুজ রঙ স্থান পাচ্ছে।

ফলে ইসলামিক দুনিয়ার সঙ্গে সবুজ রঙের সংযোগ একপ্রকার রয়েইছে। বাঙালি মুসলিমদের মধ্যেও একপ্রকার সবুজ রঙ এর প্রতি বিশেষ পছন্দ মাঝে মাঝে খেয়াল করার মতো। ধর্মীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত কোন কাজে তারা অনেক সময়ই সবুজ রঙ গ্রহণ করে থাকে। $M_{w,t}$ এর ফ্রেমে w = মুসলিম সমাজ হলে সেখানে অন্যান্য রঙের মাঝে সবুজ রঙ একটি বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। মুসলিম মেয়েদের রঙ সম্পর্কিত অধিভাষাতেও অসচেতনভাবে অবচেতনে এই সবুজ রঙের আলাদা গুরুত্ব আছে।

তবে অনেক বাঙালি মুসলিম আছেন যারা ধর্মকে শুধুই জীবনের বাইরের প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখেন, নিয়ম আচারের মধ্যে অতটা থাকেন না। তাদের জীবন শৈলীর মধ্যে আলাদা করে এই রঙের গুরুত্ব না থাকলেও সবুজ রঙ ইসলামের এক ধরনের সংযোগ প্রিয়তা সম্পর্কে কম বেশি সবাই ওয়াকিবহাল।

নাক ফুল

বিবাহিত মুসলিম মেয়েদের সঙ্গে নাকফুল এর সম্পর্ক শরিয়ত বা কোরানে কোথাও বলা নেই। এমনকি বেশিরভাগ ইসলামিক দেশগুলিতে মেয়েদের নাকফুল পরতেও দেখা যায় না। কিন্তু $M_{w,t}$ এর w = ভারতীয় উপমহাদেশ হলে, নাক ফুল বা নাকের গহনাকে বিবাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ভাবা হয়। অর্থাৎ বিবাহিত মুসলিম মহিলাদের আবশ্যিকভাবে নাকে কিছু পরতে হয়। এবং অনেক জায়গাতেই সেকারণে অবিবাহিতা মেয়েরা নাকে কিছু পরে

থাকে না। নাকের গহনা তাই মুসলিম মেয়েদের জন্য শুধুমাত্র কোন গহনা মাত্র নয়। এটি তার বিবাহিত হওয়ারও চিহ্ন। যা অন্য ধর্মের মেয়েদের জন্য বা পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী বিবাহিত কি না তা প্রকাশ্যে জানানোর প্রয়োজন হয় কিন্তু পুরুষের হয় না। হিন্দু বাঙালি বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাদেরকে সধবা ও বিধবার চিহ্ন দেহে ধারণ করার রীতি আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের চিহ্নগুলি আলাদা।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে (t পরিবর্তিত হলে) অনেক মেয়েরা এখন আর নাকের দুলকে বিয়ের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত করতে চায় না। ফলে তাদের অধিভাষাতে নাকের গহনা সম্পর্কে আলাদা কোন ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে না। তবে প্রাচীনরা এ বিষয়ে অনেক বেশি সজাগ।

হাতে চুড়ি

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম নারীর অন্তর্ভুক্ত হলে হাতে চুড়ি না পরাকে অনেক সময় বিধবাদের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। তবে, এই প্রবণতা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বেশি।

তবে সাধারণভাবে, বিবাহিত মুসলিমদের মধ্যে গলার হার নাকের হাতের চুড়ি পরে থাকাটা সাধারণ অবস্থা মনে করা হয়। অবিবাহিতা মেয়েরা সারাক্ষণ এসব পরে থাকে না। তবে এটি শুধু মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয়, হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হিন্দু আচার থেকেই এই রীতিটির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অনুমেয়। যুক্তি হিসেবে বলা যেতে পারে, এই রীতির ব্যবহার আমরা শুধু কিছু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

ইসলামের সময়ের ধারণা নামাজের সঙ্গে যুক্ত

ইসলামে দিনের পাঁচটি সময়ে নামাজ পরা প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের জন্য আবশ্যিক বা ফরজ বলে মনে করা হয়। বাঙালি মুসলিম নারীরা বিশেষ করে প্রবীণাদের মধ্যে যারা নামাজ পড়েন তাদের সময়ের ধারণার মধ্যে নামাজের এই পাঁচ ওয়াক্তের ধারণা মিশে আছে দেখতে পাব। দিনে ৫ বারের প্রথম নামাজ শুরু হয় ভোরবেলা। একে বলে ফজরের নামাজ। এরপর দুপুরে জোহরের নামাজ। বিকেলের সময় হয় আসরের নামাজ। আর গোধূলির সময় সন্ধ্যাবেলা হয় মাগরিবের নামাজ। আর শেষে রাত ১২ টার মধ্যে পড়া যায় এশারের নামাজ। আমরা দেখব, যারা প্রতিদিন নামাজ পড়েন তাদের সময়ের ধরনার মধ্যে এই নামাজগুলি যুক্ত হয়ে আছে। যেমন –

১। ঠিক মাগরিবের সময়টায় একজন দেখি দাড়িয়ানা লোক এসে হাজির।

২। ঠিক জোহর বাদ বেরোব তখন দোকানপাট একটু ফাঁকা থাকে।

৩। ফজরের সময় ফোন এলে কিরকম ভয় লাগে

৪। তখন ভোর হয়েগেছে, ফজরের আজান শুনতে পেয়েছি আমি।

ইত্যাদি কথোপকথনে আমরা দেখব, সময় সম্পর্কে অধিভাষাতে নামাজের ওয়াক্ত বা সময় মিশে আছে।

$M_{w,t}$ এর এই কাঠামোতে যদি $W =$ মুসলিম সমাজ হয়, তবে ‘সময়’ সম্পর্কিত metalanguage এ নামাজের ওয়াক্ত এর ধারণা মিশে আছে। এক্ষেত্রে নামাজ পড়া নারী পুরুষের মধ্যে এই মাপকাঠি বেশি কাজ করলেও যেসব বাড়িতে নামাজ অনেকে পড়েন তাদের বাড়ির সদস্যদের মধ্যেও এই ধারণা কাজ করে। তবে যেসব বাড়িতে এই নামাজ পড়ার চল নেই তাদের মধ্যে সময় সম্পর্কিত অধিভাষাতে নামাজের সময়ের ধারণা যুক্ত থাকতে দেখব না।

পোরেশান

বিরক্ত, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত বা চিন্তিত। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, পোরেশান শব্দটি আমরা বেশ কিছু বাঙালি মুসলিমদেরকে ব্যবহার করতে দেখব। সাধারণত অন্য ধর্মের বাঙালি লোকজন এই শব্দটি তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে ওতোটা ব্যবহার করে না।

আংঙ্গস্থান (অংগুস্থান)

কাঁথা বা কিছু সেলাই করার সময় আঙ্গুলে একটি কাপড়ের তৈরি পুরু ঢাকনা পরা হয়। তাকে বলে আংস্থান যা ফারসি অংগুস্থান শব্দটি থেকে এসেছে। মুসলিম মেয়েরা সেলাইয়ের কাজ করার সময় এটি বহুল পরিমাণে পরে থাকে। যেহেতু মেয়েরাই সেলাইয়ের কাজ মূলত করে থাকে তাই মুসলিম মেয়েরাই আংস্থান কথাটি বেশি বলে থাকে। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের জগত হলে, আংঙ্গস্থান তাদের অনেকেরই খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। মুর্শিদাবাদ, মালদা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বহু মেয়ে কাঁথা সেলাই এর কাজে পারদর্শী। অনেকে এই কাজটি নিত্যদিন অবসর সময়ে করে থাকে। অনেকের কাছে সেলাইয়ের কাজ জীবিকাও। ফলে আংস্থান যা শুধুমাত্র মুসলিম মেয়েরাই বলে থাকে, শব্দটির metalanguage এ তাদের অবসর যাপন, জীবিকা বা শখ এর কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের ধারণা যুক্ত হয়ে থাকে। এই শব্দটি আমরা হিন্দু সমাজে ব্যবহৃত হতে দেখিনা। এর ব্যবহার তাদের নিজস্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

অছিয়ত/ অসিয়ত

এটি একটি আরবি শব্দ। এর পারিভাষিক অর্থ হল কল্যাণ কামনা করা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, অসিয়ত শব্দটির সঙ্গে বাঙালি মুসলিম সমাজ খুবই পরিচিত। কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে তার সম্পত্তির কিছু অংশ কাউকে দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে যান

তবে তাকে অসিয়ত করা বলা হয়ে থাকে। সাধারণত সম্পত্তির যারা ওয়ারিশ থাকে তাদের বাদ দিয়েই অন্য কারোর জন্য অসিয়ত করা হয়। ইসলামে এই নিয়ম আছে। অর্থাৎ ‘অসিয়ত’ শব্দের পরিভাষাতে মুসলিমদের এই বিশেষ বিষয়টি উঠে আসবে। গরিব দুখীদের জন্য অসিয়ত করা ইসলামে পুণ্যেরও। কিন্তু অমুসলিমদের জন্য অসিয়ত শব্দটি যেমন অব্যবহৃত একটি শব্দ অন্যদিকে এই শব্দটির বিশেষ কোনো তাৎপর্যও নেই তাদের কাছে।

আওকাত

অবস্থা, পদমর্যাদা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, আওকাত শব্দটি ব্যবহৃত শব্দ। তবে এই আরবি শব্দটির ব্যবহারও আমরা দেখব, মুসলিম সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষ করে মৌখিক ভাষাতে হিন্দুরাও কদাচিৎ এটি ব্যবহার করে থাকে। তবে মুসলিমদের মধ্যে এর ব্যবহার অনেক বেশি।

আওরাত

এটি একটি আরবি শব্দ। নারীদেরকে অনেক সময় আওরাত বলে ডাকা হয়। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে আওরাত অনেক সময়ই মেয়েদেরকে বলা হয়ে থাকে। আওরাত শব্দটি যদিও হিন্দি ভাষার প্রসারের কারণে বাঙালিদের মধ্যে অজানা কোনো শব্দ নয়, কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে হিন্দুরা এই শব্দটি মেয়েদেরকে বোঝাতে খুব একটা ব্যবহার করে না। কিন্তু মুসলিম সমাজে এর ব্যবহার আছে। ফলে আওরাত শব্দের অধিভাষা এক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য আলাদা হয়ে যায়।

আখেরাত

(আরবি আখিরি) - এই শব্দটির অর্থ অন্তিম বা শেষ। আখের শব্দটি শেষ বলতে ব্যবহৃত হলেও আখেরাত বলতে পৃথিবী ধ্বংসের পর আল্লাহর বিচারকে আখেরত বলা হয়ে থাকে

মুসলিম সমাজে। অর্থাৎ $M_{w,t}$ এ w = মুসলিম সমাজ হলে মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিককে প্রতিফলিত করে ‘আখেরাত’ শব্দটি। এর সঙ্গে জড়িত থাকে পাপ পুণ্যের বিচারে জান্নাত বা দোজখের ধারণাটিও। ‘আখেরাত’ শব্দের metalanguage এ ধরা থাকে এই সমস্ত ধারণা।

আজনাবি (বিদেশি)

এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, সবার মধ্যে না হলেও এই শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখব। এর অর্থ হল অপরিচিত। মুসলিম মেয়েদের কাছে ‘আজনাবি’ শব্দের অধিভাষা পর-পুরুষের সমার্থক। অর্থাৎ তাদের সমক্ষে তাদের হিজাব পরার নির্দেশ আছে। এছাড়া আজনাবি যদি মহিলা হয় তাহলে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আজনাবি বলা হয় না। পুরুষদেরকেও অপরিচিত মেয়েদের থেকে নজর নিচে করার বিধান আছে।

আজনাবি কথাটি হিন্দি সিনেমা সিরিয়াল মারফত সমস্ত বাঙালিদের কাছেই প্রচলিত শব্দ। তবে অন্যদের ‘আজনাবি’ শব্দের অধিভাষা মুসলিম বা মুসলিম মেয়েদের থেকে পৃথক।

আকসার

আকছারও বলা হয়ে থাকে। এই শব্দটির অর্থ প্রায়ই। এই শব্দটি আমরা দেখব বাঙালি হিন্দু মুসলিম উভয়েই জানে। উভয়েই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু খেয়াল করলে দেখব, বাঙালি মুসলিম এই শব্দটি অনেক বেশি পরিমাণে ব্যবহার করে থাকে হিন্দু বাঙালির তুলনায়। হিন্দু বাঙালি এর পরিবর্তে এর প্রতিশব্দ যেমন প্রায়ই বা অনেকসময় ইত্যাদি শব্দগুলো বেশি ব্যবহার করে থাকে। মুসলিম বাঙালিরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে কথোপকথনের সময় আকসার/ আকছার(উত্তর ২৪ পরগণায়) এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করে থাকে। নারী পুরুষ উভয়েই এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তবে বয়স্করা তুলনামূলক বেশি ব্যবহার

করে শব্দটি। অর্থাৎ $M_{w,t}$ এর w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, t অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দটির ব্যবহার সংকুচিত হয়ে আসছে।

ইনসান

এর অর্থ মানুষ। এটি আরবি শব্দ। আমরা খেয়াল করব, ইসলামে বর্ণিত মানুষ ছাড়াও ফেরস্তা জ্বিন প্রভৃতি জীবের কথা বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে মানুষ বোঝাতে যত না ইনসান শব্দটি মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকে তার থেকে অনেক বেশি আল্লাহ সৃষ্ট জ্বিন ফেরেশতার সঙ্গে একযোগে মানুষ বোঝাতে ইনসান শব্দটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমরা বেশি ব্যবহার করে থাকে। $M_{w,t}$ এর w = ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা হলে (যা ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস) সেখানে ‘ইনসান’ শব্দটি আল্লাহর অন্য সৃষ্ট জীব এর মধ্যে একটি মানুষ অর্থে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ ‘ইনসান’ এই শব্দটির metalanguage এ ‘মানুষ’ এই আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে ইসলামিক গল্পের অনুষঙ্গ ঢুকে পড়ছে।

ইরাদা

আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায়। এই শব্দটিও হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। মুসলিম সমাজে এই শব্দটির ব্যবহার কম হলেও আছে। বিশেষ করে ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার আছে। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ t = বর্তমান সময়।

কিন্তু w = হিন্দু সমাজ হলে এই শব্দটার প্রচলন নেই।

উম্মত

‘উম্মত’ শব্দের অর্থ শিষ্য। কিন্তু এই শব্দটি সর্বক্ষেত্রে শিষ্য বোঝাতে মুসলিমরা ব্যবহার করে না। $M_{w,t}$ এর এই ক্ষেত্রে w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে উম্মত ব্যবহৃত হয় হজরত মহম্মদের অনুগামীদের বা শিষ্যদেরকে বোঝাতে। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বলা হলেও যে

সময়ের কথা বলা হয় সেই সময়টা হজরত মহম্মদের সমকালীন। ফলে ‘উম্মত’ শব্দের metalanguage এ হজরত মহম্মদের সময়কালে তার উম্মতদের সম্পর্কে যে ধারণা তা প্রতিফলিত হয় এই শব্দ ব্যবহারকারীর মস্তিষ্কে। বলা বাহুল্য এই শব্দটির ব্যবহার হিন্দুদের মধ্যে নেই। এছাড়া উম্মত বলতে সাধারণত পুরুষদেরকেই বোঝানো হয়ে তাহকে। হজরত মহম্মদের অনুগামী নারী পুরুষ উভয়ে হলেও উম্মত শুধুমাত্র পুরুষরাই ছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতে উম্মত শব্দের প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রতিচ্ছবি পাব তার মধ্যে এক ধরনের লিঙ্গগত দূরত্ব থেকে যাবে যা মুসলিম পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

উরস

সুফি সাধকদের মৃত্তবার্ষিকী পালনকে উরস বলা হয়। সাধারণত দরগা মাজারে উরস পালন করা হয়। ধর্মীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় এই দিন এবং রান্না করে গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই উৎসব একান্তভাবেই মুসলিমদের। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে এর একটি আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অর্থ আছে কিন্তু w = হিন্দু সমাজ হলে উরস শব্দের অধিভাষা বা metalanguage মুসলিম মেয়েদের মধ্যে যে ধারণা আনে তা কখনই হিন্দু সমাজে আসেনা। যদিও মাজারে বা দরগায় ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে যায়। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সেখানে মানত করতে যায়। কিন্তু ছেলে মেয়ের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির বিষয় ধারণা যেহেতু আলাদা তাই মানতের বিষয়ও আলাদা হয়। উরসের সময়ও অনেকে প্রার্থনা করে। ফলে উরসের অধিভাষাতে ছেলে মেয়েদের ধারণা পালটে যায়।

এতিম

‘এতিম’ শব্দের অর্থ অনাথ। আরবি ‘ইয়াতিম’ শব্দ থেকে এই শব্দটি এসছে। পিতা মাতা হীন সন্তানকে সাধারণত, এতিম বলা হয়ে থাকে। তবে মাতাহীন সন্তানের পিতা বেঁচে

থাকলে তাকে মুসলিম সমাজে সাধারণত এতিম বলা হয় না। কারণ সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইসলাম বাবার প্রতি অর্পণ করেছে।

ইসলামে এতিমদের প্রতি ভালো সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ আছে। সূরা নিসার ১০ নং আয়াতে আছে^{২১} –

এছাড়া সূরা দাহরের ৮-৯ আয়াতে বলা হয়েছে এতিমদের নিস্বার্থভাবে ভালোবাসার জন্য।^{২২} এছাড়াও সূরা ফজর ও দুহাতেও এতিমদের প্রতি সদয় এবং অন্যায় না করার কথা বলা হচ্ছে। মুসলিম সমাজে অনেক এতিমখানার কথা আমাদের মনে পড়বে যেখানে ধর্মের অনুশাসন মেনে ও পুণ্যের জন্য সমৃদ্ধশালী ধনবান মুসলিমরা দান করে থাকেন এতিমদের ভরণপোষণের জন্য। অর্থাৎ, $M^{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে সেখানে অনাথ অর্থে ‘এতিম’ শব্দের আলাদা এক গুরুত্ব আছে। এতিমদের সম্পর্কে কোরানে বেশ কিছু নির্দেশ আছে। ফলে মুসলিম বাঙালিদের এই শব্দের metalanguage এ তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়ার ধর্মীয় নির্দেশও সঞ্চিত থাকে যা অন্য ধর্মের মানুষদের এই শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে নাও থাকতে পারে। এছাড়া ‘এতিম’ শব্দটির ব্যবহার আমরা অন্য ধর্মের বাঙালিদের ব্যবহার করতে দেখি না। সেখানে অনেক বেশি ‘অনাথ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ইলাজ

এর অর্থ চিকিৎসা। ইলাজ শব্দটাও আমরা দেখব যে $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ t = বর্তমান সময় হলে শব্দটা প্রবীণদের মধ্যে ব্যবহৃত হলেও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এর ব্যবহার। ফলে w = কমবয়সী মুসলিম মেয়েদের জগৎ হলে এই শব্দটার অর্থ তারা জানলেও তারা এই শব্দটি ব্যবহার করে না।

কলেমা

ইসলামে আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস ভরসা দাবি করা হয়। তাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য বা মাবুদে বিশ্বাস থাকলে তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করা হবে না। ইসলামে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস যাকে ঈমান বলা হয়ে থাকে তার ভিত্তি স্বরূপ ছটি কলেমা আছে। যেগুলোতে একজন মুসলমানকে কোনরকম সন্দেহ ছাড়া বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। বাঙালি মুসলিমরা ধর্মীয় শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে এই কলেমা পড়া শেখে ও উচ্চারণ করে। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি, $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে ‘কলেমা’ শব্দটির গুরুত্ব অপরিসীম। বেশিরভাগ মুসলিমকেই আমরা দেখব ছয়টা কলেমার প্রতিটি মুখস্থ না থাকলেও প্রথম কলেমা প্রায় অনেকেরই মুখস্থ। কলেমাগুলি যদিও আরবিতে থাকে। তবু বিশ্বাসী মুসলমান কলেমা খুবই নিষ্ঠাভরে উচ্চারণ করে থাকে। এই কলেমাগুলি প্রায় ধর্মীয় মন্ত্রের মতো। ফলে ‘কলেমা’ শব্দের metalanguage এ একজন বিশ্বাসী মুসলিমের যে নিষ্ঠা বিশ্বাস শ্রদ্ধা থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

কাজিয়া

ঝগড়া। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে ঝগড়া শব্দটার প্রতিশব্দ হিসেবে কাজিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হিন্দু সমাজে কাজিয়া শব্দটি খুব একটা ব্যবহৃত হতে দেখি না। কাজিয়া শব্দের অধিভাষাতে সাধারণত আমরা দেখি মেয়েদের ঝগড়াকে বেশিরভাগ সময় কাজিয়া বলা হয়।

কাফন

এটি একটি আরবি শব্দ। কোন মুসলিম মারা গেলে মৃতদেহের উপর সাদা রঙের কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয় একে বলা হয় কাফন। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ আর t = বর্তমান

সময় হলে কাফন শব্দের অধিভাষাতে একটি মৃতদেহের উপর সাদা কাপড়ের ছবি উঠে আসে। কিন্তু হিন্দু সমাজে কাফন শব্দের সঙ্গে মৃতদেহের ছবি ভেসে ওঠে না। তাদের কাছে এই শব্দটা মুসলিম সমাজের সৎকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

কাবিননামা

ফারসি কাবিন – বিবাহের চুক্তিপত্র। নিকাহনামার সঙ্গে সমার্থক।

কারি

কোরান পাঠ ব্যাকরণসম্মত ভাবে। কারি পাঠ সাধারণত হাফেজ সাহেবরা করে থাকেন। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে কারি শব্দটার অধিভাষা বা metalanguage এ বিশুদ্ধ কোরান পাঠের ধারণা আর তার সঙ্গে বিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার ধারণা যুক্ত থাকে। হিন্দু সমাজে কারি শব্দের অর্থ বেশিরভাগেরই অজানা।

কিসমত

আরবি শব্দ ‘কিসমত’ শব্দের অর্থ হল ভাগ্য। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে কিসমত শব্দের ব্যবহার বেশি। তবে এই শব্দটার ব্যবহারও আমরা দেখব প্রবীণাদের মধ্যে বেশি। কিছু বিশেষ শব্দের ব্যবহার কমে যাচ্ছে একটা প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে। মুসলিম সমাজের যে কিছু বিশেষ শব্দগুলো বলার প্রচলন কমে যাচ্ছে তার মধ্যে এটিও একটি। আর হিন্দুসমাজে কিসমত শব্দটার অর্থ সবার জানা হিন্দি সমাজের দৌলতে। কিন্তু তাদের কথ্য ভাষায় এর প্রচলন নেই।

কুফরি

এই শব্দটির অর্থ হল আল্লায় অবিশ্বাস। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে কুফরি শব্দটির অধিভাষাতে একটি পাপের ধারণা সংযুক্ত। আল্লায় অবিশ্বাস ইসলামের চোখে অমার্জনীয়

অপরাধ। কুফরি করা তাই মহা অন্যায়। কিন্তু $w =$ হিন্দু সমাজ হলে ‘কুফরি’ শব্দটির এরকম কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। তাদের উপাস্য দেবতা আল্লাহ নয় ফলে এই শব্দটি তাদের কাছে প্রাসঙ্গিক নয়।

খতম

এর অর্থ হল শেষ। কোরান পড়া শেষ হয়ে গেলে তাকে কোরান খতম বলে। শেষ সাধারণত বলে না। $M_{w,t}$ তে যদি $w =$ মুসলিম সমাজের নির্দিষ্ট ধর্মীয় পরিমন্ডল হয় তবে খতম শব্দটি শুধুমাত্র শেষ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে কোরান পুরোটা পড়ে ফেলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ কনটেক্সট সেনসিটিভ। সবসময় খতম শব্দটি কোরান খতম অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে এমনি শেষ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। তবে $M_{w,t}$ তে $w =$ হিন্দু সমাজ হলে আমরা দেখব যে, এই শব্দটার ব্যবহার কম আর তা কোনো বিশেষ দ্ব্যর্থক অর্থেও ব্যবহৃত হয় না। হিন্দু সমাজে ‘খতম’ শব্দটা খুব একটা দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত নয়। কোনো ধর্মীয় পুস্তক পড়া হলে তাকে খতম বলা হয় না। ‘খতম’ শব্দের অধিভাষাতে মুসলিমদের বা মুসলিম মেয়েদের যে ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে তা একেবারেই তাদের নিজস্ব।

খবিশ

আরবি ‘খবিস’ শব্দের অর্থ অপরিচ্ছন্ন। $M_{w,t}$ তে $w =$ মুর্শিদাবাদ মালদা অঞ্চলের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলে, খবিশ শব্দটি পরিচিত একটা শব্দ। মেয়েদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি পাই আমরা। জনসমক্ষে তারা এই শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খবিশ শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখি না।

খাট্টা

টক। শব্দটি উর্দু। $M_{w,t}$ এর $w =$ মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখি টক শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে খাট্টা কথাটিও সব জায়গায় না হলেও অনেক জায়গাতেই প্রচলিত একটি শব্দ। এছাড়া

খাট্টা বলে আলাদা একটি পদও আমরা মুসলিম হেঁসেলে দেখতে পাই। কিন্তু টক এর বদলে খাট্টা শব্দটির ব্যবহার আমরা হিন্দু বাঙালি সমাজে দেখব না। এছাড়া এই শব্দটি হেঁসেলের সঙ্গে একটি শব্দ বলে মেয়েদের মধ্যে এই শব্দটির সংরক্ষণ অনেক বেশি। পুরুষরা তুলনায় টক শব্দটিই বেশি ব্যবহার করেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত শব্দগুলি শুধুমাত্র প্রবীণাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই শব্দটিও তার অন্যতম।

খাতির

এটি একটি ফার্সি শব্দ। এর অর্থ আপ্যায়ন, কদর বা সমাদর করা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা খেয়াল করব, খাতির শব্দটি খুবই প্রচলিত নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই। সু-সম্পর্ক থাকলে খাতিরের সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে খাতির শব্দটি বাংলা লেখ্য ভাষাতে সব ধর্মের মানুষরাই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু মৌখিক কথাতে মুসলিমরা অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকে শব্দটি।

খাদেম

খাবার পরিবেশনকারি ভৃত্য। এই শব্দটি একটি ফার্সি শব্দ। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা খেয়াল করব E_o ‘খাদেম’ হলে E_m বা অধিভাষাতে এই শব্দটি নিত্য ব্যবহৃত একটি শব্দ। যা তারা দৈনন্দিন জীবনে পরিবারের মধ্যে বা বাইরেও ব্যবহার করে থাকে।

যেমন- খাওয়ার সময় অতিথি এলে তাকে ভালো করে খাবার পরিবেশন করা বা যত্ন নেওয়ার সময় ‘খাদেম’ শব্দটি খুবই ব্যবহৃত হয়। - “আরে তোরা এখানে বসে কী করছিস! ভালো করে খাদেম কর। আসিফ কতদিন পরে এলো”। এই শব্দটির প্রয়োগ অন্য বাঙালিদের মধ্যে আমরা দেখব না।

তবে পরিবারের মধ্যে অন্য মানুষের বা অতিথির খাদেম করার ভার বেশিরভাগ সময় আমরা দেখি মেয়েদের উপরই ন্যস্ত থাকে। তাই w = শুধু মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘খাদেম’ শব্দটির অধিভাষাতে আমরা দেখব মেয়েরা নিজেদের কর্তব্যবোধ বা দায় অনুভব করে থাকে যা অনেক সময় মুসলিম পুরুষরা করে না। তবে বাড়ির বা পরিবারের বাইরে খাদেম করার ভার মেয়েদের উপর সচরাচর থাকেনা। যেমন মসজিদের সেবক বা অন্তঃপুরের বাইরের কোনও জায়গা। ফলে এভাবে নারী পুরুষের খাদেম করার স্থানের বোধ পালটে যাবে তাদের অধিভাষাতে।

খানা

ফারসি খানাহ থেকে এই শব্দটি বাংলা শব্দ ভাঙারে এসছে। তবে বাঙালি মুসলিমদের মধ্যেই এর ব্যবহার দেখা যাবে। অন্য ধর্মাবলম্বী বাঙালিদের মধ্যে এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। তবে এই শব্দটি আমরা দেখব প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মধ্যে বেশি চলে। নিজেদের ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি ব্যবহার করে। বিশেষ করে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভোজ খাওয়াকে খানা বলে বেশি নির্দেশ করা হয়। তবে ইদানীং এখনকার প্রজন্ম এই শব্দটি কম ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে নিজের পরিবার সম্প্রদায়ের বাইরে তারা প্রায় একেবারেই ব্যবহার করে না।

$M_{w,t}$ এর w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে আমরা দেখব খানা শব্দটি সাধারণ জীবন যাপনে দৈনন্দিন খাওয়া থেকে ভোজ অনুষ্ঠানে খাওয়াকে বোঝাতে বেশি বলা হয়ে থাকে। আর t কে যদি আমরা অতীত বর্তমান এইভাবে দেখতে যাই তাহলে দেখব, ধীরে ধীরে খানা শব্দটির ব্যবহার সংকুচিত হয়ে আসছে। এছাড়া বয়সকে সূচক হিসেবে নিলে দেখব বয়স্ক মানুষদের অধিভাষা বা metalanguage এ এই শব্দটি যেভাবে ছিল অল্পবয়স্কদের অধিভাষায় আর সেভাবে নেই। তার পরিবর্তে অনেক প্রতিশব্দ তারা ব্যবহার করে থাকে।

খিদমত

খিদমত শব্দটি একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ সেবা বা পরিচর্যা। ইসলামে বাবা মা গুরুজন এতিম দের খিদমত করা পুণ্যের কাজ বলে স্বীকৃত। এছাড়া যেকাজ দীন ইসলামের পথ প্রশস্ত করবে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমস্ত মানব সমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তাদের দেশ জাতি লিঙ্গ নির্বিশেষে ইসলামে পুণ্যের কাজ বলা হয়। একে খিদমত-এ-খলক বলা হয়। প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সহপর্ষটক দরিদ্র মানুষ সবার সেবাই ইসলামে পুণ্যের। $M^{w,t}$ তে W = মুসলিম সমাজ হলে, ‘খিদমত’ (খেদমত) ইসলামে খুবই প্রসংশনীয়।

তবে মুসলিম মেয়েদের ‘খিদমত’ শব্দের metalanguage এ আমরা দেখব, তাদের বাবা মার সেবা পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্বশুর শাশুড়ির খেদমত বা সেবা করাও পুণ্যের বলে মনে করা হয়। তবে এইসব খেদমতকে কখনোই আবশ্যিক করা হয়নি।

খোয়াব

এই শব্দটির অর্থ স্বপ্ন। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম অন্তর্জগৎ হলে, খোয়াব শব্দটি স্বপ্ন অর্থে প্রচলিত একটি শব্দ। সাধারণত প্রবীণাদের মধ্যেই এখন এর ব্যবহার দেখা যায়। কম বয়সীরা স্বপ্ন শব্দটিকেই বেশি ব্যবহার করে থাকে এখন। মুসলিম বৃদ্ধাদের মধ্যে এই শব্দটির সংরক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার দৈনন্দিন কথোপকথনে নেই। যদিও তারা শব্দটির সঙ্গে পরিচিত।

খুশবু

সুগন্ধ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘খুশবু’ শব্দটির সঙ্গে আতরের একটি সংযোগ আমরা পাব। ঈদ পার্বণে বা বিভিন্নরকম ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আতরের ব্যবহার মুসলিম সমাজে আদরণীয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সুগন্ধ হিসেবে আতর ব্যবহার করে থাকে। হিন্দু সমাজে এভাবে ‘খুশবু’ শব্দের অধিভাষাতে আতরের অনুষঙ্গ যুক্ত থাকে না।

খেলাফ

আরবি ‘খিলাপ’ থেকে খেলাপ কথাটি এসেছে। এর অর্থ বলা কথার অন্যান্যরূপ আচরণ করা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিমদের ভাষাবিশ্ব হলে, খেলাপ কথাটি বহুল ব্যবহৃত। তবে এই শব্দটি বাংলাভাষায় সর্বজনীনভাবে গৃহীত। পারিবারিক সামাজিক ক্ষেত্রে কথা দেওয়ার পরিসর অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের কিছুটা একচেটিয়া থাকে। যেহেতু পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের উপরই ন্যস্ত থাকে। কিন্তু নারীদের নিজেদের সম্পর্কের ভিতর, অন্তঃপুরের মধ্যে বা ব্যক্তিগত স্তরে তাদেরও আবেগ অনুভূতির কথা দেওয়া নেওয়া চলে। ফলে অন্তঃপুরের মুসলিম মহিলাদের ‘খেলাপ’ শব্দটির অধিভাষা আর পুরুষদের অধিভাষা অনেক ক্ষেত্রেই এক হয় না।

খেলাপ শব্দটি অবশ্য হিন্দুদের মধ্যেও চালু। তবে এতো ব্যবপক হারে নয়।

খুতবা

নামাজের পরে ইমাম প্রদত্ত অভিভাষণকে খুতবা বলা হয়। এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, খুতবা শব্দটির সঙ্গে ইসলাম ধর্মের যোগ নিবিড়। জুম্মার নামাজের পর, দুই ইদের পর বা বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত অনুষ্ঠানের পর ইমামের প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা বা অভিভাষণকে খুতবা বলা হয়ে থাকে। মুসলিমদের কাছে খুতবা তাই একটি পবিত্র বিষয়। সাধারণত এই খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে যেহেতু এই খুতবা একজন পুরুষ (ইমাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ।) দিয়ে থাকেন ফলে মুসলিম মহিলারা প্রকাশ্যে থেকে এই খুতবা শুনতে পারেন না। তাই মুসলিম মহিলা ও মুসলিম পুরুষদের ক্ষেত্রে ‘খুতবা’ শব্দটির অধিভাষা এক হয় না। মহিলারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরাসরি শোনে না।

খোদা

ফারসি খুদাহ থেকে খোদা শব্দটি এসেছে। খোদা শব্দের অর্থ হল স্বয়ম্ভু। এই শব্দটি ইরান থেকে আগত। $M_{w,t}$ এর w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে আমরা দেখব, আল্লাহকে খোদা বলেও ডাকা হয়। খোদা শব্দটি নিয়ে অধুনা অনেক ধর্মগুরুরা আপত্তি জানাচ্ছেন। আল্লাহ নামের উপর তারা জোর দিচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে খোদা বলে ডাকার প্রবণতা এখনো কমেনি। ‘খোদা হাফেজ’ ‘খোদার কসম’ ‘খোদা জানে’ প্রভৃতি শব্দবন্ধগুলো বহুল ব্যবহৃত। নারী পুরুষ নির্বিশেষেই খোদা বলে থাকে। ফলে ‘খোদা’ শব্দের অধিভাষাতে মুসলিম নারী পুরুষের যে সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি উঠে আসবে তা তাদের নিজস্ব। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে আরাবি আল্লাহ ও ইরানী খোদা দুটো শব্দেরই ব্যবহার দুই ধারার ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

গজব

আল্লাহর প্রচণ্ড রোষে, শাস্তি। এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব গজব শব্দটির অধিভাষাতে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আল্লাহর ইচ্ছায় বিপর্যয় নেমে আসার ধারণা। প্রাকৃতিক সমস্ত বিপর্যয় যা মানুষের জীবনে নেমে আসে তাকে মুসলিমরা অনেক সময় আল্লাহর ইচ্ছে বলে ধরে নেন। মানুষের পাপের জন্যই এই গজব নেমে আসে ধরা হয়।

‘গজব’ শব্দের এই ব্যঞ্জনা মুসলিমদের একেবারেই নিজস্ব। নারী পুরুষ উভয়েই আল্লাহর গজবের কথা বিশ্বাস করে থাকেন। এছাড়া মৃত্যুর পরেও কবরেও আল্লাহর গজব শুরু হয় বলে বিশ্বাস। এছাড়া জাহান্নামে অনন্তকাল আল্লাহর গজব বা শাস্তি বহমান। ইসলাম ধর্মের একান্ত বিশ্বাসের জায়গা থেকে আসা এই শব্দটির ব্যঞ্জনাও মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যদের কাছে এই শব্দটির পরিচিতিও কম।

চুগলখোরি

এই শব্দটির অর্থ অসাক্ষাতে অন্যের কাছে নিন্দা করা। পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি একজনের নামে অন্যজনকে কথা লাগালে তাকে চুগলখোর বলা হয়। এটি একটি ফারসি শব্দ। ইসলামে চুগলখোরিধরম গুরুতর অন্যায় বলে স্বীকৃত। মুসলিম সমাজে মনে করা হয় চুগলখোরি ব্যক্তি জান্নাতে পায় না। বুখারী শরিফের ১৩৭৮ এ চুগলখোরদের শাস্তি বিষয়ে একটি গল্প বর্ণিত আছে।^{২৩} এছাড়া কোরানের সূরা ক্বালামে (৬৮: ১১) চুগলকর সহ অন্যান্য পাপিষ্ঠদের কথা অনুসরণ না করার কথা আছে।^{২৪} অর্থাৎ ইসলামে এটি পাপ বলে বিবেচিত। মুসলিম সমাজ ছাড়া ‘চুগলখোর’ বা ‘চুগলখরি’ শব্দটি অন্য বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশি প্রচলিত নয়। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে চুগলকরি শুধুমাত্র মানবিক দিক থেকেই খারাপ কাজ নয়। এই শব্দের metalanguage এ ইসলামের কোরান হাদিস নির্দেশিত পাপের ধারণা এবং জান্নাত যাওয়ার অন্তরায় রূপে পরিগণিত কাজ বলে স্বীকৃত আছে। এক্ষেত্রে অবশ্য নারী পুরুষের অধিভাষা জগতে খুব বেশি পার্থক্য থাকার কথা নয়।

চেরাগ

এর অর্থ প্রদীপ। এটি দরবেশের স্থানে দেওয়া হয়। এটি একটি ফার্সি শব্দ। চেরাগ শব্দটি যদিও বাংলা শব্দভাণ্ডারে থাকা একটি বহু পুরোনো শব্দ। এখনো মুসলিম পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ‘চেরাগ’ শব্দটির ব্যবহার পাব। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম অন্তর্জগৎ হলে, চেরাগ শব্দটি প্রদীপ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে খেয়াল করার বিষয় চেরাগ বা প্রদীপ যেমন হিন্দু বাড়িতে পূজো উপলক্ষে জ্বালানো হয় মুসলিম বাড়িতে সেরকম হয় না। প্রদীপ জ্বালানোর সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির একটা সম্পর্ক আছে। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে প্রদীপের সম্পর্ক নেই। তবে বিভিন্ন মাজারে বা দরগাতে চেরাগ জ্বালানো হয়। সুফিবাদ বাঙালি

মুসলিমদের যাপন ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে। ফলে মাজারে চেরাগ জ্বালানোর চিত্রটি মুসলিমদের কাছে একটি চেনা ছবি, যা অনেকসময় চেরাগ শব্দের অধিভাষাতে ধরা থাকে। মেয়েরা সাংসারিক সুখ দুঃখ সমস্যা নিয়ে মাজারে দরগায় মানত করে থাকে। নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি নিবেদনে স্বস্তি পায় না। ফলে ‘চেরাগ’ শব্দটির অধিভাষাতে মাজার দরগা বা দরবেশ পিরদের প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাসের এক ধরনের ভাব আসে যা একান্তই তাদের নিজস্ব জগৎকে চিহ্নিত করে থাকে।

চেহলাম

এটি একটি ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হল চল্লিশা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে চেহলাম বা চল্লিশা শব্দের অধিভাষাতে আমরা দেখব কোন মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মিলাদ, দোয়া করা হয় সেই বিষয়টি উঠে আসবে। এই বিধি শরিয়ত সম্মত এবং একান্তই মুসলিম সমাজের।

চোটামি

এই উর্দু শব্দটির অর্থ হল শঠতা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে, আর t = বর্তমান সময় হলে, চোটামি শব্দটি শঠতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাচ্চাদেরকেও আমরা খেলার সময় চোটামি শব্দটি ব্যবহার করতে দেখি। তবে এই শব্দটি হিন্দু বাঙালিরাও ব্যবহার করে থাকে। তবে মুসলিমদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি। নারী পুরুষ উভয়ের কথাতাই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সফর

ছফর, যাত্রা। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ এবং t = বর্তমান সময় হলে, ‘সফর’ শব্দটি খুবই পরিচিত শব্দ। সফর চলাকালীন নামাজের নিয়মেরও কিছু পরিবর্তন

ঘটে। নিজ এলাকা গ্রাম শহরকে অতিক্রম করে গেলে সেটাকে সফর বলে ভাবা হয়। আর ভ্রমণকারীকে মুসাফির বলা হয়ে থাকে।

সফরকারীর জন্য শরিয়তের বিধি-বিধানে কিছু শিথিলতা রয়েছে। যেমন- চার রাকাতবিশিষ্ট ফরজ নামাজগুলো দুই রাকাত পড়তে হয়। সফরে রোজা না রেখে পরবর্তী সময়ে কাজা করলেও চলে। অনুরূপভাবে মোজায় মাসেহ করা ইত্যাদি বিধানে সাধারণ অবস্থা থেকে ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু কোনো জায়গায় ১৫ দিন বা ততধিক অবস্থানের নিয়ত করলে সে সেখানে মুকিম হয়ে যাবে। সেখান থেকে সামানা-পত্রসহ প্রস্থানের আগ পর্যন্ত সেখানে পূর্ণ নামাজ পড়বে এবং মুকিমের বিধান জারি থাকবে।

নারীদের ক্ষেত্রে বিবাহের আগে পিতৃগৃহতে তাকে পূর্ণ ফরজ রাকাত পড়তে হবে। কিন্তু বিয়ের পর তার বাবার বাড়িতে ফিরে এলে সে তখন মুসাফির থাকবে। সেখানে স্বামীর আবাস্থনই তাদের মৌলিক বাসস্থান হিসেবে ধর্তব্য হবে।

তাই ‘সফর’ শব্দটির অধিভাষাতে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ধার্মিক মুসলিমদের ক্ষেত্রে শরিয়তি বিধি সম্পর্কিত বিষয়গুলিও উঠে আসবে। এছাড়া সফর করতে গেলে বেশিরভাগ সময় মহিলাদের সঙ্গে বাবা বা দাদা স্বামী বা ছেলে বা নিদেনপক্ষে অন্য কোন মহিলা সঙ্গী থাকে। সেটা আমরা মুসলিম ছেলেদের ক্ষেত্রে ওভাবে দেখি না।

সিনা

বুকের পাটা। এটি একটি উর্দু শব্দ। এই শব্দটিও মুসলিম পরিবারে প্রচলিত। হিন্দুদের মধ্যে এই শব্দটির প্রচলন প্রায় নেই বললেই চলে। গো মাংসের ক্ষেত্রে সিনার মাংস খাদ্যরসিকের কাছে পছন্দের। অনেকক্ষেত্রেই অনেক পরিবারে বুক বলতে হয়তো সিনা শব্দটি আর ব্যবহার করা হয় না কিন্তু গো-মাংসের ক্ষেত্রে সিনা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

জুবান

মুখ/ কথা। জুবান কথাটির প্রয়োগও মুসলিমদের মধ্যেই বেশি আমরা দেখব। হিন্দুদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার নেই। কথা দেওয়া অর্থেও জুবান দেওয়া কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম নারীর চিন্তাজগৎ হলে এই শব্দটির অস্তিত্ব আছে ব্যবহারও আছে। এবং এর সুনির্দিষ্ট অর্থও আছে।

জান

প্রাণ। জান কথাটিও মুসলিমদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

“আজ জানটা খুবই খারাপ লাগছে আজ”

“আমার জান ভালো নেই আজ”

এইভাবে এই শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাব। নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই এই শব্দটির ব্যবহার থাকলেও মেয়েদের মধ্যেই এই শব্দটির ব্যবহার বেশি দেখব, বিশেষ করে প্রবীণাদের মধ্যে। $M_{w,t}$ তে w = প্রবীণা মুসলিম মহিলাদের চিন্তাজগৎ হলে ‘জান’ শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে।

যদিও অনেকসময় এখন ‘জান’ কথাটি হিন্দি সিনেমা সিরিয়ালের দৌলতে পরিচিত শব্দ। নিত্যদিনে ব্যবহার না করুক অনেকে আলাংকারিক অর্থে অনেকসময় হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলতে গিয়ে জান শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তবে সেটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু প্রেমিক/প্রেমিকার ক্ষেত্রে বলিউডি অনুকরণে জান বলতে শোনা যায়। তবে দুটো শব্দটির অর্থ অনেকাংশে এক হলে প্রয়োগক্ষেত্র আলাদা। অর্থাৎ $M_{w,t}$ তে w = হিন্দু সমাজ হলে জান শব্দটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জাকাত

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, জাকাত হল মুসলিমদের জন্য অবশ্য পালনীয় বিধির একটি। প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নারী পুরুষের স্থায়ী আয় এবং সম্পত্তির উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়। একে জাকাত দেওয়া বলে। এটি একটি আরবি শব্দ। তবে ‘নিসাব’ পরিমাণ বা প্রয়োজনীয় সম্পদের উর্ধ্বে জাকাত দিতে হয়। ফলে গরিবদের জন্য জাকাত আবশ্যিক নয়।

‘নিসাব’ হলো সোনা সাড়ে সাত ভরি, রূপা সাড়ে ৫২ ভরি অথবা এর সমমূল্যের নগদ টাকা ও ব্যবসাপণ্য। ঋণ থাকলে সেই টাকা বাদ দিয়ে হিসেব করতে হয়। তবে সোনা রূপার দামের ওঠাপড়ার সঙ্গে এগুলোর পরিমাণ বদলাতে পারে। ফলে আমরা দেখছি নারীর গহনার উপরও জাকাত দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমরা অনেকেই জাকাত দিয়ে থাকেন ধর্মীয় বিধি অনুসরণ করে। কোরানে জাকাত দেওয়ার কথা বহুবার করে উল্লিখিত আছে। ফলে আমরা দেখছি, দান করাটা ইসলামে ইচ্ছামূলক রাখা হয়নি। সেটা আবশ্যিক করা হয়েছে। ‘জাকাত’ শব্দটির অধিভাষাতে মুসলিমরা যেভাবে একটি ধর্মীয় অনুশাসন দেখেন অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই শব্দটি একদমই সেরকম কোন তাৎপর্য বহন করবেনা। এমন কি, তাদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহারও নেই।

জায়েজ

বৈধ। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে ‘জায়েজ’ শব্দটি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি ব্যবহার করে থাকে। ইসলামীয় বিধিতে যা নিষিদ্ধ বা উচিত নয় তা নাজায়েজ। আর যা বিধিসম্মত তাই জায়েজ। জায়েজ কথাটি আমরা হিন্দু বাঙালিদের ব্যবহার করতে দেখি না।

জাসুস

এর অর্থ গোয়েন্দা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম ভাষাবিশ্ব হলে, ‘জাসুস’ শব্দটি পরিচিত শব্দ। মুসলিম মেয়েরা জাসুস শব্দটি বলে থাকে।

“আরে আমার মাকে তো চিনিস না! পুরো জাসুস।”

জাসুস কথাটা আমরা দৈনন্দিন কথোপকথনে হিন্দুদের ব্যবহার করতে দেখি না।

জালিম

জুলুমকারী ব্যক্তি। এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, জালিম শব্দটি একটি পরিচিত ও ব্যবহৃত শব্দ। এই শব্দটি নারী পুরুষ উভয়ই জানলেও মেয়েদেরকে আমরা বেশি ব্যবহার করতে দেখি। তবে ধীরে ধীরে শব্দটির ব্যবহার নবীনাদের মধ্যে কমে যাচ্ছে। বৃদ্ধাদের মধ্যে শব্দটির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশি। হিন্দুদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার খুব একটা নয়।

জাহাঁবাজ

ধড়িবাজ মেয়ে। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিমদের চিন্তাজগৎ হলে আমরা দেখব জাহাঁবাজ শব্দটি প্রচলিত। তবে এই শব্দটি শুধু পুরুষেরা ব্যবহার করেন তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়ে থাকে। জাহাঁবাজ বিশেষণটি পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা খুব একটা ব্যবহৃত হতে দেখিনা।

এছাড়া w = হিন্দুদের চিন্তাজগৎ হয়ে গেলে আমরা এই শব্দটির ব্যবহার তেমন দেখব না।

জাহিল

বোকা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, এই শব্দটি পরিচিত। মুসলিম পুরুষদের মধ্যেও এই শব্দটি পরিচিত। মহিলারা মহিলাদেরকে বা পুরুষেরা মহিলাদেরকে জাহিল বলে থাকে। এই শব্দটিও আমরা হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখব না।

জিন্দেগি

জীবন। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলে জিন্দেগি শব্দটি ব্যবহৃত শব্দ। যদিও এই শব্দটি বহুল প্রচলিত নয়। তবে অনেকে সময় বিশেষে বলে থাকে।

জিয়াফত

নিমন্ত্রণ। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘জিয়াফত’ শব্দটি খুবই পরিচিত একটি শব্দ। সাধারণত, অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিয়াফত কথাটি বেশি ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি হিন্দুরা ব্যবহার করে না। প্রতিবেশী বাংলাদেশেও আমরা জিয়াফত শব্দটি আমরা ব্যবহার হতে দেখি।

জিরান

এর অর্থ বিশ্রাম। এটা একটা ফার্সি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, এই শব্দটি গ্রামের মহিলাদের মধ্যে বেশি প্রচলিত দেখা যায়। আর এটা খুব পুরোনো শব্দ। তাই হিন্দুদের মধ্যেও এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। খুব কম।

“একটু জিরান দে এবার। অনেকক্ষণ ধরেই তো করছিস!”

রেজাই

তোষক। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, রেজাই শব্দটি আমরা বৃদ্ধাদের মধ্যে ব্যবহৃত হতে দেখি। মুর্শিদাবাদ মালদা অঞ্চলে রেজাই শব্দটির ব্যবহার বেশি। এই শব্দটিও পুরোনো শব্দ। নবীন প্রজন্মদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি নয়। প্রবীণরাই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। আর পুরুষদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে এখন। এছাড়া এই শব্দটি ঘর-গৃহস্থালির সঙ্গে যুক্ত বলে মেয়েদের দৈনন্দিন জীবনে

শব্দটির চল অনেক বেশি। কিন্তু হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার নেই। তাই তাদের অধিভাষাতে ‘রেজাই’ শব্দটির আলাদা কোন তাৎপর্য নেই।

শওয়াল

এর অর্থ প্রশ্ন। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিমদের ভাবনা বিশ্ব হলে এই শব্দটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ তাদের কাছে প্রতিফলিত হবে। অনেক সময় এই শব্দটি ধার্মিক মুসলমানের কথার মধ্যে পাওয়া যায়। নারী পুরুষ উভয়ই ব্যবহার করে থাকে। হিন্দু বাঙালি লেখ্য ভাষায় অনেক সময় ব্যবহার করলেও মৌখিক ভাষাতে এর চল নেই বললেই চলে।

শরাব

অর্থ মদ। মদ ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে একটি। ইসলামে নির্দেশিত যেসব খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আছে তাদের হারাম বলা হয়। $M^{w,t}$ এর w কে যদি আমরা মুসলিম সমাজ ধরি তাহলে ‘মদ’ বা ‘শরাব’ শব্দটি তাদের জন্য নিষিদ্ধ পানীয় হিসেবে উপস্থিত হতে দেখব। নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই শরাব নিষিদ্ধ।

কোরানের (৪: ৪৩) পেজ – ১১৯ এ নেশাগ্রস্ত অবস্থাতে নামাজ পড়তে নিষেধ করার কথা বলা আছে আর সূরা মা-য়িদাহ এর ৯০-৯১ আয়াত জুড়ে বলা হচ্ছে ^{২৫}

কোরানে মদ থেকে স্পষ্টত বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ের ‘শরাব’ বা ‘মদ’ শব্দের metalanguage এ তাই আমরা দেখব এক ধরনের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার বোধ উঠে আসে যা হিন্দু বাঙালির metalanguage এ অনুপস্থিত থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ‘শরাব’ শব্দটি হিন্দু বাঙালি ব্যবহার করে না। মুসলিম বাঙালি শরাব মদ দুটি শব্দই ব্যবহার করে থাকে। শরাব শব্দটি অবশ্য সর্বত্র সবাই ব্যবহার করে না।

শরিফ

অর্থ ভদ্র। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, শরিফ কথাটি একটি পরিচিত শব্দ। তবে সমস্ত বাঙালি মুসলিম যে এই শব্দটি ব্যবহার করে তা নয়। উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিছু জায়গাতে আমরা ‘শরিফ’ কথাটির ব্যবহার পাই। ধর্মীয় জ্ঞান ও বিধি মেনে চলা ব্যক্তিকে শরিফ বলে বিবেচিত। শরিফ কথাটির সঙ্গে হিন্দু বাঙালিও পরিচিত বিভিন্ন গনমাধ্যম ফেরৎ। কিন্তু শরিফ কথাটির সঙ্গে হিন্দু বাঙালি পরিচিত হলেও এই শব্দটির সঙ্গে ইসলামিক বিধি সম্মত ভদ্রতা বা সৌজন্যের কোনো সম্পর্ক তাদের অধিভাষাতে যুক্ত থাকে না। তবে শরিফ শব্দটি নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করলেও এখন পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা বেশি ব্যবহার করে থাকে। ধীরে ধীরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগের ফলে পুরুষের ভাষায় সংরক্ষণ কম। তাই তাদের ভাষাতে পুরনো প্রচলিত শব্দগুলির ব্যবহার কমে আসছে।

শোকর

‘শুকর’ থেকে শোকর কথাটি এসেছে। এর অর্থ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েই এই শব্দটি বলে থাকে। কিন্তু এই শব্দটিও দেখব, ‘আল্লাহ অনেক শুকোর তোমার কাছে’ এইভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় তারা এই আরবি শব্দ থেকে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে পরিবর্তিত শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। $M_{w,t}$ এর w এখানে আল্লাহের প্রতি বাঙালি মুসলিমদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রসঙ্গ।

এছাড়া আমরা দেখব, মুসলিমরা অনেক সময়ই খানিক রঙ্গ রসিকতা করে কথা বলার সময় আরবি হিন্দি ফারসি ইত্যাদি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটায় বা অতিশোয়ক্তি বা ব্যজস্ততি অলংকার ব্যবহার করে থাকে। সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় কথা বলার সময় সেইভাবে কথা

বলে না। এইরকম বিশেষ রঙ্গ রসিকতাপূর্ণ কথা বলার সময় ‘শুকরিয়া জি’ বলে থাকে। এই ধরনের কথা মেয়েদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ধন্যবাদ জানানোর জন্য শোকর বা শুকরিয়া শব্দটি তারা ব্যবহার করে না।

ফলে ‘শোকর’ শব্দের মুসলিম মেয়েদের metalanguage এ ধরা থাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অন্য ক্ষেত্রে রঙ্গ রসিকতার সময় শোকর বলা হয় না, শুকরিয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

শোর

শোর শব্দের অর্থ চিৎকার। এটি একটি ফারসি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে এই শব্দটির ব্যবহার আমরা বাঙালি মুসলিম সমাজে দেখি। কিন্তু বাঙালি হিন্দু সমাজে এর ব্যবহার নেই। অনেকসময়, বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে শোর কথাটি ব্যবহার করে থাকে। তবে সমস্ত বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে ‘শোর’ শব্দটি প্রচলিত নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার দিকে আমরা শোর শব্দটির ব্যবহার পাই।

সফেদ

সাদা। এটি একটি ফার্সি শব্দ। সাদা রঙ ইসলামের বেশ কিছু রীতি রেওয়াজের সঙ্গেও যুক্ত। যেমন মৃতের কাফন সাদা রঙের হয় সবসময়। বা ঈদের পাঞ্জাবির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি পুরুষদের পছন্দের শিরোভাগে থাকে সাদা পাঞ্জাবি। সফেদ কথাটি যদিও বাংলা শব্দভাণ্ডারে পরিচিত শব্দ। তবে বাংলাই মুসলিমদের মধ্যে এর ব্যবহার সর্বাধিক। আর অনেকসময়ই তা কাফন বলার সময় ‘সাদা’ শব্দটির পরিবর্তে সফেদ বলতে দেখা যায়। তবে সফেদ কথার এই অনুষঙ্গ w = মুসলিম চিন্তাজগৎ হলে তা সহজেই উঠে আসতে দেখব। কিন্তু হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে সফেদ শব্দের এই অনুষঙ্গ আমরা নারী পুরুষ কারোর

ক্ষেত্রেই দেখব না। তবে সফেদ এর প্রতিশব্দ সাদা শব্দটিও মুসলিম জন মানসে বহুল প্রচলিত।

সয়লাব / ছয়লাপ –

বন্যা , প্লাবিত – মানুষে মানুষে সয়লাব। আরবি- সাইল , ফারসি – আব থেকে শব্দটি এসছে।

“ঘর বাড়ি ঢুকে দেখি সব সয়লাব হয়ে রয়েছে ” – আবেদা খাতুন , পিরগাছা।

‘সয়লাব’ কথা থেকে ছয়লাপ কথাটি বাংলা শব্দভাণ্ডারে যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে তা কোন নির্দিষ্ট ধর্মবলম্বী মানুষের কথাবার্তায় সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু সয়লাব কথাটি অবিকৃতভাবে আমরা সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে দেখি না। w = উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম নারীদের অন্তর্জগৎ হলে খুব সহজেই প্রবীণাদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করে থাকি। পুরুষদের মধ্যে এই শব্দের ব্যবহার এখন প্রায় নেই বললেই চলে।

ফলে আমরা দেখতে মূল আরবি শব্দটির ব্যবহার মুসলিম মেয়েদের চিন্তাজগতে স্থান করে আছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটি নবীনাদের মধ্যে আর ব্যবহৃত হয় না।

সরপোষ

‘সরপোস’ একটি ফারসি শব্দ। সরপোস শব্দটির ব্যবহার বাঙালি মুসলিমদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে খুব একটা শব্দটি প্রচলিত নয়। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, E_o = সরপোষ হলে, এর E_m বা অধিভাষাতে এই শব্দটির সঙ্গে যুক্ত ঘর গৃহস্থালির কথা মনে পড়ে যাবে। এখানে উল্লেখ্য, w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে, সেখানে আমরা দেখব, সরপোশ শব্দটি তাদের ঘর-গৃহস্থালি বা দিনের অধিকাংশ সময় যেখানে কাটায় যা নিয়ে কাজ করে তার

সঙ্গে যুক্ত এই শব্দটি। ফলে তাদের অধিভাষাতে ঘর-গৃহস্থালির সঙ্গে যুক্ত রান্না বা কাজকর্মের কথা উঠে আসবে। কিন্তু মুসলিম ছেলেদের অধিভাষাতে এই শব্দটি ঠিক একই তাৎপর্য বয়ে আনবে না। যেহেতু ছেলেদের অধিকাংশ সময় অন্তঃপুরে কাটেনা ও তারা গৃহকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে না বেশিরভাগই তাই তাদের অধিভাষাতে একই ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে না শব্দটি।

সামান

এর অর্থ জিনিস। w = মুসলিম নারীদের মানসভুবন হলে সামান কথাটি আমরা শুনে থাকব অনেকের মুখে।

“এতসব সামান কি করে নিয়ে যাব বল দেখি!” – মেহেরুন্নেসা, ক্যানিং

কিন্তু হিন্দু মহিলাদের মধ্যে সামান শব্দটা আমরা ততটা বলতে দেখিনা।

হদ্দ করা করেছে

অর্থ মোট, যথাসাধ্য। আরবি শব্দ হদ্দ।

“হদ্দ বলা বলে লেল শাশুড়িরি” – আচে, উত্তর ২৪ পরগণা।

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম নারীদের অন্তর্জগৎ হলে, বিশেষ করে দুই চব্বিশ পরগণার গ্রামের মহিলাদেরকে হদ্দ শব্দটি আমরা অহরহ বলতে শুনি। কিন্তু হিন্দু নারীদের মুখে আমরা এই শব্দটা শুনি না। ফলে এই শব্দের অধিভাষাতে মুসলিম নারীদের যে ব্যঞ্জনা চিত্রিত হয়ে ওঠে তা আমরা হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে দেখব না।

হেফাজত

দায়িত্ব। w = মুসলিম নারীদের অন্তর্জগৎ হলে ‘হেফাজত’ শব্দটির প্রয়োগ আমরা দেখতে পাব। হেফাজত করা বা রক্ষা করা বলতে পুরুষরা বেশিরভাগ সময় নিজেদেরকে যে

অবস্থানে রাখে তা হল রক্ষকর্তার স্থানে। অনেক মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে নারীর রক্ষাকর্তা রূপেও তারা নিজেদেরকে দেখে। বিশেষ করে তার নিজের পরিবারের নারীদের। সমাজই এই ভূমিকা তাদের উপর ন্যস্ত করে রেখেছে। তাই তাদের হেফাজত শব্দের অধিভাষাতে হেফাজতকারী হিসেবেই তারা নিজেদেরকে দেখে সর্বদা। নারীদের ক্ষেত্রে বিষয়টা পুরোপুরি এক নয়। সে ঘর সংসার পরিবারের অনেক জিনিস হেফাজতে রাখতে পারে কিন্তু অন্তঃপুর পরিবারের বাইরে তার হেফাজত করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা মৌলিক কিছু নয়। ইসলামে মেয়েদের হেফাজত, মেয়েদের রক্ষাকর্তা হিসেবে পুরুষকে স্থাপন করতে অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়। ধার্মিক মুসলিম নারী পুরুষ নির্বিশেষেই এই সমীকরণকে মেনে চলে। তাই হেফাজত শব্দটির অধিভাষা মুসলিম নারী পুরুষের ক্ষেত্রে এক থাকছে না।

অন্যদিকে w = হিন্দু ভাষা গোষ্ঠী হলে, আমরা দেখি এই শব্দটি তাদের জানা। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন শব্দচয়নে এই শব্দটি তত বেশি জায়গা পায় না।

“আমার মেয়েকে তোমার হেফাজতে রেখে গেলাম বাবা, একটু দেখো”

শিশা

আরশি । এটি একটি ফারসি শব্দ। শিশা শব্দটি বাংলা শব্দকোষে খুবই পরিচিত একটি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মহিলাদের ভাষাবিশ্ব হলে, সেখানে শিশা শব্দটি আয়না অর্থে আমরা খুবই ব্যবহৃত হতে দেখি। গ্রামের দিকে এই শব্দটির প্রচলন বেশি। হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটি কম ব্যবহৃত হয় এখন অনেক।

শুরুয়া

এর অর্থ হল বোল। এটি একটি ফার্সি শব্দ। কখনো কখনো আঞ্চলিক প্রভাবে এটাকে শুরো ও বলা হয়ে থাকে। এই শব্দটির ব্যবহার আমরা হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে দেখি না। $M_{w,t}$ তে

w = মুসলিম সমাজ হলে, শুরুয়া শব্দটি প্রায় নিত্য ব্যবহার হয়ে থাকে হেঁসেলে ও খাওয়ার সময়। নারী পুরুষ উভয়েই এটি ব্যবহার করে থাকে। তবে ঘর-গৃহস্থালির সঙ্গে সংযুক্ত বলে মেয়েদের অধিভাষায় এটা তৈরির পদ্ধতির সঙ্গেও যোগ থাকে যা পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাব না।

মেহমান

শব্দটি ফারসি। এর অর্থ আত্মীয়, কুটুম্ব। প্রায় সব ধর্মের মধ্যেই অতিথি আপ্যায়নের কথা বলা হয়ে থাকে। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘মেহমান’ শব্দের অধিভাষাতে তাকে আপ্যায়ন করে তাঁর সুযোগ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এই ধারণাটি উঠে আসতে দেখব। ধর্মীয়ভাবে ও সামাজিকভাবেও অতিথি বা মেহমানদের আতিথেয়তা আমাদের বাঙালি সমাজে একটি পরিচিত বিষয়। বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে মেহমানদের বিভিন্নরকম খাবার দেওয়াও খুবই রেওয়াজের মধ্যে পড়ে। তবে খেয়াল করার বিষয়, মেহমানদের আপ্যায়নের সিংহভাগ ঘরের কাজগুলো মেয়েরাই করে থাকে। মেয়েরা সাধারণত এগুলোকে তাদের দায়িত্ব বলেই মনে করে। তাই একজন মুসলিম মেয়ের অন্তর্ভুক্তিতে মেহমান মানে শুধুমাত্র অনেকজন মিলে হাসি গল্প করা নয়। তার সঙ্গে তাদের গৃহকর্মের পরিমাণও অনেক গুণ বেড়ে যাওয়া।

মেহমানদারির ক্ষেত্রে গরিব বড়োলোক মুসলিম বা অ-মুসলিম কারোর প্রতিই বৈষম্যমূলক আচরণ করা অন্যায্য। মেহমানদারিতে উপার্জন বৃদ্ধি পায় গৃহে শান্তি আসে বলে বুখারি শরীফে উল্লেখ আছে। অতিথি আল্লাহর রহমত সঙ্গে নিয়ে আসে বলে মনে করা হয় ইসলাম ধর্মে।

তবে t বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতিথিবৎসলতেও খানিক পরিবর্তন এসেছে। গ্রামের দিকে যৌথ পরিবারের সমস্ত মহিলারা মিলে যেভাবে অতিথি আপ্যায়নের

দায়িত্ব নিতেন এখন কর্মব্যস্ত নিউক্লিয়ার পরিবারগুলিতে তুলনায় আপ্যায়নের বহর কমে এসেছে। কমেছে আন্তরিকতাও। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অতিথিপরায়ণতার সংকোচনও খেয়াল করার মতো। তবু এখনো গ্রামের দিকে প্রবীণারা মেহমানদারির এই ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ‘মেহমান’ শব্দটি আমরা খেয়াল করব, শুধুমাত্র মুসলিমরাই ব্যবহার করে থাকেন। অন্য বাঙালিদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।

মেহফিল

এটি একটি আরবি শব্দ। একসঙ্গে সবাই সমবেত হওয়ার স্থানকে মেহফিল বলা হয় সাধারণত। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘মেহফিল’ শব্দটির অধিভাষাতে ধর্মীয় উৎসবের এক ধরনের ব্যঞ্জন থাকে। এছাড়া হিন্দু বাঙালিরাও ‘মেহফিল’ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত কিন্তু তারা এই শব্দটিকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই ভাবে। বিয়ে ঈদ বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেহফিল বা লোক সমাগম ঘটে থাকে। এই শব্দটি তাই মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি শব্দ।

মেহনত

এর অর্থ পরিশ্রম। আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম অন্তর্ভুক্ত হলে মেহনত শব্দটির অধিভাষাতে পরিশ্রমের অনুষঙ্গ আছে। এই শব্দটি লেখ্য ভাষাতে যদিও প্রচলিত সবার মধ্যেই কিন্তু মেহনত শব্দটি মুসলিম বাঙালি মৌখিক ভাষাতে অনেক বেশি বলে থাকে।

মোলাকাত

দেখা। এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম বিশ্ব হলে, আর t বর্তমান সময় হলে, মোলাকাত শব্দটি পরিচিত। এই শব্দটিও মুসলিম সমাজে যতটা প্রচলিত হিন্দু সমাজে নয়। তবে এই শব্দটি এখন সব প্রজন্মের মধ্যে সমানভাবে ব্যবহৃত হয় না।

মুর্দা

মৃত ব্যক্তি। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম অন্তর্জগৎ হলে মুর্দা শব্দটি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে অহরহ ব্যবহৃত হয়। মুর্দা ব্যক্তি বা মুর্দা লাশের কথা প্রসঙ্গে মুর্দা শব্দটি মুসলিম সমাজে প্রচলিত। তবে নারী পুরুষ উভয়ই মুর্দা শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তবে, কম বয়সীদের মধ্যে মুর্দা শব্দটি বলার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। আর অন্য ধর্মাবলম্বী বাঙালিদের মধ্যে মুর্দা শব্দটি প্রচলিত নয়। তাই এই শব্দটির অধিভাষা হিন্দু মুসলিমের জন্য এক হবে না। আর মুর্দা শব্দটির অধিভাষাতে ইসলামি রীতি অনুসারে দাফন ও কবরের ছবি ভেসে ওঠে।

মুরুব্বি

‘মুরুব্বি’ শব্দের অর্থ অভিভাবক বা জ্ঞানী। এটি একটি আরবি শব্দ। এই শব্দটির ব্যবহারও আমরা দেখব শুধুমাত্র বাঙালি মুসলিমরাই ব্যবহার করে। হিন্দুদের মধ্যে এর প্রয়োগ নেই। অর্থাৎ $M^{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে মুরুব্বি শব্দটি বাড়ির বা পরিবারের বা মুসলিম সমাজের অভিভাবক বা জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বলা হয়ে থাকে। সচরাচর, কোন হিন্দু ব্যক্তিকে মুরুব্বি বলে নির্দেশ করে না মুসলিমরা।

ফলে, ‘মুরুব্বি’ শব্দের metalanguage এ বাঙালি নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে যে ছবি উঠে আসে তা হিন্দু বাঙালিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ধর্ম এখানে এই শব্দের অর্থ ও অধিভাষা তৈরি করেছে।

মুয়াজ্জিন

যিনি আজান দেন। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘মুয়াজ্জিন’ শব্দের অধিভাষাতে আমরা দেখব যে এটি শুধুমাত্র একটি পেশা নয়। মুসলিম সমাজে ‘মুয়াজ্জিন’ একটি পেশা

মাত্র নয়। এই পেশাটার সঙ্গে পবিত্রতার বা সম্মানের বিষয় যুক্ত আছে। মুয়াজ্জিনরা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেন। সেই আজানে সবাই নামাজের ডাক শুনে নামাজ পড়তে আসে।

মরহুম

লোকান্তরিত। মৃত। হিন্দু সমাজে যেমন মৃত ব্যক্তিকে বোঝাতে তার আগে স্বর্গীয় শব্দটি বলা হয় বা লেখা হয়, মুসলিম সমাজে তেমন ‘মরহুম’ শব্দটি মৃত ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ $M^{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘মরহুম’ শব্দটি মৃত ব্যক্তিকে বোঝায়। যদিও এর আক্ষরিক অর্থ আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত ব্যক্তি। এই শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় সরাসরি মৃত না বলে ব্যক্তিকে। এই শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য মুসলিম সমাজের বাইরে পাওয়া যাবে না। ফলে মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই এই শব্দের metalanguage এ মৃত কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বোঝাবে। এই শব্দটি আমরা দেখব মুখে যত না উচ্চারিত হয় কোনও চিঠিপত্র দলিল বা সরকারি কাগজে তার থেকে বেশি ব্যবহৃত হয়।

বেমারি

অসুখ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘বেমারি’ শব্দটি অসুখ-বিসুখ বোঝাতে মুসলিম প্রবীণাদের মধ্যে প্রায়শই শোনা যায়। বিশেষ করে গ্রামের দিকে বৃদ্ধাদের মধ্যে বেমারি শব্দটি পরিচিত শব্দ।

চারা নেই

চারা বলতে সাধারণত গাছের চারাকেই আমরা বুঝেই থাকি। কিন্তু $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা খেয়াল করব যে ‘চারা নেই’ শব্দবন্ধটি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে আমরা রূপক শব্দ হিসেবেও দেখতে পারি। E_0 তে যদি আমরা ‘চারা নেই’ শব্দটির অধিভাষা খেয়াল করলে আমরা দেখব এই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে একেবারে অন্য ক্ষেত্রে। কোনো

কাজের ফলাফল খুব খারাপ হয়ে গেলে এবং তা আর পুনরুদ্ধার করার অবস্থা না থাকলে সেইসব ক্ষেত্রে বলা হয় ‘চারা নেই’

এই শব্দটির ব্যবহার আমরা বাক্যে প্রয়োগ এভাবে দেখেছি –

“যা ভুল হয়ে গেছে তার আর কোনো চারা নেই”

“এতজন লোক এলো কাউকে খাবারটা দেওয়া হল না। যা মানসম্মান গেল যা খারাপ হয়ে গেল তার আর কোনো চারা নেই।”

এই শব্দটির ব্যবহার উত্তর চব্বিশ পরগণার মেয়েদের মধ্যেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। ছেলেরা এর অর্থ জানলেও তাদের কথাতে তারা এটি খুব একটা ব্যবহার করে না।

পাক

এটি একটি ফারসি শব্দ। এর অর্থ হল পরিষ্কার বা পবিত্র থাকা। তবে, এছাড়া পাক শব্দটি রন্ধন করা বা চুলে পাক ধরা – এই অর্থে সবাই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু পাক পরিষ্কার অর্থে ব্যবহার করতে আমরা শুধু মুসলিমদেরই দেখব। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘পাক’ শব্দটি পরিষ্কার অর্থে ব্যবহার করে থাকে।

নালায়েক

অযোগ্য। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘নালায়েক’ শব্দটি একটি পরিচিত শব্দ। মুসলিম নারী পুরুষদের মধ্যে বয়স্করা ‘নালায়েক’ শব্দটি বেশি ব্যবহার করে থাকে। ইদানীং এই শব্দটির ব্যবহার কমছে।

নাখোশ

এই শব্দটির অর্থ অসন্তুষ্ট। এটি একটি ফারসি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, ‘নাখোশ’ শব্দটি আল্লাহর অসন্তোষ বোঝাতে বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্য ক্ষেত্রে

নাখোশ শব্দটির ব্যবহার তত নয়। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ‘নাখোশ’ শব্দটির অধিভাষাতে এক ধরনের ধর্মীয় পরিমণ্ডলের আভাস উঠে আসে মেয়েদের মনে। নারী পুরুষের জন্য আল্লাহর অসন্তোষের কারণ আলাদা। তাই, নাখোশ শব্দটির অধিভাষা মুসলিম নারী পুরুষের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যাবে। আর অন্য ধর্মাবলম্বী বাঙালিদের মধ্যে নাখোশ শব্দটির ব্যবহার নেই বা এর শব্দার্থের সঙ্গে ধর্মের সংযুক্তিকরণও নেই।

দৌলতখানা

ধনির প্রাসাদ গৃহ। ‘দৌলতখানা’ শব্দটি সুভাষণের মধ্যে পড়ে। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম অন্তর্জগৎ হলে, দৌলতখানা শব্দটি ব্যবহৃত একটি শব্দ। অনেকসময় এইভাবে বলা হয়ে থাকে –

“গরিবের দৌলতখানায় একটু পায়ের ধুলো দেওয়া হোক।”

এখানে গরিবের দৌলতখানাটা বলার একটা ভঙ্গিমা। যা প্রায়শই মুসলিমরা বলে থাকে। হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে এই শব্দটার কোন চল নেই। এই ভঙ্গিমার মধ্যে আসলে এক ধরনের বিনয়ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ের মুখেই শোনা যায়। তবে এই শব্দটির ব্যবহার এই প্রজন্মের মধ্যে ক্রমশ কমছে।

দাওয়াই

ওষুধ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মহিলাদের অন্তর্জগৎ হলে, দাওয়াই কথাটি মুসলিম বৃদ্ধ মহিলাদের মধ্যে ব্যবহার অনেক বেশি। অনেক সময় এই দাওয়াই মৌলবি সাহেবদের পানি পড়া বা তাবিজকেও ধরা হয়। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় টোটকাকেও এই দাওয়াই এর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে দাওয়াই শব্দটি জানা থাকলেও এর ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে নেই।

দহলিজ

এটি একটি ফারসি শব্দ। দহলিজ বা দলুজ শব্দটির ব্যবহার ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে মুসলিমদের মধ্যেও। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, এই শব্দটি প্রবীণাদের মধ্যে বিশেষ করে তাদের স্মৃতিচারণার মধ্যে দহলিজ শব্দটি উঠে আসতে দেখা যায়। ‘দহলিজ’ শব্দটি মুসলিমদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। আগে বিশেষ করে অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারে অন্তঃপুরের বাইরে বাইরের লোকেদের ওঠা বসার জন্য আজকের দিনের বৈঠকখানার মতো দহলিজকে ব্যবহার করা হতো। এখানে সাধারণত বাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েদের প্রবেশ থাকতো না।

অধুনা আমাদের বাড়ি সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যৌথতার বোধ কমতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে দহলিজের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। বাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েরাও অনেক বেশি প্রকাশ্যে বা অন্য পুরুষদের সামনে বেরোয়। ফলে মুসলিম জীবনের সংস্কৃতি থেকে দহলিজ বিলুপ্ত প্রায়। তার সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহারও। কিন্তু বৃদ্ধাদের এই শব্দটির অধিভাষাতে পুরোনো দিনের সংসার পরিবারের স্মৃতি উঠে আসে।

এই শব্দ বা সংস্কৃতি কোনোটাই হিন্দু বাঙালির পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত নয়। ফলে এই শব্দটির শব্দার্থে অন্য কোন ব্যঞ্জনা যুক্ত থাকে না তাদের।

দরমা

এটি একটি ফারসি শব্দ। চাঁচ বা চাচারি থেকে থেকে তৈরি হয়। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, এই শব্দটির একটি আলাদা তাৎপর্য আছে। গ্রামের গরিব মুসলিম বাড়ির বাইরে দরমার বেড়া দেওয়া থাকে। বাঙালি হিন্দুর থেকে সার্বিকভাবে মুসলিমদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ। এছাড়া মুসলিম বাড়িতে মেয়েদের পর্দার বিষয়টা

নিয়ে সচেতনতা বেশি তুলনামূলকভাবে। ফলে, ‘দরমা’ শব্দটির ব্যবহার হিন্দুদের থেকে মুসলিমদের মধ্যে অনেক বেশি। এছাড়া তাদের জীবন-যাপনের সঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার যুক্ত বলে তাদের অধিভাষাতেও তা স্থান করে নেয়।

তাকত

শক্তি। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকত শব্দটি আমরা শক্তি অর্থে ব্যবহার করতে দেখি।

‘গোস্তু না খেলে শরীরে তাকত হবে কী করে!’

আমরা দেখতে পাই একই অর্থের জন্য শব্দ চয়নে পার্থক্য থেকে যায় বিভিন্ন ধর্মীয় ভাষা গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে। তাকত শব্দটিও এরকম একটি শব্দ। তবে এমন নয় যে তাকত এর প্রতিশব্দ ‘শক্তি’ শব্দটি মুসলিম মেয়েরা জানেন না বা বলেন না। কিন্তু বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে ‘শক্তি’ শব্দটির বদলে তাকত শব্দটা আমরা বেশি বলতে দেখি। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম আবার শক্তি শব্দটাই বেশি ব্যবহার করে তাহকে। এখানে t অর্থাৎ সময়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাহিত হয়ে শব্দ চয়ন পালটে যাচ্ছে। জোর বা শক্তি অর্থে তাকত শব্দটিই তাদের মস্তিষ্কে সঞ্চিত থাকছে।

তশতরি

এর অর্থ পিরিচ। এটি একটি ফারসি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, তশতরি হল রান্নার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি শব্দ। তশতরি বা পিরিচে সাধারণত চায়ের কাপ বা অন্য জলখাবারও পরিবেশন করা হয়। এই শব্দটি মুসলিম মহিলাদেরকেই এখন ব্যবহার করতে দেখা যায়। পুরুষদের মধ্যে বা অন্য ধর্মের মানুষদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার নেই। ফলে, মুসলিম মহিলাদের অধিভাষায় তশতরি শব্দটি একটি স্থান দখল করে

আছে যা তাদের যাপনের সঙ্গে মিশে আছে। তবে, এই শব্দটিও অন্য বেশ কিছু শব্দের মতো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কম বয়সীদের মধ্যে এই শব্দটি আর তেমন ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতে একধরনের পরিবর্তন আসছে।

তারিকা

পদ্ধতি। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, তারিকা শব্দটি একটি চালু শব্দ। অনেকসময়ই নারী পুরুষ নির্বিশেষে তারিকা কথাটি ব্যবহার করে থাকে। হিন্দুদেরকে আমরা এই কথাটি বলতে দেখি না।

এছাড়া ইসলামের সুফিবাদে ‘তারিকা’ কথাটির একটি অন্য অর্থ আছে। সুফিবাদের আধ্যাত্মিক পথটিকেও তারিকা বলা হয়। বিভিন্ন পথ ও ধারা আছে সুফিবাদে। সুফিবাদে গুরু থাকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্য। গুরু ও তার মতবাদকে তারিক বলা হয়। আর তার অনুগামীদেরকে মুর্শিদ বলা হয়। ‘তারিকা’ সম্পর্কিত এই ধারণা মুসলিমদের মধ্যে সঞ্চিত আছে। ফলে ‘তারিকা’ শব্দটির অধিভাষা ক্ষেত্র অনুসারে মুসলিমদের কাছে পালটে যাবে। নারী পুরুষের ক্ষেত্রে খুব বেশি আলাদা হয়ে যাবে না।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তারিকা শব্দের অধিভাষাতে এরকম কোনো ধারণা পাব না।

ইস্তিঞ্জা

পস্রাব ও পায়খানা করার পর অপবিত্রতা দূরীকরণের পদ্ধতিকে ইস্তিঞ্জা বলা হয়ে থাকে। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, ইস্তিঞ্জা বা এস্তেঞ্জা ব্যবহৃত একটি শব্দ। হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার নেই। মুসলিম সমাজে পাক নাপাকের ধারণা খুবই দৃঢ়। কারণ তার সঙ্গে প্রতিদিনের নামাজ কোরান পাঠ ইত্যাদি ধর্মাচারগণগুলো যুক্ত হয়ে আছে। ইস্তিঞ্জা

করার পর ওজু না করে নামাজ পড়া যায় না। আবার ইস্তিঞ্জা করলে আগের করা ওজু ভেঙে যায়। ফলে দৈনন্দিন জীবনে এই শব্দটির অধিভাষার সঙ্গে ইসলামিক ধর্মাচরণ করতে পারা না পারার ধারণা যুক্ত হয়ে থাকবে। ধার্মিক মুসলমানদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি। তবে মুসলিম মেয়েরা প্রাকশ্যে বিশেষ করে পুরুষদের সামনে এই শব্দটি উচ্চারণ করে না। অর্থাৎ মেয়েদের অধিভাষাতে এই শব্দটি একটি লজ্জা বোধ নিয়ে আসে।

বালা-মুসিবত

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব ‘বালা মুসিবত’ কথাটি খুবই প্রচলিত একটি কথা। সাধারণত অন্য বাঙালিদের মধ্যে আমরা এর ব্যবহার প্রায় দেখি না বললেই চলে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আপদ-বিপদ রোগ ব্যাধি বা আশুভ কিছু ঘটাকে বালা- মুসিবত বলা হয়ে থাকে। একজন মুসলিমের এই শব্দের অধিভাষা যদি উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তাহলে দেখব, আল্লাহর স্মরণ নেওয়া আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার খুব সাধারণ বিষয় হিসেবে ধরা দেবে। বালা-মুসিবতে হজরত মুহম্মদ আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতেন যেভাবে ধার্মিক মুসলমানও সেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া চান। এটা নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু মেয়েরা আপদে বিপদে বা প্রিয়জনদের রোগ-ব্যাধিতে বাড়িতে বসে তাদের সেবা করার সঙ্গে সঙ্গে দোয়া বেশি করে থাকে।

তায়াম্মুম

ইসলামে ‘তায়াম্মুম’কে ওজু বা গোসলের বিকল্প পন্থা হিসেবে দেখা হয়। যদি কাছাকাছি জল না থাকে বা এতো অল্প জল থাকে তাতে পানীয়ের সংকট হতে পারে বা জল আনতে জীবনের আশঙ্কা বা বিপদ ঘটতে পারে তবে পবিত্র মাটি দিয়ে ঘষে নিয়ে পাক হওয়ার পদ্ধতিকে ইসলামে তায়াম্মুম বলে।

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে তা শরিয়ত নির্দেশিত বিশেষ এক পাক হওয়ার পদ্ধতি বোঝায়। ইসলামে পাক নাপাক এর ধারণা খুবই তীব্র। ফলে তায়াম্মুমও উপযুক্ত প্রয়োজনীয় অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই তায়াম্মুম গুরুত্বপূর্ণ তাই। বাঙালি মুসলিমদের ভাষা প্রয়োগে অনেক উর্দু ফার্সি আরবি শব্দের ব্যবহার আমরা পাব। যা সচরাচর বাঙালি হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ভাষায় আমরা দেখব না। অনেক ক্ষেত্রে সেই সব শব্দের অর্থও তারা জানেন না। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যেও ধীরে ধীরে এই সমস্ত শব্দগুলির ব্যবহার কমে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে প্রবীণ মানুষরাই এই শব্দগুলির একমাত্র বাহক। আর এদের মধ্যে আবার প্রবীণারা সবথেকে বেশি সংরক্ষণ করেন এই সমস্ত শব্দগুলো। $M_{w,t}$ এর এই কাঠামোতে তাই বেশ কিছু শব্দের t = সময় ভেদে অধিভাষা পৃথক হয়ে পড়বে।

আবার কিছু শব্দের প্রয়োগ এক থাকলেও সেই ভাষা সম্পর্কিত চিন্তা চেতনা সংস্কৃতির পার্থক্য সূচিত হওয়ায় একই শব্দের অধিভাষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে আলাদা হয়ে যায়।

তসবিহ -

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে ‘তসবিহ’ শব্দটির অধিভাষাতে আমরা দেখব, আল্লাহর নাম বা দোয়া দরুদ পাঠের সময় গণনার জন্য তসবিহ ব্যবহার করা হয়।

এখানে আমরা খেয়াল করব, তসবিহ মুসলিমদের জন্য একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র জিনিস। E_m বা অধিভাষা এখানে আরো গভীর তাৎপর্য বয়ে আনছে।

মুসলিমদের কাছে তসবিহ আল্লাহকে স্মরণ করার, ইহকালে সৎ পথে চালিত করার সহায়ক। আবার পরোকালে জান্নাত পাওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আস্থা প্রকাশে সওয়াব অর্জনে তসবিহের গুরুত্ব আছে। এই তসবি

নানারকম হয়। ফলে মুসলিমদের কাছে এই নির্দিষ্ট ও বিশেষ অধিভাষা

suggestive world এর দিকে নির্দেশ করে থাকে। এক্ষেত্রে E_o E_m^s এর দিকে

নির্দেশ করছে।

জিকির

আল্লাহর নাম জপ করাকে জিকির করা বলে। E_o বা object language ‘জিকির’ শব্দের অধিভাষাতে আমরা দেখব $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, জিকির করা শব্দটির একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে তাদের কাছে যা সাধারণভাবে উপলব্ধি করা নাও যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই শব্দটির অধিভাষাতে আরো এমন কিছু ব্যক্ত হয় যা তাদের একেবারে নিজস্ব জগতকে বা suggestive world কে সূচিত করছে। জিকির করা খুবই নেক কাজ বলে স্বীকৃত মুসলিম সমাজে। আল্লাহর প্রতি নিজের সমস্তকিছু উৎসর্গ করে ভক্তিভরে জিকির করলে আল্লাহ একদিকে কল্যাণ করে ও সওয়াব দান করেন। এটি খুবই পবিত্র কাজ।

খতম তারাবি

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে E_o ‘খতম তারাবি’ শব্দের E_m এ উঠে আসবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৃহত্তম উৎসব ইদের আগে রমজান মাসের কথা। রমজান মাসে কোরান তলোয়াত করা ও তারাবির নামাজ পড়া সুন্নত। তারাবি শব্দটা বহুবচন। তারবিহা শব্দটি একবচন। এর আভিধানিক অর্থ হল বিশ্রাম স্বস্তি বা প্রশান্তি। রমজান মাসে এশার নামাজের পর ২০ রাকাত নামাজ পড়া হয় একে তারাবি নামাজ বলা হয়। পুরুষদের তারাবির নামাজ জামাতে পড়া সুন্নত আর মেয়েরা বাড়িতে পড়ে থাকে।

খোদা কসম / আল্লাহর কিরে

এটি একটি প্রতিজ্ঞাসূচক শব্দ যা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ব্যবহার করে থাকে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই কিছু শপথমূলক শব্দ আছে। এই শব্দগুলো সাধারণত উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বরের নাম নিয়েই করা হয়ে থাকে। কারণ ঈশ্বরের নামে শপথ করে মিথ্যে কথা বললে বক্তার সবথেকে বেশি পাপ হতে পারে যা ক্ষমার অযোগ্য। তাই ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করে বলা কথা সবথেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। $M_{w,t}$ হলে w = মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলে, খোদার কসম বা আল্লাহর কিরে শব্দগুলি তাদের শপথ বাক্য। কিন্তু w = হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত হলে, আল্লাহর কিরে বা খোদার কসম শব্দটি তাদের পরিচিত নয় বা গুরুত্বপূর্ণও নয়। হিন্দুদের কয়েকটি শপথ শব্দ হল – মা কালির দিব্যি, বা বিভিন্ন দেবতার নাম উল্লেখ করে শপথ করা হয়। আল্লাহর মহিমা বা প্রতাপে তাদের আস্থা ভরসা বা বিশ্বাস কিছুই নেই। তাই তাদের কাছে এই শব্দদুটির অধিভাষা অন্য কোনো ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে না।

আর একটি বিষয় আমরা খেয়াল করি, মেয়েদের মধ্যে দিব্যি বা শপথ করার প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি, মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব যা আমাদের এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ। মেয়েদের নিজেদের কাছে বা অন্যের কাছে নিজেকে প্রমাণ করার দায় অনেক বেশি থাকে। তাই তাদের মধ্যে শপথ করে নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রবণতাও বেশি। তাই এই শব্দদুটির গুরুত্ব ও ব্যবহার মুসলিম মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি।

দীনদার

ধার্মিক। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, দীনদার বলতে, নামাজ রোজা করা শরিয়তের বিধি অনুসারে যারা জীবন পালন করেন তাদেরকে দীনদার বলে। প্রত্যেক ধর্মের ধার্মিকের

সংজ্ঞা আলাদা আলাদা। ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেই একে দীনদার বলা হয়। অন্য কোন ধর্মের ধার্মিকের ক্ষেত্রে তাকে দীনদার বলা বলা হয় না। অর্থাৎ দীনের পথে যারা চলে থাকেন, আল্লাহর পথে যারা চলে থাকেন। ‘দীনদার’ শব্দের অর্থ ধার্মিক হলেও তাই শুধুমাত্র মুসলিম ধার্মিকের ক্ষেত্রেই দীনদার শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দাওয়াত / জিয়াফত

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে দাওয়াত বা জিয়াফত শব্দটি খুবই পরিচিত। নিমন্ত্রণ করা অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হিন্দু বাঙালিকে আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করতে দেখি না।

এছাড়া মুসলিমদের ‘জিয়াফত’ বা ‘দাওয়াত’ শব্দের অধিভাষাতে যে সমস্ত পদের বা রান্নার ধারণা থাকবে তা অনেকক্ষেত্রেই শুধু তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন গো মাংস ও বিভিন্ন মাছ সবজী বা ডিম রান্নার পদ্ধতি খানিক ভিন্ন হয়। বা বিরিয়ানি লাচ্চা সীমাই এর আয়োজন হয় যা বাঙালি মুসলিমদের নিজস্ব সংস্কৃতি।

কেতাব

কিতাব শব্দটি আরবি উর্দু নেপালি হিন্দি ভাষায় সাধারণভাবে ‘বই’ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে আমরা খেয়াল করব, E_o = কিতাব হলে এর E_m বা অধিভাষাতে আমরা শুধু ‘বই’ এই ধারণাটুকুই পাব না। কিতাব বাঙালি মুসলিমরা ব্যবহার করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় পুস্তকগুলির ক্ষেত্রে। এছাড়া অন্য সময় তারা বইই বলে থাকে। বাঙালি হিন্দুরা সচরাচর ‘কিতাব’ শব্দটি ব্যবহার করে না। বাঙালি মুসলিমদের কাছে ‘কিতাব’ শব্দটি খুবই পবিত্রতার শ্রদ্ধা-ভক্তির বোধ আনে। ওজু না করে বা নাপাক অবস্থায় এই কিতাব তারা স্পর্শ করেনা। আর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগত হলে ‘কিতাব’ সম্পর্কে

আমরা দেখব আরও বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা যুক্ত হয়। যেমন ঋতুমতী হলে মেয়েরা ‘কিতাব’ স্পর্শ করতে পারে না। এছাড়া মাথা আবৃত করে সাধারণত তারা কিতাব স্পর্শ করে। ফলে তাদের অধিভাষাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ কোন বইয়ের সীমানা ছাড়িয়ে আমপারা, কোরান এর মতো পবিত্র ধর্মীয় পুস্তকের ধারণা ধরা দেয়।

ইবলিশ

ইবলিশ হল ইসলামিক মিথের একটি চরিত্র। সাধারণত ইবলিশ বলতে শয়তানকে বোঝানো হয়। $M_{w,t}$ এর $w =$ মুসলিম সমাজ হলে, ইবলিশ ইসলামিক মিথের চরিত্র। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, খ্রিস্টান বা ইহুদি মিথেও ইবলিশকে নিয়ে মিথ আছে। যেহেতু এই তিনটি আব্রাহামিক ধর্মের মধ্যে অনেক মিথ একরকম। তবে, ‘ইবলিশ’ কথাটি অনেক জায়গাতেই অনেক ধর্মের মানুষের কাছে ‘শয়তান’ এর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

তবে, E_o ইবলিশ হলে, মুসলিম সমাজে এই শব্দটির অধিভাষাতে আমরা শুধু শয়তান ছাড়াও মিথের গল্পটা উঠে আসে। আজাজিল আল্লাহর কথা অমান্য করে আদম বা মানুষকে সেজদা দিতে অস্বীকার করে মাটি থেকে তৈরি বলে। তখন আজাজিলকে আল্লাহ এই অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ বেহেস্ত থেকে বের করে দেন। কিন্তু যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছ থেকে ইবলিশ বলে যে সে মানুষদেরকে বিপথে চালিত করার শক্তি পেতে চায় আর কেয়ামত পর্যন্ত স্বাধীনতা চায়। সেই দাবি মঞ্জুর করা হয়। ফলে শয়তান সবসময় চেষ্টা করে মানুষকে অন্যায়ের পথে চালিত করতে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দিতে। ফলে ‘ইবলিশ’ এর গল্প মুসলিমদের কাছে একটি শিক্ষণীয় অধ্যায়ও। আর ইবলিশের কাছ থেকে শয়তান এর মনোভাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

মাগফেরাত

শব্দটির অর্থ মুক্তি বা মোক্ষ। এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, মাগফেরাত শব্দটি বহুল প্রচলিত না হলেও ধার্মিক মুসলিমদের কাছে পরিচিত শব্দ। রমজান মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রথম দশদিন রহমতের দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাতের আর শেষ দশ দিন নাজাত। মাগফিরাতের মূল শিক্ষা হল ক্ষমাশীল হওয়ার এবং আল্লাহর কাছে তাঁর কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার। আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং তিনি সবাইকে ক্ষমাশীল হতে বলেন। আল্লাহর কাছে মন থেকে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা পাওয়া যায়।

অর্থাৎ ক্ষমা চাওয়ার ও ক্ষমা করে দেওয়ার শিক্ষা হল মাগফেরাতের শিক্ষা যার উপর ইসলাম জোর দিয়ে থাকে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই শিক্ষা প্রয়োজনীয় ইসলামে।

খাতির

এটি একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হল সম্মান করা বা আদর করা। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব, এই শব্দটি বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। তবে হিন্দু বাঙালিও এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু লেখ্য ভাষায় যত তারা এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে মৌখিকে তত নয়। কিন্তু মুসলিম পরিবারে মৌখিক কথাতে দৈনন্দিন বার্তালাপে অহরহ আমরা এই শব্দটি শুনতে পাব।

কুদরত

‘কুদরত’ শব্দের অর্থ মহিমা অলৌকিক ক্ষমতা। $M_{w,t}$ তে, w = মুসলিম সমাজ হলে আমরা দেখব, এই শব্দের অধিভাষাতে বা metalanguage এ কুদরত বলতে আল্লাহর কুদরতের কথাই তারা মনে করে থাকে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী, আল্লাহ অদ্বিতীয়। তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

সমস্ত কিছু তাঁর নির্দেশেই হয়ে থাকে। ফলে কুদরত বা মহিমা সবসময়ই আল্লাহর। এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মহিমা বা অলৌকিক ক্ষমতা বোঝাতে কুদরত শব্দটি ব্যবহার করা হয় না।

এজিন

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, E_0 যদি ‘এজিন’ হয়, তবে এজিন শব্দের অধিভাষাতে আমরা দেখব, মুসলিম বিয়েতে মেয়েদের সম্মতি দানকে এজিন বলা হয়। মুসলিম বিয়ে একটি চুক্তি। এই চুক্তিতে ছেলে বা মেয়ের সম্মতি প্রয়োজন হয়। কাবিননামা পড়ে শোনানো হয় ছেলে আর মেয়েকে। এটা বিয়ের চুক্তিপত্র যা ইসলামিক নিয়ম রীতি অনুযায়ী লেখা হয়। ফলে ‘এজিন’ শব্দের অধিভাষাতে আমরা ইসলামিক বা শরিয়তি বিধিগুলো উঠে আসতে দেখব।

ফদর ফদর করা –

মেয়েদের ভাষায় আমরা খেয়াল করব যে, ভাষার ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি সৃজনশীল। অনেক শব্দ তারা অন্য শব্দের অনুকরণে অনায়াসে গঠন করে ফেলে। এছাড়া ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রতি তাদের পক্ষপাত রয়েছে। তাদের ভাষার মধ্যে আমরা অজস্র ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার পাব। যা অনেক সময় পুরুষরা ব্যবহার করে না।

‘ফদর ফদর’ কথাটি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত হতে দেখব আমরা। E_0 ‘ফদর ফদর’ হলে এর E_m বা অধিভাষাতে আমরা পাব, অবান্তর বাজে বকা বা যুক্তিহীন কথাকে বোঝাতে তারা ফদর ফদর করা বলে থাকে। এটা খানিক বক্তার প্রতি তির্যক মন্তব্য বা মুখঝামটোর মতো।

সড়াং সড়াং

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, E_0 = সড়াং সড়াং হলে E_m বা অধিভাষাতে দেখব কোনও বাধাহীন ভাবে কিছু গিলে ফেলা বা খেয়ে ফেলা, কোনো জায়গা থেকে নেমে

যাওয়া ইত্যাদি বোঝাতে সড়াং সড়াং শব্দটি প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে। তবে এটি আমরা দেখব হিন্দু মহিলারাও ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষরা এই শব্দটি বলেন না তা নয়। তবে মেয়েদের কথায় এর বহুল ব্যবহার।

ধ্বন্যাঙ্ক শব্দের ব্যবহার

বকবক, পটপট, পিটপিট, সাটসাট, খটাং খটাং, মড়মড়, নড়নড়, কড়কড়ে, চড়চড়, তরতর খানখান, খটখট, মটমট, ফড়ফড়, ম্যাড়ম্যাড়, ধ্যাড়ধ্যাড়, ক্যাটকাট, চ্যাটাং চ্যাটাং, ভুসভুস, ভুরভুর, ভোঁসভোঁস, খসখস, টসটস, ঘিসঘিস, ঘিনঘিন, মিনমিন, কিনকিন, চিনচিন, ঝিনঝিন -ঝনঝন, ঝমঝম, কনকন, ঘুটঘুট, টনটন, খনখন, খিনখিন, মিটমিট, চিটচিট, খিটখিট, ছটছাট, খুটখাট, পুটপাট, কাঠকাঠ, খরখর – ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ ধ্বন্যাঙ্ক শব্দের ব্যবহার আমরা মেয়েদের দৈনন্দিন কথোপকথনে অহরহ দেখতে পাব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই প্রবণতা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়া ছড়া প্রবাদ বা গান মেয়েদের মৌখিক ভাষায় অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মেয়েদের ভাষায় নাটকীয়তার অনেক উপাদানও পাওয়া যায়। মেয়েদের ভাষার এই দিকটি একটি ভিন্ন গবেষণার দাবি রাখে।

ওহি

এটি একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল গোপন ইশারা যা ইশারাকারী ও গহণকারী ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। তবে $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে E_o = ওহী হলে তার E_m হবে আল্লাহর বাণী যা নবীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। এছাড়া অন্য কোনো বাণী বোঝাতে ওহি শব্দটির ব্যবহার নেই। এ প্রসঙ্গে কোরানে বলা হচ্ছে- ^{২৬} ইব্রাহীম, ঈসমাইল ইসহাক এবং তাঁর বংশধর ঈসা আইয়ুব, ইউনুস, হারুন, সুলাইমানের উপর ওহি

অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোরানের অন্যত্র বলা হচ্ছে,^{২৭} আল্লাহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন না। সর্বদা ওহি মারফৎ আদান-প্রদান চলে।

ওয়াজ

এই শব্দটির অর্থ হল উপদেশ। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, ওয়াজ শব্দটি সাধারণ উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হতে আমরা দেখব না। এই শব্দটি মুসলিমদের কাছে তাৎপর্যবাহী।

সূরা আন নাহলের ১২৫ নং আয়াতে আছে^{২৮} – অন্যদেরকে সদুপদেশ দিয়ে ধর্মের পথে আনানোর। মুসলিমরা ওয়াজ বলতে ধর্মীয় উপদেশকেই বুঝে থাকে। ধর্মের সঠিক অনুশাসন ব্যাখ্যা করা ও আল্লাহর রাস্তায় মানুষজনকে নিয়োজিত করা এর লক্ষ্য। বিভিন্ন অঞ্চলে এই ওয়াজের আয়োজন করা হয়। মূলত হাফেজ বা মৌলবি বা ধর্মীয় পীররা এখানে এসে বক্তব্য দেন। যেখানে কোরান হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই ওয়াজ শোনা এবং শোনানো দুইই পুণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়। তাই ওয়াজ হলে অন্য অঞ্চলের আত্মীয় স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হয় আসার জন্য। অনেক সময়ই এই ওয়াজকে কেন্দ্র করে মেলা বসে থাকে। তবে এই ওয়াজ দেন সবসময় একজন পুরুষই। মহিলারা বেশিরভাগ সময়েই সর্বসমক্ষে না গিয়ে আড়াল থেকে বা মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত জায়গা থেকে এই ওয়াজ শুনে থাকে।

বলা বাহুল্য, এই ওয়াজে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে অনেক সময়ই কোরান হাদিসের কথা বিকৃত করে বলা হয়ে থাকে। ‘ওয়াজ’ শব্দের অধিভাষাতে তাই একজন মুসলিমের ধর্ম সম্পর্কে, ওয়াজদানকারী ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের সমীহ সঞ্চিত থাকে।

কদমবুসি

সালাম করা। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, কদমবুসি শব্দটির অর্থ হল পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। কদমবুসি বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। ইসলামে আল্লাহ

ছাড়া কারোর কাছে মাথা নত করার নিয়ম নেই। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সেজদা করা যায় না। মুসলিমদের মধ্যে তাই আমরা দেখব, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করার চল খুব কম। কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে পীর মাজারের প্রভাব হয়েছে সেখানে দরগা মাজারে সেজদা করার প্রথা আছে। ফলে সুফিদের প্রভাবে অনেক জায়গাতে আমরা কদমবুসি করার রেওয়াজ দেখব। আবার হিন্দু ধর্মের প্রভাবেও কদমবুসি করতে দেখা যায়। কিন্তু শরিয়ত পন্থীরা এটাকে শিরক বলে যা ইসলামে অমার্জনীয় অপরাধ। অর্থাৎ, ‘কদমবুসি’ শব্দের অধিভাষাতে মুসলিম মেয়েদের অধিভাষা সবার ক্ষেত্রে একরকম হবে না।

কাজা

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, কাজা শব্দটি কাজা নামাজের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। ইসলাম ধর্মের মূল পাঁচটি কাজের একটি হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত বা বার নামাজ পড়া। কোনো কারণে একটা সময়ের নামাজ না পড়তে পারলে তা কাজা হয়ে যায়। তারপরে যখন না পড়তে পারার কারণ তিরোহিত হয় তখন সেই নামাজ পড়ে নিয়ে তবে পরবর্তী সময়ের নামাজ পড়তে হবে। নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই কাজা নামাজ পড়ার বিধান রয়েছে।

কাজা শব্দটি মুসলিম ব্যতীত অন্য বাঙালিরা ব্যবহার করেন না।

কিয়ামত

এটি একটি আরবি শব্দ। আরবি ‘কিয়াম’ শব্দ থেকে শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হল থেমে যাওয়া বা উঠে দাঁড়ানো। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে E_0 ‘কেয়ামত’ শব্দটির E_m বা অধিভাষাতে উঠে আসবে কোরান কথিত শেষ বিচারের দিনের কথা। এই দিন পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সমাধি থেকে মৃতদের তুলে হাশরের ময়দানে তাদের

পাপ পুণ্যের বিচার হবে। একে কেয়ামত বলে। কোরানে অনেকবার কেয়ামতের দিনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে।

প্রায় সমস্ত ধর্মই পরোকালের কথা বলে। ইসলাম সহ আব্রাহামিক অন্যান্য ধর্মগুলি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন। কেয়ামতের বিচারের উপর নির্ভর করেই জান্নাত বা জাহান্নাম বাস হবে। তাই ইহকালের জীবনে আল্লাহর প্রতি ইমান না নেক পথে না চললে তার ফল ভয়াবহ। কেয়ামত শব্দটির সঙ্গে তাই পরবর্তী জীবনের এই ভয়াবহতার ছবি যুক্ত হয়ে থাকে। আর থাকে এই তাৎক্ষণিক নশ্বর জীবনের তুচ্ছতা।

কারবালা

$M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে কারবালা শব্দটি তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক শব্দ। কারবালার মাঠে হাসান হোসেনের মৃত্যু ঘটে। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে মুসলিমরা মহরম উৎসব পালন করে থাকে। তাই কারবালার স্মৃতি তাদের কাছে শোকের। অন্যদিকে অন্য ধর্মের মানুষদের জন্য কারবালা কোনো অনুভূতি সেভাবে বয়ে আনেনা।

তাই কারবালা শব্দের অধিভাষা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

কুলখানি

মৃত ব্যক্তির দফনের চতুর্থ দিনে কুলখানি হয়। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে কুলখানি মৃত ব্যক্তির শান্তি কামনা করে ধর্মীয় রীতি মেনে অনুষ্ঠান। এখানে দোয়া দরুদ পাঠ করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখব, মেয়েদের জন্য আলাদা স্থান থাকে বা তারা আড়ালে থেকে দোয়া করেন। প্রকাশ্যে পুরুষদের সঙ্গে তারা বসেন না। তাই ‘কুলখানি’ শব্দের অধিভাষা একজন পুরুষ মুসলমান ও একজন নারী মুসলমানের জন্য এক নয়। অন্তঃপুরে বেশি আওয়াজ না করে তারা বেশিরভাগ সময়ই শ্রোতার ভূমিকা পালন করেন। সক্রিয় ভূমিকায় তাদের দেখা যায় না। কুলখানির পর যে খাবার বিতরণ করা হয় তা অনেকসময় লোকসংখ্যা

কম হলে বাড়ির মেয়েরা আয়োজন করে থাকে। কুলখানিতে তাই পুরুষ মহিলা অংশগ্রহণ করলেও ‘কুলখানি’ সম্পর্কে দুজনের অধিভাষার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা দেবে।

শুকরিয়া

এর অর্থ হল ধন্যবাদ জ্ঞাপন বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে শুকরিয়া শব্দটি খুবই পরিচিত শব্দ। অনেকসময়ই নিজেদের ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় শুকরিয়া শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া জীবনে আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন বা কৃতজ্ঞ থাকার কথা আমরা কোরানেও পাব।^{২৮}

মুসলিমরাও তাদের জীবনের সমস্ত শুভ ও কল্যানকর কাজে আল্লাহকে স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করে থাকে। শুকরিয়া আদায়ের দোয়াও আছে কোরানে-^{৩০}। কেউ কেউ এই সূরা বলে শুকরিয়া আদায় করে আবার অনেকেই ‘আল্লাহ শোকর তোমার কাছে’ও বলে থাকে।

জীবনের সমস্ত সমৃদ্ধি ও ভালো সমস্ত কিছু আল্লাহর ইচ্ছেতেই হয়ে থাকে। তাঁর নির্দেশে আবার এক মুহূর্তে সব শেষও হয়ে যেতে পারে। তাই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। মুসলিম নারী পুরুষ উভয়েই আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে থাকে। শুকরিয়া শব্দের অধিভাষাতে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের এই ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ধার্মিক মেয়েদের উঠে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অন্য মানুষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনে তারা অনেকসময় অন্য শব্দ ব্যবহার করলেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তারা সবসময়ই ‘শোকর’ বা ‘শুকরিয়া’ শব্দটিই ব্যবহার করে থাকে।

আড়ি খেজলত

এর অর্থ হল উদ্দেশ্যমূলক ভাবে কিছু করে তা না জানার ভান করা। $M_{w,t}$ তে w = উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, শব্দটি তাদের পরিচিত। এই শব্দটির ব্যবহার

ছেলেদেরকে খুব বেশি করতে দেখা যায় না। কিন্তু মেয়েরা প্রায়শই ব্যবহার করে থাকে।

যেমন-

“আড়ি খেজলত করে শুয়ে আছে। কিছুই হইনি। উঠলি কাজ করতি হবে না!”

“বাদ দে তো। সব শুনতি পেয়েছে। আড়ি খেজলত করে করেনি”

বেশিরভাগ সময় মেয়েদের উদ্দেশ্যেই মেয়েদের এই শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। অর্থাৎ E_0 আড়ি খেজলত হলে, E_m এ মেয়েদের একান্ত ব্যবহৃত ভাষা যা বেশিরভাগ সময় তারা বলে থাকে মেয়েদের কোনো ভান বোঝাতে। মেয়েদের আধুনিক সাজ-সজ্জার যে ট্রেন্ড তার সঙ্গে শরিয়তি যে নির্দেশ তার মধ্যে অনেকসময় দ্বন্দ্ব সংঘাত দেখা যায়। যেমন - ইসলামে বা ধর্মীয় নির্দেশের মধ্যে বেশ কিছু এমন প্রসাধন ও অলংকারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আছে।
যেমন -

১। টিপ পরা অবস্থায় অজু বা নামাজ হয় না।

নখ পালিশ পরে থাকলে জল নখে পৌঁছাতে পারে না তাই ওজু করার আগে এটি তুলে ফেলতে হয়। কিন্তু নখে মেহেন্দি পরা যায়। কারণ তা নখের উপর কোনো স্তর তৈরি করতে পারেনা।

লিপসটিক- ওজুর সময় ঠোঁটে লিপসটিক পরা যায় না।

কাজল/ সুর্মা - ইসলাম অনুমোদিত

এছাড়া পরচুলা ,মেকআপ ,মুখমণ্ডল রঙ্গিন ও আকৃতি পরিবর্তন করা বা পায়ের নূপুর পরতে ইসলাম উৎসাহিত করেনা। যা কিছু পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নারীদের জন্য প্রায় নিষিদ্ধ। ফলে $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব, মেয়েদের সাজগোজ

বিষয়ে সেখানে কিছু বিধান আছে। নিজের স্বামীর সামনে বা বাড়ির ভিতরে মেয়েদের সাজগোজে আপত্তি না থাকলেও যা কিছু ইসলামের ধর্মীয় আচরণ পালনে পরিপন্থী সেগুলো এবং যা অন্য পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে তা নিষেধ বলে মনে করা হয়।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করব, যে এই নিষেধাজ্ঞা এখনকার বাঙালি মুসলিম মেয়েরা অনেকেই তেমন মানে না। বরং প্রবীণাদের মধ্যে এক ধরনের ধর্ম ভীরুতার জন্য তাদেরকে আমরা হিজাব ইত্যাদি পরতে অনেক সময় দেখি। কিন্তু অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে খুব রক্ষণশীল পরিবার ছাড়া খুব বেশি কড়াকড়ি করা হয় না। তাই যেসব পরিবারে একটু কড়াকড়ি থাকে সেসব মুসলিম মেয়েদের অধিভাষাতে সাজসজ্জা সম্পর্কে একদিকে চোরা লোভ থাকে অন্যদিকে ধর্মের ভয় ও পরিবার ও সমাজের চোখে নিন্দনীয় না হয়ে ওঠার দ্বন্দ্ব দেখা যায়।

পোষাকের ক্ষেত্রেও এই দ্বন্দ্ব আরো বেশি দেখতে পাই আমরা। মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান নির্দিষ্ট। সেখানে তাই আধুনিক ও হাল ফ্যাশানের জামাকাপড়ের একটা বিরোধ দেখা যায়। তবে t বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদেরকে আমরা অনেক বেশি আধুনিক জামাকাপড়ের প্রতি ঝুঁকতে দেখি। প্রবীণারা সেক্ষেত্রে অনেক বেশি ধর্ম-ভীরু ও পরিবর্তনের প্রতি বিমুখ। তাই আধুনিক পোশাক সম্পর্কেও মুসলিম মেয়েদের অধিভাষা অনেকসময়ই একমাত্রিক নয়। এবং একটা নেতিবাচক মনোভাবও লক্ষ্যণীয়।

হজ্জ

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, হজ্জ হল আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য থাকলে হজ করা নারী পুরুষের জন্য ফরজ বা আবশ্যিক। হজ্জ করার জন্য আরব দেশের জন্য মক্কা নগরী ও

তার সন্নিহিত অঞ্চলে গমন করতে হয়। সমগ্র বিশ্ব থেকে মুসলিমরা হজ্জ করতে আসেন এখানে। আরবি জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজের জন্য নির্ধারিত সময়।^{৩১}

পুরুষরা একা হজ্জে যেতে পারেন। কিন্তু মেয়েদের জন্য একা হজ্জে যাওয়ার নিয়ম নেই। তাদের সঙ্গে একজন মাহরাম থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, $M_{w,t}$ তে $w =$ মুসলিম মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত হলে, সেখানে আমরা দেখব, শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকলেও মেয়েরা হজ্জ করতে যেতে পারে না। তাদের ক্ষেত্রে যোগ হচ্ছে আরো একটি শর্ত। সেটি হল মাহরাম সঙ্গী থাকা প্রয়োজন। একটা নারীর জন্য তাঁর প্রথম মাহরাম সঙ্গী হল তাঁর স্বামী। মাহরাম না থাকলে হজ্জ করা মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় ইসলামে। এছাড়া হজ্জে ইহরাম করতে হয় নারী পুরুষ উভয়কেই। সেখানে পুরুষরা পরেন সেলাই বিহীন দুটো সাদা কাপড়। কিন্তু মেয়েরা স্বাভাবিক শালীন পোশাকই পরে থাকেন। তবে মেয়েদের ইহরামেও পরপুরুষদের সামনে চেহারা খোলা নিষেধ।

তবে নিকাব পড়া নিষেধ থাকে। মাথার উপর থেকে একটা কাপড় ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই E_o যদি হজ্জ হয়, তার E_m বা এর অধিভাষা আমরা দেখব, ছেলে ও মেয়েদের জন্য সমান নয়। তাদের হজ্জে নিয়ম-কানুন বেশ কিছু ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ফলে ধর্মীয় রীতিতে নারী পুরুষের অধিভাষার জগৎ আলাদা হয়ে যাচ্ছে একটি শব্দকে কেন্দ্র করে।

হাজী

হজ্জ করার পর সমাজে নারী পুরুষ নির্বিশেষে মুসলিম সমাজে একটি বিশেষ পদ মর্যাদা লাভ করে। $M_{w,t}$ তে $w =$ মুসলিম সমাজ হলে, E_o হাজী হলে এর E_m এ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষরা তাদের প্রতি এক ধরনের সম্বন্দের সঙ্গে দেখে। এছাড়া হজ্জ করে আসার পর তাদের

জীবন যাপনে পোশাক-পরিচ্ছদে কথাবার্তাতেও এক ধরনের পরিবর্তন আসে। অনেক সময় তারা পাড়া বা গোষ্ঠীর মোড়ল হয়েও ওঠে। ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে তারা উপদেষ্টা হয়ে থাকে।

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে, হাজী হলে আমরা দেখব যে, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ বেশিরভাগ সময় পালটে যায়। অনেকেই শাড়ী ছেড়ে সালওয়ার কামিজ সঙ্গে ওড়না বা বোরখা পরে থাকে। আরব থেকে ঘুরে এসে তাদের মধ্যে এক ধরনের cultural shift ঘটে। যেটা তারা অনেকসময় বাড়ির অন্য সদস্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে। পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে তারা আরবের মুসলিম সংস্কৃতির সম্পদের গল্প বলে। মেয়েদের উপর বোরখা পড়ানো, কোরান পড়ায় অভ্যস্ত করে তোলা এইগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা করা হয়। তাদের সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আরবের ইসলামিক সংস্কৃতি দেখে সেটাকেই তারা আদর্শ হিসেবে মনে করে। তার প্রভাব শুধু তাদের সংস্কৃতিতে নয় তাদের ভাষাতেও পড়ে। তারা অনেকসময় দৈনন্দিন জীবনযাপনেও আরবি শব্দ বেশি ব্যবহার করতে থাকে। ধর্মীয় উপদেশ আরও কঠোর ভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে। এদেশে হজ্ব করতে যায় বেশিরভাগ সময় প্রবীণ মুসলমানরা। ফলে তারা হজ্ব করে আসার পর বাকি জীবনটা ধর্মের প্রতি অভিনিবেশ করে কাটিয়ে দেয়।

আমিষ নিরামিষ

$M_{w,t}$ তে w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে, ‘আমিষ’ ‘নিরামিষ’ শব্দের অধিভাষা বাঙালি হিন্দুদের থেকে পৃথক হয়ে পড়বে। বাঙালি হিন্দু বাড়ির হেঁসেলের রন্ধন শৈলী ও বিধি ব্যবস্থা মুসলিম হেঁসেল থেকে পৃথক। মুসলিম খাবার-দাবারে পিঁয়াজ রসুন আদার ব্যবহার যথেষ্ট। সেখানে এগুলোকে আমিষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আমিষ বলতে সাধারণভাবে মাছ মাংস ও ডিমকে বোঝানো হয়ে থাকে। এছাড়া আমিষ – নিরামিষ ছোঁয়াছুঁয়ি বা বিভেদের

কোন কারণও ইসলাম ধর্মে নেই। নিরামিষ বিভিন্ন পদে মাছের কাঁটা বা মাংসের চর্বি দিয়ে রান্না করলেও তাদের কাছে সেই পদগুলো আমিষ বলে বিবেচিত হয় না। এছাড়া আমিষ নিরামিষ সংক্রান্ত কোন ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা কোনো বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো বিশেষ প্রকার রান্নার কোনো নির্দেশও ইসলামে নেই। তাই আমিষ নিরামিষ সম্পর্কে আলাদা কোনো সচেতনতা বা সতর্কতাও মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায় না। বাঙালি হিন্দুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিন্তু একেবারেই এরকম নয়। অনেক হিন্দু পরিবারের মহিলারাই বিশেষ করে বিধবারা অনেকসময় ব্রত বা উপবাসের সময় নিরামিষ আহার করে থাকেন যা পুরুষরা করেন না। কিন্তু মুসলিম মেয়েদের জন্য আলাদা করেও কোনো নিরামিষ আহারের নির্দেশ কোনো অবস্থাতেই নেই। ফলে তাদের অন্তর্জগতে নিরামিষ আমিষ খাবার সম্পর্কে বিভেদের ধারণা নেই।

মেয়েদের ভাষায় রূপক ও সংকেত

মেয়েরা কথা বলার সময় ভাষায় অনেক বেশি নমনীয়তা পেলবতা রক্ষা করার চেষ্টা করে। এছাড়া বেশ কিছু শারীরবৃত্তীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতেও মেয়েরা স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। যৌনতা-কেন্দ্রিক শব্দ মেয়েরা সচরাচর সরাসরি বলে না। তখন রূপক বা সংকেতের সাহায্য নিয়ে থাকে মেয়েরা। এমনকি মেয়েরা নিজেদের মধ্যেও যখন কথা বলে তখনও তারা সরাসরি এই সমস্ত শব্দগুলি ব্যবহার করতে চায় না। এমনকি পায়খানা পেছাপ ইত্যাদি শব্দগুলোও অনেক সময় মেয়েরা এড়িয়ে যায়।

বাইরে গেছে

মুসলিম মেয়েরা অনেক সময় পায়খানা করতে যাওয়াটাকে বাইরে যাওয়া বলে থাকে। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম মেয়েদের অন্তর্জগৎ হলে, ‘বাইরে গেছে’ শব্দটির অধিভাষাতে একটি বিশেষ তাৎপর্য বয়ে আনবে। আগেকার দিনে, বেশিরভাগ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে

শৌচাগার থাকতো। বা গ্রামের দরিদ্র পরিবারে অনেক সময় শৌচাগারও থাকতো না। তারা দূরে ঝোপে জঙ্গলে যেত। ফলে সেখান থেকে ‘পায়খানা’ যাওয়াকে ‘বাইরে যাওয়া’ কথাটি চলে এসেছে। যদিও শৌচাগারহীন বাড়ি এখন আর বিশেষ গ্রামেও দেখতে পাওয়া যায় না। এবং স্বল্প জায়গা ও সুবিধের জন্য অনেকে বাড়ির সঙ্গেই শৌচাগার বা বাথরুম রাখে। এখন আর তাই বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন না হলেও গ্রামের দিকে অনেকেই বিশেষ করে মুসলিম মেয়েরা ‘বাইরে গেছে’ বলে থাকে। এতে পায়খানা পেছাপের মতো শব্দ তারা প্রতিস্থাপিতও করে ফেলতে পারে অন্য শব্দ দিয়ে। এবং দীর্ঘদিন ধরে এই শব্দটি প্রচলিত থাকায় এই শব্দটি দিয়ে তারা এটি বুঝিয়ে থাকে অনেক সময়। তবে নবীণ প্রজন্মের মেয়েরা আর এই শব্দটি খুব একটা ব্যবহার করে না। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দের অধিভাষাও আমরা পালতে যেতে দেখছি। ‘বাইরে যাওয়া’ শব্দটি যেখানে সাংকেতিকতা বয়ে আনতো ধীরে ধীরে প্রযুক্তি প্রয়োজন ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনধারা বদলে এই শব্দটির অধিভাষা বা সাংকেতিময়তার দিকটাও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

গদ্দার

বিশ্বাসঘাতকতা। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ হলে, গদ্দার শব্দটি মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে তুলনায় গদ্দার শব্দটি মৌখিক ভাষাতে ব্যবহার অনেক কম। যদিও হিন্দি সিনেমা সিরিয়াল মারফৎ গদ্দার শব্দটি পরিচিত সমস্ত বাঙালিদের মধ্যেই। কিন্তু তাদের মুখের ভাষায় আমরা এর ব্যবহার খুব একটা দেখি না।

আজরে

এর অর্থ পরিবর্তন করে ফেলা। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটি পরিচিত শব্দ একটি। তবে, এই শব্দটি অন্য বাঙালিদের মধ্যে দেখা যাবে না। মুসলিমদের মধ্যেও আমরা দেখব, এই শব্দটির ব্যবহার যদিও মুসলিম পরিবারগুলির মধ্যেও ক্রমশ কমতে শুরু

করছে। বয়স্কা মহিলাদের মধ্যে যদিও এই শব্দটির ব্যবহার এখনো অপ্রতুল নয়। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে আজরে শব্দটির ব্যবহার প্রধানত দুই ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি লক্ষ্য করা গেছে –

এক, ঘর গৃহস্থালির ক্ষেত্রে এক পাত্রে রাখা খাবার অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করার সময় আজরে শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

“তরকারিটা আজরে ফেলে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দে।”

আর জামাকাপড়ের ক্ষেত্রে-

‘বাইরে থেকে এসচি, দাড়া আগে শাড়ী আজরে ফেলি’

তবে t = বর্তমান সময় হলে আমরা দেখব, এখনকার মুসলিম মেয়েরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সময় এই শব্দটি তারা ব্যবহার করে না কিন্তু অন্তঃপুরের মধ্যে নিজেদের মধ্যে তারা শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। প্রবীণারা এই সমস্ত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া শব্দগুলি সংরক্ষণ করে থাকেন। ফলে তাদের অন্তর্জগৎ এই শব্দটির অধভাষার সঙ্গে তাদের নিজস্ব জগতের নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের দিকটি সংযুক্ত।

তোড়াবেড়ি

দুজনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, ‘তোড়াবেড়ি’ শব্দের অর্থ দুজনের মধ্যে ঝগড়া যেখানে দুজনেই সমানতালে অংশগ্রহণ করছে। এটি বিশেষ করে, উত্তর চব্বিশ পরগণার মেয়েদের মধ্যে আমরা বহুল প্রচলিত দেখি। t অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার কমতে শুরু করেছে বিশেষত শহরাঞ্চলের মধ্যে এবং নবীন প্রজন্মের মধ্যে। পুরুষদের মধ্যে আমরা এই শব্দটির ব্যবহার এখন আর প্রায়

দেখিনা। ফলে নারীদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে এই শব্দটি এখনো বর্তমান। তোড়াবেড়ি শব্দটির অধিভাষার মধ্যে তাই নারী যে শব্দার্থ খুঁজে পায় পুরুষদের অধিভাষাতে তা ধরা পড়বে না।

চোপা

$M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, চোপা শব্দটির শব্দার্থ হল মুখে মুখে তর্ক করা। সাধারণত বড়োরা মেয়েদেরকেই মুখে মুখে তর্ক করার জন্য চোপা শব্দটি নিন্দার্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মেয়েদের কাছ থেকে যে বাধ্যতা আশা করা হয় তা আশানুরূপ না হলে পরিবারে সমাজে অনেকেই সেটি মেনে নিতে পারে না। ছেলেদের কাছে যা যুক্তি তাই অনেকসময় মেয়েদের ক্ষেত্রে চোপা মনে হয়। তাই ‘চোপা’ শব্দটির অধিভাষাতে মেয়েদের মধ্যে যে নেতি ভাব থাকে তা থেকে পরিবারের সমাজের সংস্কারের প্রতি এক ধরনের আনুগত্যের, অনুশাসন মেনে নেওয়ার মানিয়ে নেওয়ার এক ধরনের বোধ জন্মায়। উঁচু গলায় মেয়েদের কথা বলা তর্ক করাকে খুব কম পরিবারেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সব ধর্মই মেয়েদের উপর বিধিনিষেধ চাপানোর চেষ্টা করে থাকে। মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই ইসলাম ধর্ম কেন্দ্রিক বিধিনিষেধগুলি মান্য করার বিষয়ও উঠে আসে অনেক সময়। ফলে ‘চোপা’ শব্দটির অধিভাষাতে একটি ছেলের যে দিকগুলি উঠে আসে একটি মেয়ের ক্ষেত্রে তা আলাদা হয়ে যাবে।

আবার t বা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা নিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে এসেছে অনেকখানি। তাই ‘চোপা’ শব্দটির ব্যবহার ক্ষেত্রও প্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেছে।

নিয়ামত

অনুগ্রহ। এটি একটি আরবি শব্দ। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে ‘নিয়ামত’ একটি প্রচলিত শব্দ। তবে, এই শব্দটি বেশিরভাগ সময় তারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যবহার

করে। এছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ বোঝাতেই একমাত্র নিয়ামত শব্দটি চালু আছে। অন্য কোন ক্ষেত্রে এই শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। আল্লাহর নিয়ামত ছাড়া জীবনে কিছুই ঘটে না। আল্লাহর নিয়ামত জীবনে প্রার্থনীয়। অর্থাৎ ‘নিয়ামত’ শব্দের অধিভাষাতে পরম করুণাময় আল্লাহর ধারণা সংযুক্ত হয়ে থাকে।

আমরা জানি ভাষা আমাদের চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করে। আমরা কথা বলি লিখি আমাদের ভাবনা চিন্তার আদান প্রদানের জন্য। কিন্তু ভাষা ব্যবহার এর এটি শুধুমাত্র একটি দিক। আমরা খেয়াল করলে দেখব, ভাষাকে শুধু আমরা ব্যবহার করি এমন নয়, ভাষা অনেক সময় আমাদেরকেও ব্যবহার করে। সেই শক্তিও মোক্ষম অমোঘ। এই যে অনর্গল আমরা কথা বলে যাই বা শুনি তা আসলে আমাদের কাছে এসে সেই সম্পর্কিত meta language বা অধিভাষার জগত যেমন খুলে দেয় অন্যদিকে তাকে সৃজনও করে। অধিভাষার জগতও স্থির নয়। একজন ব্যক্তির চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন শব্দ কোন বাক্যের অধিভাষাও বদলে যেতে পারে। বা নতুন করে কোন শব্দ বা ভাবনা জায়গা করে নিতে পারে। ভাষার এই অর্থ এই অধিভাষা আমাদের সংস্কৃতি থেকে আমাদের সমাজজীবন থেকে গৃহীত হতে থাকে।

ঘরে ঘরে বিয়ে/ কাজ

মুসলিমদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক ছাড়া বিয়ে ধর্ম সম্মত। অনেক জায়গাতেই দেখা যায় নিজেদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিয়ে হয়। সেইরকম বিয়েকে ঘরে-ঘরে বিয়ে বা ঘরে ঘরে কাজ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, w = মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটির একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে যা তাদের নিজস্ব সামাজিক নিয়ম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে কাদের সঙ্গে ঘরে ঘরে বিয়ে হয় এই নিয়ে নির্দিষ্ট বিধি আছে। কিন্তু w = অন্য ধর্মের সমাজ হলেই এই শব্দটির অর্থে এই ব্যঞ্জনা ধরা পড়বে না। কিন্তু সময় বা t এর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে

মুসলিমদের মধ্যে ঘরে ঘরে বিয়ের চল কিছুটা কমছে। ঘরে ঘরে বিয়ে হওয়ার কারণে দূর সম্পর্কের ভাই বোনদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাই-বোন সুলভ সম্পর্ক অনেক সময় থাকে না। তা কিন্তু আমরা হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে দেখব না। ফলে এই শব্দবন্ধটি মুসলিমদের অধিভাষাতে ভিন্ন ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে মেশার ক্ষেত্রে এক ধরনের সংকোচ তৈরি করবে এবং পর্দার ব্যবহার থাকবে।

এইরকম বিভিন্ন শব্দ, পদবন্ধে আমরা দেখব, মুসলিম নারীর অধিভাষা ভিন্ন হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচনার বাইরেও এরকম অজস্র শব্দ রয়ে গেল যা তাদের অধিভাষার জগতকে তুলে আনতে সাহায্য করবে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক শব্দ, ক্রিয়া বা ঘটনাগুলি তুলে আনার চেষ্টা করলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. ইসলাম, মাওলানা মোঃ মাজহারুল (অনুবাদ), নূরানী বাংলা কোরআন শরীফ, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, সূরা নিসা, আয়াত ১, পৃ. ১০৮

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তারই থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সংগিনী...”

২. তদেব, সূরা রুম, আয়াত ২১, পৃ. ৫৭৬

“তাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে আরও রয়েছে যে, তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য হতে, তোমাদেরই জন্য স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে আরাম পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও করুণা সৃষ্টি করেছেন...”

৩. তদেব, সূরা যুমার, আয়াত ৬, পৃ. ৬৫৪

“তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই মানুষ (আদম) হতে। অতঃপর তার থেকেই তার স্ত্রী (হাওয়া) কে সৃষ্টি করেছেন...”

৪. <https://www.hadithbd.com/hadith/detail/?book=1&section=53>

“৩০৯৬। আবু কুরায়ব ও মূসা ইবনু হিয়াম (রহঃ) ... আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে

আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবে।”

৫. তদেব, সূরা আন-নাহলে, আয়াত ৫৮-৫৯, পৃ. ৩৮৯

কোরানে কন্যা সন্তানকে সুসংবাদ বলা হচ্ছে।

“তাদের কাউকেও কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে তাদের চেহারা কাল হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে তারা ক্লিষ্ট হয়...”

৬. তদেব, সূরা আন-নুর, আয়াত ৩১, পৃ. ৫০২

“ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিকটস্থ মহিলা, সেবিকা – যারা তাদের অধিকারভুক্ত অনুগত, যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট যেন তারা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যমীনে সজোরে পা না ফেলে।”

৭. তদেব, সূরা আন-নুর, আয়াত ৩০, পৃ. ৫০১

“ঈমানদারকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজতে রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম...”

৮. তদেব, সূরা বাকারাতে আছে ২২২ নং আয়াত . ৫১

“লোকেরা আপনাকে হয়েয (মহিলাদের ঋতু) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন তা অপবিত্র। সুতরাং তোমরা হয়েয অবস্থায় মহিলাদের থেকে আলাদা থাক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকতবর্তী হয়ে না। যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের কাছে যাও...”

৯. তদেব, সূরা বাকারার, ২২১ নং আয়াত, পৃ. ৫০

“মুশরিক মহিলাদের ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ কর না। ঈমানদার দাসী মুশরিক নারী হতে উত্তম। যদিও মুশরিক নারী তোমাদের কাছে মনপুতঃ। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না। মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, যদিও তোমাদের মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে ...”

১০. তদেব, সূরা নিসা, ২২ নং আয়াতে, পৃ. ১১৪

“তোমরা বিবাহ কর না ঐ সমস্ত নারীদেরকে, যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ।

১১. তদেব, সূরা নিসা, ২৩ নং আয়াতে, পৃ. ১১৪

“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদের কন্যাদের বোনদের ফুফুদের খালাদের, তোমাদের ভাইয়ের মেয়েদের, বোনের মেয়েদের, তোমাদের দুধমাতাদের, দুধবোনদের, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাদের (শ্বাশুড়ী), তোমরা যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করছো তার কোলের মেয়েদের যারা তোমাদেরই অভিভাবকত্বে আছে। যদি তাঁদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, আর তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীগণ যারা তোমাদের ঔরসজাত এবং দু’বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ নয়। আর নারীদের মধ্যে যারা তোমাদের মালিকানাধীন হয়েছে তাদের ব্যতীত সকল সধবা মহিলা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।”

১২. তদেব, সূরা নিসা, আয়াত ৩-৪, পৃ. ১০৯

“আর তোমরা যদি এ ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তবে নারীদের মধ্যে বিবাহ কর যাকে তোমার পছন্দ লাগে দুই, তিন অথবা চারটি, আর যদি তোমরা এ ভয় কর যে, তাদের মাঝে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীই যথেষ্ট। (৪) এতে অধিকতর সম্ভাবনা এই যে, তাতে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ...”

১৩. তদেব, সূরা নিসা, ১২৯ আয়াত, পৃ. ১৩৯

“তোমরা কখনই স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করতে পারবে না যদিও এ ব্যাপারে তোমরা আগ্রহী হও। তবে তোমরা এক জনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না। আর অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখ না। যদি আপোষ কর ও পরহেজগারী অবলম্বন কর; তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

১৪. তদেব, সূরা নিসা, ৩৪ নং আয়াত, পৃ. ১১৭

“পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ববান। কারণ আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (পুরুষেরা) তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত হয় এবং আল্লাহ যা হেফাজত করতে বলেছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তা তারা হেফাজত করে। আর যে সব স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে ভাল উপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর ও তাদেরকে হালকা প্রহার কর। এতে যদি তোমাদের অনুগত হয়; তবে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন পথ তালাস করো না।”

১৫. (মুআত্তা মালেক, হাদীস ৯৫২; মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৪১ হাদীস ১৯০০৩; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২৭৬৯; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৪৭০৬)

“যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বললেন, জী, আছে। নবীজী বললেন, তার সাথে তোমার আচরণ কেমন? সে বলল, আমি যথাসাধ্য তার সাথে ভালো আচরণ করার চেষ্টা করি। তখন নবীজী বললেন, হাঁ, তার সাথে তোমার আচরণের বিষয়ে সজাগ থাকো, কারণ সে তোমার জাম্নাত বা তোমার জাহান্নাম।”

১৬. তদেব, সূরা রুম, আয়াত ২১, পৃ. ৫৭৬

১৭. তদেব, সূরা বাকারাহ, আয়াত ২৩১, পৃ. ৫৩

“হয় তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তাদের রেখে দাও অথবা, শালীনতার সাথে বর্জন কর। আর ক্ষতি করে বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখ না। আর এরূপ যে করবে সে নিজের প্রতিই জুলুম করবে ...”

কিন্তু প্রথমেই বিবাদের পথে বিচ্ছেদের কথা না ভেবে উভয়ের পরিবারের প্রতিনিধিদের মারফত সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজতে বলা আছে

১৮. তদেব, সূরা নিসা, আয়াত ১১, পৃ. ১১১

“আল্লাহ তোমাদেরকে সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দু’ কন্যার সমান। আর যদি দুইয়ের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদের জন্য রেখে যাওয়া সম্পত্তির দু-তৃতীয়াংশ। আর যদি মাত্র এক কন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধাংশ”

১৯. তদেব, সূরা আর রহমান, আয়াত ৭৬, পৃ. ৭৬৫

“তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ নরম গদিতে এবং সুন্দর বিছানায়” (৫৫;৭৬)

২০. তদেব, সূরা দাহর, আয়াত ২১, পৃ. ৮৩৬

“তাদের পোশাক হবে পাতলা সবুজ, রেশমী কাপড় ও পুরো রেশমী কাপড়”

২১. তদেব, সূরা নিসা, আয়াত ১০, পৃ. ১১০

“যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ গ্রাস করে নিশ্চয়ই তারা তাদের পেটে অগ্নিই পূর্তি করছে। অতিশীঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে।”

২২. তদেব, সূরা দাহর, আয়াতে ৮-৯, পৃ. ৮৩৫

“তারা খাদ্য দান করে অসহায়দেরকে, ইয়াতীমদেরকে এবং বন্দিদেরকে, একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসার জন্য”

২৩. বুখারী শরিফের ১৩৭৮ এ চুঘোলখোরদের শাস্তি বিষয়ে একটি গল্প বর্ণিত আছে।

<https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=25217>

২৪. তদেব, সূরা ক্বালামে, আয়াত ১১-১৬, পৃ. ৮১২

“যে নিন্দুক, চোগল খোর, কুৎসা রটনাকারী... যখন তার সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে, এগুলো প্রাচীনকালের উপাখ্যান...”

২৫. তদেব, সূরা মা-য়িদাহ , আয়াত ৯০-৯১, পৃ. ১৭৩

“মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক তীর এগুলো শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো বর্জন কর। যাতে তোমরা সফল হতে পার। শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির এবং নামায থেকে বিরত রাখতে।”

এছাড়া সূরা নিসার, আয়াত ৪৩ এ বলা হচ্ছে

“হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেও না...”

২৬. তদেব, সূরা আন নিসা, আয়াত ১৬৩, পৃ. ১৪৬

“নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছি। যেমনিভাবে অবতীর্ণ করেছিলাম নূহের উপর এবং তার পরবর্তী নবীগণের উপর। আর ওহী অবতীর্ণ করেছিলাম ইব্রাহীম, ঈসমাইল ইসহাক এবং তাঁর বংশধর ঈসা আইয়ুব, ইউনুস, হারুন, সুলাইমানের উপর...”

২৭. তদেব, সূরা শূরাঃ ৪২, আয়াত ৫১, পৃ. ৬৯৭

“মানুষের জন্য এটা কখনই হতে পারে না যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবে ওহী ব্যতিরেকে, বা পর্দার আড়াল ব্যতিরেকে বা কোন ফিরিশতা প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে ফিরিশতা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আল্লাহ যা চান তা-ই ওহী করেন।”

২৮. তদেব, সূরা আন নাহল, আয়াতে ১২৫, পৃ. ৪০০

“আপনি মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আপনার রবের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে আলোচনা করুন।”

২৯. তদেব, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৭, পৃ. ৩৬৬

“যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করেন- তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আরো অধিক দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার আযাব হবে কঠোর ”

৩০. তদেব, সূরা আন নামল, আয়াত ১৯, পৃ. ৫৩৮

“রাব্বি আওযি’নী আন্ আশ্ কুরা নি’মাতাকাল লাতি আন্আম্ তা আলাইয়্যা ওয়া আলা-ওয়া
– লিদাইয়্যা ওয়্আন্ আ’মালা স্বা-লিহ্বান্ তারদ্বা- হু ওয়া আদ্ খিলনী বিরাস্বমাতিকা ফী
ইবা-দিকাস্ব স্বা-লিহ্বীন ”

৩১. তদেব, সূরা আল হাজ্জ, আয়াত ২৭, পৃ. ৪৭৬

“এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। মানুষেরা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে এবং হালকা পাতলা উটসমূহে আরোহণ করে, তারা আসবে বহু দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে...”

এছাড়া সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩ এ বলা হচ্ছে -

“নিশ্চয় সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য বানানো হয়েছে সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, যা বরকতময় এবং বিশ্ব জগতের পথ প্রদর্শক। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যেমন মাক্কামে ইব্রাহীম। যে সেখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সে ঘরের হজ্ব করা মানুষের প্রতি অবশ্য কর্তব্য, যার সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে। আর কেউ অমান্য করলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ বিশ্বজগত হতে অমুখাপেক্ষী। ”

চতুর্থ অধ্যায়

নারীর মনোজগৎ ও উপসর্গ ব্যবহার বৈশিষ্ট্য

জন্ম সূত্রে বাঙালি হলেও হিন্দু এবং মুসলমান নারীর মধ্যে ধর্ম একটি পৃথক মানসিক স্তর নির্মাণ করে। হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে যেমন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তার মনোজগতকে অধিকার করে থাকে মুসলমান নারীর ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ই সলাম ধর্ম নির্ভর গ্রন্থ এবং সংস্কৃতি ও আদবকায়দা রীতি নীতি প্রাধান্য বিস্তার করে। সেই দিক থেকে ভাষা ব্যবহারে কেবল শব্দ নয় অব্যয় এবং শব্দের অংশ ইংরেজিতে যাকে clitic বলে চিহ্নিত করা হয় তা এই প্র সঙ্গে আমরা আলোচনা করে দেখব। অনুসর্গ উপসর্গ এবং অব্যয়ের অংশ আমরা এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। সাধারণভাবে যে ভাষার নমুনা পেয়েছি তার মধ্যে উপসর্গের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে এই অংশটি আমরা আলোচনা করছি।

দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা যেসমস্ত উপসর্গ ব্যবহার করি তার অনেকগুলোই বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত। মুসলিম মেয়েদের মধ্যে বেশ কিছু আরবি ফার্সি উপসর্গের ব্যবহার দেখব, যা হিন্দু বাঙালি কম ব্যবহার করে থাকেন।

- বে উপসর্গ –

বেয়াদব

‘খুবই বেয়াদব ছেলিমেরি যে সব, কোনো কথাই শুনছিনাকো’।

বেয়াদব/ বেয়াদব (ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে) বলা হয় অবাধ্য কাউকে

বেতমিজ

দুর্বিনীত, শিষ্টাচার জ্ঞানহীনকে বেতমিজ বলা হয়ে থাকে।

“উয়াদের বাড়ির মেয়েগুলো বুঝই বেতমিজ যে, কাউকেই মানে না দেখোনা!”

$M^{w,t}$ তে w মুসলিম বাঙালি সমাজ হলে আমরা দেখব ‘বেতমিজ’ শব্দটি শব্দভাণ্ডারে জায়গা পাচ্ছে। মালদা মুর্শিদাবাদ বর্ধমান ইত্যাদি জেলায় এই শব্দটির ব্যবহার যেরকম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আমরা দেখব বাঙালি মুসলিম সমাজে এই শব্দটির ব্যবহার সেরকম নয়। এদিকে এই শব্দটির ব্যবহার প্রায় নেই। আবার মালদা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেও দেখব, প্রাচীনা নারীরা এই শব্দটির ব্যবহার অনেক বেশি করে। নবীন প্রজন্মের মেয়েদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার তুলনায় অনেক কম। ফলে বয়সের ভিত্তিতে মুসলিম মেয়েদের ভাষাজগত আলাদা হয়ে যেতে দেখছি আমরা।

বেশরম

‘বেশরম’ শব্দের অর্থ লজ্জাহীন। ‘বেশরমি’ বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন- ‘বেশরমির তো একটা সীমা আছে মাগো! ছিঃ!’ ।

এছাড়া বিশেষ্য হিসেবে বেশরম পদেরও ব্যবহার আছে। এই শব্দটিও আমরা দেখব, বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রচলিত। $M^{w,t}$ এর $W=$ মুসলিম সমাজ হলে আমরা এই শব্দটির প্রচলন দেখতে পাব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লজ্জা হায়া ইত্যাদি মেয়েদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত বলে মনে করা হয়। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের মধ্যে নারীর সঙ্গে লজ্জার সংযোগ আছে – এই ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। ‘লজ্জা মেয়েদের ভূষণ’ কথাটিতো প্রায় প্রবাদে পরিণত। প্রত্যেক ধর্মই নারীর সঙ্গে এই লজ্জা গুণটিকে প্রায় অপরিহার্য করে দেখে। ইসলামেও ‘বেশরম’ কথাটি নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই কারণে ও একই দৃষ্টিকোণে ব্যবহৃত হয় না। শরিয়ত অনুসারে জামা-কাপড় পরার ধরন ‘শালীন’ বা শরিয়ত সমর্থিত না হলে বা ছেলেদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তাতেও মেয়েদেরকে বেশরম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু

সাধারণভাবে এইসমস্ত একই বিষয় অর্থাৎ জামাকাপড় পরার জন্য বা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ছেলেদেরকে বেশরম বলা হয় না তত। মুসলিম নারী পুরুষের জন্য ‘বেশরম’ শব্দের metalanguage তাই একই হয়না।

বে-আব্রু

‘বে-আব্রু’ শব্দটি বাঙালি হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ $M^{w,t}$ এর W = বাঙালি সমাজ হলে বেআব্রু শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখব। কিন্তু মুসলিম এবং হিন্দু নারী উভয়ের জন্য এই শব্দটির metalanguage এক থাকবেনা। আব্রুর ধারণা যেহেতু দুটো সমাজে আলাদা খানিক মেয়েদের জন্য, তাই দুই সম্প্রদায়ের নারীর কাছে শব্দটি একই অধিভাষা বহন করে না। একজন মুসলিম মেয়ের কাছে হিজাব, নেকাব বা মাথায় কাপড় থাকা ইত্যাদি বেআব্রুর ধারণা তৈরি করতে পারে। হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়। ফলে দুই সমাজেই শব্দটির প্রচলন থাকলেও আমরা দেখছি ধর্ম কীভাবে মেয়েদের কোন শব্দের অধিভাষা নির্মাণে সহায়তা করছে।

বেআব্রু হয়ে ঘুরে বেড়ালে হাশরের ময়দানে জবাব দিতে হবে না

বে-ইমান

বে উপসর্গ যোগে অনেকসময়ই মুসলিমরা বিভিন্ন নঞর্থক শব্দ বলে। বে-ইমান শব্দটিও সেরকমই একটা শব্দ। ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস এবং মুসলিমদের কাছে আরো নির্দিষ্টভাবে সেটা হল ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। তবে ইমান শব্দটা অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। বে-ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাসঘাতক যে। বেইমান শব্দটা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ব্যবহৃত হলেও মুসলিমরা বেশি ব্যবহার করে থাকে এই শব্দটি।

বে-ওয়া – বিধবা । মুসলিম বিধবা মহিলার সঙ্গে অনেকেই তাদের নামের পাশে বেওয়া লেখে। যেমন মুর্শিদাবাদ মালদা প্রভৃতি জায়গায়। উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম বিধবা মেয়েরা তুলনায় কম সংখ্যক নামের পাশে বেওয়া শব্দটি ব্যবহার করে। কিন্তু মুসলিম সমাজে বিধবা অর্থে বেওয়া শব্দটির প্রচলন আছে। অর্থাৎ $M^{w,t}$ তে যদি w = মুসলিম সমাজ হলে বেওয়া শব্দের অর্থ দাঁড়াবে বিধবা।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব, বাঙালি মুসলিম বিধবার ধারণা আর বাঙালি হিন্দু বিধবার ধারণা একেবারেই এক নয়। এক্ষেত্রে খাবার দাবারের, বেশ-ভূষার কোন পরিবর্তন সম্পর্কে শরিয়তে কোন বিধি নিষেধ নেই।

তবে অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা পরিবর্তন আমরা মুসলিম বিধবাদের মধ্যে দেখতে পাব। যেমন মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু গ্রামে বিধবা মহিলারা সাদা শাড়ি পরে, হাতের গলার গয়না খুলে ফেলে। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে একসঙ্গে থেকে তাদের বেশ কিছু আচার তারা গ্রহণ করেছে। আবার যে সমস্ত মুসলিমরা ধর্মান্তরিত হয়েছে খুব বেশি পুরুষ আগে নয় হয়তো তারাও অনেক সময় তাদের মধ্যে পূর্ব ধর্মের আচার বহন করে নিজেদের মধ্যে। তবে এই সমস্ত আচার পালনকারীরা বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত মুসলমান। তা থেকেও নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়ার আঁচ পাওয়া যায়। তবে ইদানীং এই সমস্ত বে-ইসলামিক পথ বা জীবন যাপন থেকে তারা সরে এসে ‘সহি মুসলমান’ হতে চাইছে। শরিয়ত পন্থি হতে চাইছে। অর্থাৎ $M^{w,t}$ এর w = মুর্শিদাবাদের কিছু গ্রামের হতদরিদ্র মুসলমান বিধবাদের জীবন হলে আর t বর্তমান সময় থেকে ৩০ ৪০ বা ৫০ বছরের মধ্যে একধরনের পরিবর্তন দেখব ‘বেওয়া’ শব্দের metalanguage এ। তবে মুসলিম বেওয়াদের ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ করার ক্ষেত্রেও কোন নিষেধ নেই শরিয়তে। অঞ্চল ভেদেও এর কোনো বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিধবাদের বিবাহতে সবসময়ই কিছু

বিশেষ অসুবিধা দেখা যায় পুরুষদের তুলনায়। সেটা অবশ্য কোন নির্দিষ্ট ধর্মের বিষয় নয়। সব ধর্মের জন্যই প্রযোজ্য তা।

ইসলাম ধর্মে বিধবাদের জন্য পৃথক উত্তরাধিকার আইনও আছে যা অন্য অনেক ধর্ম থেকে আমরা দেখব যে আলাদা। যেমন স্বামীর বাবা মা জীবিত থাকা অবস্থায় স্বামী মারা গেলে, যদি সম্পত্তি স্বশুরের নামে থাকে তবে সেই সম্পত্তিতে সেই বিধবা বা তার সন্তানদের কোন অধিকার থাকে না আইনত। স্বামীর সম্পত্তিতে অবশ্য বিধবার আইনত অধিকার থাকে।

অর্থাৎ, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ‘বেওয়া’ শব্দটির অধিভাষা ‘বিধবা’ শব্দের অধিভাষা (অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে) অনেকখানি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম ধর্মের নিজস্ব নিয়ম কানুন পুনর্বিবাহ রীতি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন –এই সমস্ত কিছুই এই শব্দের অধিভাষায় প্রতিফলিত হয়।

বেগনা

‘বেগনা’ শব্দের অর্থ অচেনা। এই শব্দটিও আমরা দেখব মুসলিম সমাজে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। $M^{w,t}$ তে w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটি তাদের শব্দভাণ্ডারে জায়গা করে নিচ্ছে। আবার, মুসলিম মেয়েদের জন্য ‘বেগানা’ শব্দের metalanguage মুসলিম পুরুষদের তুলনায় পৃথক হয়ে যাবে। প্রকাশ্যে পর পুরুষ বা বেগানা পুরুষ হলে মুসলিম মেয়েরা সাধারণত তাদের সামনে আসেনা। আবার অচেনা স্ত্রীলোক হলে পুরুষরাও খানিক সংকুচিত বোধ করে থাকে। ফলে বেগানা শব্দের metalanguage মুসলিম স্ত্রী পুরুষের জন্য এক থাকছে না। আবার এখনকার মুসলিম মেয়েরা যারা স্কুলে কলেজে যাতায়াত করে বা কর্ম জগতে প্রবেশ করেছে তাদের মধ্যে বেগানা পুরুষদের সামনে আসার

সংকোচ নেই। অর্থাৎ T বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের চিন্তা জগত ও পরিবর্তিত হচ্ছে ‘বেগানা’ শব্দকে কেন্দ্র করে। উত্তর ২৪ পরগণার একটি মুসলিম মেয়েদের বেগানা শব্দ ব্যবহার করে বাক্যের উদাহরণ দেওয়া হল-

‘বেগনা মানুষির সামনে মুই মেয়েমানুষ যাব কী করে!’

বেগুনাহ

‘বেগুনাহ’ শব্দের অর্থ নির্দোষ। ‘গুনাহ’ এবং ‘বেগুনাহ’ দুটো শব্দের ব্যবহারই বাঙালি মুসলিম সমাজে আছে। বাঙালি হিন্দু সমাজের দৈনন্দিন কথোপকথনে এ দুটি শব্দের একটিও ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ $M^{w,t}$ এ $W =$ বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে ‘বেগুনাহ’ শব্দটি নির্দোষ শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে ধার্মিক লোকজনের মধ্যে এই শব্দটা বেশি বলতে দেখা যায়। ইদানীং শব্দটির ব্যবহার নবীন প্রজন্মের মধ্যে কমছে। ধর্মীয় প্রসঙ্গে, শরিয়ত নির্ধারিত দোষ বা পাপ এর খতিয়ান করতে গিয়ে বেগুনাহ শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
যেমন -

‘তুই যদি বেগুনাহ হোস তাহলে কবরের আজাব মাফ হয়ে যাবে।’

বে-জুবান

বে-জুবান শব্দের অর্থ নির্বাক অর্থাৎ যারা কথা বলতে পারে না। এই শব্দটির ব্যবহারও বাঙালি মুসলিম সমাজে আছে কিন্তু বাঙালি হিন্দু সমাজের এর ব্যবহার দৈনন্দিন কথোপকথনে প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ $M_{w,t}$ এর $w =$ মুসলিম সমাজ হলে সাধারণত যে সমস্ত মনুষ্যের প্রাণি কথা বলতে পারে না তাদেরকে বেজুবান বলা হয়ে থাকে।

যেমন - বেজুবান পশু পাখি সব! এতো জারে সব কষ্ট পাচ্ছে।

বে-নামাজি

‘বেনামাজি’ শব্দের অর্থ যে নামাজ পড়ে না। নামাজ পড়া – এই ক্রিয়াটি একেবারেই মুসলিমদের নিজস্ব ধর্মীয় আচার। ভাষা সৃষ্টির সঙ্গে সেই জায়গার সংস্কৃতির প্রভাব থাকে। মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত এই শব্দ তারই প্রমাণ বহন করছে। $M^{w,t}$ তে $w=$ বাঙালি মুসলিম সমাজ ছাড়া অন্য ধর্মীয় সমাজ যে হতে পারেনা শব্দটির অর্থই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে। নামাজ পড়া ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি কাজের একটি কাজ। নামাজ পড়ে না পড়ে না তার ভিত্তিতে মুসলিমদেরকে এখানে ভাগ করা হচ্ছে- এই শব্দটার মধ্যে দিয়ে। তা থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে নামাজ পড়ার গুরুত্ব। মুসলিম মানসের metalangugae এ এই শব্দটি দিয়ে শরিয়ত কোরান অনুসারী জীবন যাপন করছে কিনা তারও ধারণা প্রতিফলিত হবে। বেনামাজি মানুষকে মুসলিম সমাজে নিন্দার্হ।

আল্লাহ নামাজ রোজা ফরজ করেছে, বেনামাজিদের জান্নাতে কোনো জায়গা নেই।

বেসুরাত

সুরাত অর্থে দেখা বা রূপের কথা বলা হয়। তার সঙ্গে বে ফারসি উপসর্গ যোগ করে মুসলিম বাঙালি প্রায়শই বেসুরাত শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। আর মেয়েদের রূপ সৌন্দর্য নিয়ে সমাজে পরিবারে যত চর্চা হয় পুরুষের রূপ নিয়ে তত হয় না। ফলে, ‘বেসুরাত’ শব্দটি মেয়েদের অধিভাষায় যেভাবে প্রভাব ফেলে, সমাজ নির্দিষ্ট যেসব মাপকাঠিতে বেসুরাত বলা হয়ে থাকে তা মেয়েদের অধিভাষা জগতে ছাপ ফেলে। উল্টোদিকে ছেলেদের কাছে নিজে বেসুরাত হওয়ার থেকেও স্ত্রী নির্বাচনের সময় বা বাড়ির বৌ নির্বাচনের সময় এই শব্দটি গুরুত্ব পায়। ফলে সামাজিক ধারণা ছেলে মেয়ের metalanguage এ একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা বহন করে আনে।

বেইজ্জত

ইজ্জতহীন। ‘বে’ উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন বাঙালি মুসলিমদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রচুর পরিমাণে তারা এই উপসর্গ ব্যবহার করে থাকে। অনেক সময় একই শব্দের অন্য প্রতিশব্দের বদলে তারা বে উপসর্গ যোগে শব্দ চয়ন করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বেশরম (নির্লজ্জ), বেইজ্জত (মান সম্মান হীন), বেগনা (অচেনা)। এছাড়া বেয়াদব, বেতমিজ, বে-নামাজি বেহদ্দ ইত্যাদি মুসলিম সমাজে বহুল ব্যবহার হয়। হিন্দু বাঙালিরা কম ব্যবহার করে। এর মধ্যে বেনামাজি, বেতমিজ, বেশরম হিন্দু বাঙালি তাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে প্রায় ব্যবহার করে না।

• হর উপসর্গ

হরগিস

এই শব্দটির অর্থ হল একেবারেই বা আদৌ বা কিছুতেই ইত্যাদি। এই শব্দটির ব্যবহারও আমরা দেখব, বাঙালি মুসলিম সমাজে সীমাবদ্ধ। এটি একটি ফারসি শব্দ। $M^{w,t}$ এর $w =$ বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটির অস্তিত্ব এই অর্থ সহ আছে। বেশিরভাগ বাঙালি হিন্দুর কাছেই এই শব্দটি অচেনা। এই শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখব, ধীরে ধীরে এর ব্যবহার কমছে নবীন প্রজন্মের মধ্যে। গ্রামের প্রবীণা মেয়েদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। t বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার বদলাচ্ছে। প্রাচীনা এবং নবীনা মেয়েদের মধ্যে এর শব্দটি বলার রকমফের ঘটছে।

হরদম

এই শব্দটির অর্থ ‘সবসময়’। এই শব্দটির ব্যবহারও মুসলিম সমাজেই দেখা যায়। $M^{w,t}$ এর $w =$ মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটির অর্থ ‘সবসময়’। W পাল্টে বাঙালি হিন্দু সমাজ

হয়ে গেলেই এই শব্দটির ব্যবহার আমরা আর দেখতে পাব না। এই শব্দটির ব্যবহারও ইদানীং কমছে। অর্থাৎ t এর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দটির ব্যবহার কম বেশি দেখতে পাব। আবার এই শব্দটি যেহেতু হিন্দি ভাষার শব্দভাণ্ডারেও গৃহীত হিন্দি সিনেমা সিরিয়ালের প্রভাব থেকে এখনকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখব হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে। কিন্তু বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রবীণদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাব না। উলটোদিকে মুসলিম সমাজের প্রবীণদের মধ্যে বিশেষ করে প্রবীণাদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাব। কারণ সেক্ষেত্রে এই শব্দটি হিন্দি সিনেমা সিরিয়াল মারফত আসেনি।

হররোজ

হররোজ শব্দটির অর্থ প্রতিদিন। এই শব্দটিও হিন্দি শব্দভাণ্ডারে আছে। এই শব্দের ব্যবহার বাঙালি মুসলিম সমাজে আছে। তবে সর্বত্র এর ব্যবহার নেই। মুর্শিদাবাদ মালদায় এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে মুসলিম সমাজের মধ্যে। তুলনায় উত্তর বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার কম। $M^{w,t}$ এর w = অঞ্চল বিশেষের বাঙালি মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাব।

হরমাহিনা

এই শব্দটির অর্থ হল প্রত্যেক মাস। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, হরমাহিনা শব্দটি পরিচিত একটি শব্দ। হরমাহিনা শব্দটি হিন্দু বাঙালিদের মৌখিক ভাষাতে আমরা ব্যবহার হতে দেখি না।

হরকিসিম

সবরকমের। $M_{w,t}$ এর w = মুসলিম সমাজ আর t = বর্তমান সময় হলে এই শব্দটি একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। তবে এই শব্দটিকে আমরা হিন্দুদেরকে বলতেও দেখি। নারী পুরুষ উভয়কেই এই শব্দটি প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

হরকাত – হরকত শব্দের অর্থ আচার ব্যবহার। বাঙালি হিন্দু সমাজে এই শব্দটির ব্যবহার তেমন নেই। তবে হিন্দি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ বাংলায় অনুপ্রবেশ করছে সম্প্রতি। তার সূত্রে যদিও এখনকার কম বয়সী ছেলে মেয়েরা এই শব্দটি মাঝেমাঝে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বিশেষ করে বয়স্ক মহিলারা এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে বেশি। $M^{w,t}$ এর W = মুসলিম সমাজ হলে, আমরা দেখব এই শব্দটি অনেক কাল আগে থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কিন্তু ইদানীং এর ব্যবহার কমছে। কিন্তু প্রবীণা মহিলাদের মধ্যে এর ব্যবহার আছে। আর W = বাঙালি হিন্দু সমাজ হলে আমরা দেখব যে শব্দটি ইদানীং ছোটোরা কেউ কেউ সমবয়সীদের মধ্যে শব্দটি ব্যবহার করছে। এই রকম ব্যবহার যে কোন ধর্মের বাঙালিদের মধ্যেই ছোটোরা ব্যবহার করছে দেখব। বিশেষ করে যারা বলিউডি সিনেমা সিরিয়াল বেশি দেখে থাকে।

- না উপসর্গ

নাখোস

অসম্ভুট। $M_{w,t}$ তে W = মুসলিম সমাজ হলে আর t = বর্তমান সময় ধরলে এই শব্দটি অসম্ভুট অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রায়ই। তবে এই শব্দটি অনেক আগে থেকেই মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু হিন্দু সমাজে এই শব্দটির ব্যবহার তেমন নেই বললেই চলে। নারী পুরুষ উভয়েই এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকে।

নাজুক

দুর্বল, পেলব, ভঙ্গুর। $M_{w,t}$ তে W = মুসলিম সমাজ হলে আর t = বর্তমান সময় হলে দুর্বল বোঝাতে নাজুক শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন – নাজুক শরীর বা নাজুক দিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই শব্দটির ব্যবহারও হিন্দু বাঙালির দৈনন্দিন

জীবনে নেই। মুসলিম সমাজে মেয়েদের প্রকৃতি বোঝাতেও নাজুক কথাটি ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটিও নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে থাকে।

নাফরমানি

অবাধ্য, ঔদ্ধত্য। এই শব্দটির ব্যবহারও মুসলিম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিন্দু বাঙালিকে নাফরমানি শব্দটি প্রয়োগ করতে খুব একটা দেখা যায় না। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে এই শব্দটার যেভাবে অর্থপূর্ণ হবে হিন্দু সমাজে সেটি হবে না। তবে নাফরমানি শব্দটি নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে থাকে মুসলিমদের মধ্যে। কিন্তু বয়স্কদের মধ্যেই এর ব্যবহার বেশি পাওয়া যাবে।

নারাজ

এই শব্দের অর্থ হল রেগে যাওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া। এই শব্দটি বাঙালি মুসলিম সমাজে খুবই প্রচলিত একটি শব্দ। তবে এই শব্দটি ‘আল্লাহ নারাজ হবে/হয়’ এই অর্থে বেশি ব্যবহৃত হয় অন্য প্রসঙ্গের তুলনায়। $M_{w,t}$ তে যদি w = বাঙালি মুসলিম সমাজ হয় তবে ‘নারাজ’ শব্দটি আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্থে অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্য অনেক সময় হয়তো অন্য কারোর রেগে যাওয়া বা অসন্তুষ্ট অর্থে রেগে যাওয়া বিরক্ত হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি কাছাকাছি অর্থের শব্দই তারা বলছে। কিন্তু শরিয়তের বিধি নিষেধ অনুসারে কাজ না করলে তখন আল্লাহর জন্য নারাজ শব্দটি ব্যবহার করছে তারা। ফলে শব্দটির metalanguage এ ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, শরিয়তের নানা বিধি নিষেধ ও আল্লাহর নির্দেশ এই সমস্ত ধারণাগুলি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে উঠে আসে কোন বাঙালি মুসলিমের মনে। নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই এটি প্রযোজ্য। শুধু শরিয়তের বিধি

নিষেধ যেখানে নারী পুরুষের জন্য পৃথক সেখানে আল্লাহ নারাজ হওয়ার কারণ আলাদা হয়ে যাবে নারী পুরুষের ক্ষেত্রে।

নালায়াক

অপদার্থ, অযোগ্য। এই শব্দটিও আমরা হিন্দু সমাজে ব্যবহৃত হতে দেখি না। মুসলিম সমাজে বিশেষ করে বড়োরা ছোটোদের ভর্তসনা করে অনেকসময়ই নালায়াক বলে থাকে। $M_{w,t}$ তে W =মুসলিম সমাজ হলে আমরা দেখছি এই শব্দটির ব্যবহার আছে। এই শব্দটিও নারী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করে থাকে।

নাপসন্দ

যা পছন্দ নয়। নাপসন্দ শব্দটির ব্যবহার বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে বেশি হলেও খুব কম হলেও হিন্দুরাও কখনো কখনো বলার বা লেখার সময় শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। $M_{w,t}$

নাপাক

নাপাক শব্দের অর্থ অপবিত্র, অপরিষ্কার। ইসলামে পাক নাপাক এর ধারণা খুবই দৃঢ় এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। নাপাক অবস্থায় নামাজ পড়া, কোরান পাঠ তসবি পড়া ইত্যাদি ধর্মাচার করা যায় না। তার জন্য শরীর পরিষ্কার বা পাক রাখতে হয়। সঠিক উপায়ে গোসল, নখ পরিষ্কার করা, দেহের লোম ৪০ দিনের কম সময়ে কেটে ফেলা বা শরীর থেকে কোনরকম তরল পদার্থের নির্গমন, বায়ু নিঃসরণ এই সমস্তই অপবিত্র বা নাপাক হয়ে যাওয়ার কারণ বলে উল্লেখিত হয়।

$M^{w,t}$ এর M = মুসলিম চিন্তা জগত হলে তাই, নাপাক শব্দটি শুধুমাত্র অপরিষ্কার অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছেনা। নাপাক হওয়ার বিভিন্ন কারণ নির্দেশায়িত করা আছে ইসলামে।

সেই সমস্ত কারণের যে কোন একটির কারণেই নাপাক হয়ে যাবে শরীর। এই নাপাক হওয়া তাকে ধর্মীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান করতেও বাধা দেবে। ফলে ‘নাপাক’ শব্দটি তার আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট নাপাক ধারণার এলাকায় প্রবেশ করে মুসলিম মানসে। তবে মুসলিম মেয়েদের জন্য নাপাক আরো বহুস্তরীয়। মুসলিম মেয়েদের metalanguage এ নাপাক অর্থে প্রতিমাসের ঋতুস্রাব হওয়ার ঘটনাও যুক্ত হয়ে যায়। এবং এই সময়কালীন মেয়েরা কোনরকম ধর্মীয় কাজে যুক্ত হতে পারেনা। ফলে মুসলিম মেয়েদের অধিভাষার জগতে নাপাক এর ধারণা আরো ব্যাপক এবং অনিচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলকভাবে ঋতুমতী মেয়েদেরকে নাপাক বলে বিবেচিত হতে হয়। আর প্রতি মাসে ঋতুর কারণে নাপাক থাকলে তারা প্রকাশ্যে নাপাক হওয়ার কারণ ও জানাতে পারেনা। বিশেষ করে বাড়ির পুরুষ সদস্যদের সামনে। এক্ষেত্রে অনেকসময়ই দেখা যায়, তারা তাদের নাপাক হওয়ার কারণ এড়িয়ে গিয়ে অন্য কোন কারণের উল্লেখ করে যদি কারণ প্রকাশ্যে আনতে হয়। ফলে মুসলিম মেয়েদের ‘নাপাক’ শব্দের metalanguage এ ধর্মীয় বিধি নিষেধ এর সঙ্গে ঢুকে পড়ে পিরিয়ড নিয়ে সামাজিক ট্যাবুর বিষয়টিও।

নাজাবি

অপ্রস্তুত হয়ে কথা বলতে না পারা। সম্ভত, নাজওয়াবি বা জবাব দিতে না পারা এইটি ছিল মূল শব্দ যা নাজাবিতে পরিণত হয়ে গেছে। এই শব্দটি বাঙালি হিন্দুরা ব্যবহার করেন না। উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিমদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি। $M_{w,t}$ তে w = বাঙালি মুসলিম হলে আর সময় বর্তমান ধরলে দেখব, বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি। এখনকার কম বয়সীরা এই শব্দগুলো আর তেমন ব্যবহার করে না। উল্টোদিকে w = বাঙালি হিন্দু হলে বেশিরভাগের কাছেই এই শব্দটির অর্থ অজানা।

- কম উপসর্গ

কমজোর - কমজোর শব্দের অর্থ হল দুর্বল। কমজোর শব্দটি যদিও হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ব্যবহার করে থাকে অনেকসময়ই কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার বেশি। মুসলিমদের মধ্যে প্রবীণারা এর ব্যবহার বেশি করে থাকে।

- বর উপসর্গ

বরবাদ - শেষ হয়ে যাওয়া। $M_{w,t}$ তে w = মুসলিম সমাজ হলে, 'বরবাদ' শব্দটি বেশ প্রচলিত একটি শব্দ। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মুখেই আমরা এর ব্যবহার বেশি দেখি।

বরদাস্ত

সহ্য করা। এই শব্দটি অবশ্য হিন্দু বাঙালিরাও ব্যবহার করে থাকেন। $M_{w,t}$ তে, w = মুসলিম সমাজ হলে 'বরদাস্ত' শব্দটির পরিচিত শব্দ। মৌখিক ও লেখ্য উভয় মাধ্যমেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তুলনায় হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে এই শব্দটির ব্যবহার কম।

বদদোয়া

বদদোয়া শব্দের অর্থ অভিশাপ। এই শব্দটি শুধুমাত্র মুসলিম সমাজেই প্রচলিত। প্রায়শই এই বদদোয়া বা অভিশাপের প্রার্থনা করা হয় আল্লাহকে অন্যের ক্ষতি বা বিনষ্ট করার জন্য। বলা হয়, হাফেজ সাহেব অর্থাৎ ধর্মগুরু বাবা মা এদের দোয়া এবং বদদোয়া উভয়ই গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। $M^{w,t}$ এর W = মুসলিম সমাজ হলে বদদোয়া শব্দটি তাই অভিশাপ অর্থে বলা হলেও কোনও মানুষের সরাসরি এই অভিশাপ দেওয়ার ক্ষমতাকে মান্যতা দেওয়া হয়না। মানুষ এখানে মাধ্যম। আল্লাহের কাছেই দোয়ার মত বদদোয়ার সুপারিশও করতে হয়।

মুসলিম মেয়েদের ভাষায় ভাষার সংরক্ষণ আমরা অনেক বেশি খেয়াল করে থাকি। তাই পুরনো শব্দ পুরুষদের পরিচিত থাকলেও তাদের থেকে মেয়েরা ব্যবহার করে থাকে অনেক বেশি। এখানে যদিও শব্দ ধরে দেখানোর চেষ্টা করা হল একটি শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনা কীভাবে মুসলিম নারীদের জন্য পৃথক একটি অন্তর্জগৎ রচনা করে থাকে।

- খানা উপসর্গটি মুসলিমদের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত উপসর্গ।

গরিবখানা পায়খানা ডাক্তারখানা এতিমখানা ইত্যাদি প্রচুর ‘খানা’ উপসর্গ যোগে শব্দের ব্যবহার বেশি মুসলিম সমাজে।

দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার মধ্যে সংস্কৃত আরবি ফার্সি উর্দু হিন্দি ইংরেজি ভাষার উপসর্গ ব্যবহৃত হয়ে চলে আসছে। সেই সব উপসর্গ গঠিত বেশিরভাগ শব্দই ধর্ম নির্বিশেষে সকলে ব্যবহার করে থাকেন। খুব কম কয়েকটি শব্দই আমরা এমন পাব যেগুলি শুধুমাত্র মুসলিম মেয়েরা ব্যবহার করছে। সেইসব শব্দের অধিভাষা মুসলিম মেয়েদের জন্য পৃথক হলেও বেশ কিছু শব্দের অধিভাষা বা metalanguage লিঙ্গ বা ধর্মের নিরিখে কোন আলাদা তাৎপর্য বয়ে আনবে না। সকল বাঙালিই ব্যবহার করে থাকে এমন শব্দগুলি হল –

বদ’ উপসর্গ যোগে এইরকম শব্দগুলি - বদনাম বদমাশ বদখেয়াল বদহজম বদমেজাজ বদরাগী বদখত বদচলন ইত্যাদি।

‘বে’ উপসর্গ যোগে -

বেতন বেগার বেগোছ বেজন্মা বেজার বেজায় বেঠিক বেতাল বেদখল বেয়াদপ বেয়াদবি বেমালুম বেমক্লা বেরঙ বেরসিক বেনামা বেবাক বে-মতলব বেখাপ্লা বেটপ বেহায়া বেনজির বেকায়দা বেকার বেলান্নাপনা বেকসুর বেআক্কেল বেগতিক বে-আইনি বে-আকার বে-আকুল

বে-আড়া বেহিসেবি বেআন্দাজ ইত্যাদি শব্দগুলি বাংলা কথ্যভাষায় সবাইই বহুলভাবে ব্যবহার করে থাকে।

মুসলিম বাঙালি নারীর ব্যবহৃত কিছু বিশেষ উপসর্গ ও তাদের অধিভাষার জগৎ তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলিম মেয়েদের বাক্যগঠন ও অধিভাষা

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখলাম, মুসলিম মেয়েদের ভাষায় বেশ কিছু শব্দ স্বতন্ত্র জগতের সন্ধান দেয়, তাদের নিজস্ব অর্থবোধ তৈরি করে তাদের সামাজিক বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে। তাদের কথার আন্বয়িক সংবর্তন লক্ষ্য করলে আমরা বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য এমন পাব, যেখান থেকে তাদের ভাষার অর্থবোধের স্বতন্ত্র ধারণা খুঁজে পাব। অন্যদিকে কীভাবে বাংলা ভাষার অন্বয়কে তারা ব্যবহার করছে নির্দিষ্ট অবস্থান ও প্রসঙ্গ সাপেক্ষে তাও লক্ষ্য করা যাবে। নির্দিষ্ট সময় এবং স্থান সাপেক্ষে বাক্যের অন্বয়ও তাদের অধিভাষার জগতের সাক্ষ্য বহন করে থাকে। এই অধ্যায়ে তাদের বাক্য ব্যবহারের মধ্যে অন্বয়ের সেই দিকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাতের প্রয়াস থাকবে।

মেয়েদের কথা বলার সময় তাদের একেবারে নিজস্ব কথা বলার যে দিকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল একসঙ্গে কখনো ঘরের কাজ সারতে সারতে বা কখনো অবসর সময়ে অন্য হাতের কাজ (যেমন কাঁথা সেলাই বা বিড়ি বাঁধার কাজ) করতে করতে তারা গল্প করতে থাকে। আবার নেহাত গল্প গুজবও একসঙ্গে তারা করে থাকে। এই সময় তাদের গল্পের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র থাকে অন্যদিকে তেমন এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে দ্রুত সঞ্চরণও নজরে পড়ার মতো। শুধু মেয়েলি আড্ডায় তাদের বাক্যের গঠন যেমন থাকে পরিবারে অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের বাক্যের গঠন সেরকম থাকে না। আবার পরিবারের বাইরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময়ও তাদের বাক্যের গঠন এক থাকে না। অর্থাৎ রেজিস্টার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে শুধু শব্দ ব্যবহার পালটে যায় তাই নয় অনেকক্ষেত্রেই আমরা দেখব বাক্যের গঠনও বদলে যায়।

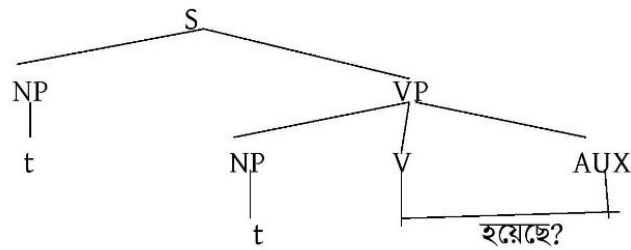
আবার বাক্যের অর্থ শুধুমাত্র বাক্যের শব্দ, ধ্বনি, বলার সময় শব্দগুলির মধ্যের বিরতির উপরই নির্ভর করে না তার গঠনের উপরও নির্ভর করে। অর্থাৎ, মেয়েদের কথা বলার ক্ষেত্রে রেজিস্টার, প্রসঙ্গ, বাক্যগঠন সবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে এগুলি অর্থের এবং অধিভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১। ক্রিয়াপদের পরিবর্তন

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে আদর্শ ব্যাকরণ সম্মত বাংলা ভাষার গঠন SOV। কিন্তু বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদের অবস্থান স্থির অনড় নয় অর্থাৎ ক্রিয়াপদের নিজস্ব স্থান পরিবর্তনেও অর্থবোধ বিদ্বিত হয় না বরং ক্রিয়াপদের অবস্থান পরিবর্তনে প্রসঙ্গ অনুসারে বাক্যের অর্থের বিভিন্ন মাত্রা ও সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হতে পারে। এমন কী শুধুমাত্র ক্রিয়াপদ দিয়েও অজস্র অর্থবোধ সম্পন্ন বাক্য গঠিত হয়ে থাকে বাংলা ভাষায়।

• শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারে মেয়েদের নিজস্ব ইঙ্গিতপূর্ণ কথা

আমরা প্রায়শই খেয়াল করে থাকব ‘হয়েছে’ এই প্রশ্নবোধক বা উত্তরসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে মেয়েরা তাদের পিরিয়ডস বা ঋতুচক্রকে বুঝিয়ে থাকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময়।



এখানে বাক্যের ক্রিয়াপদ যা বাক্যের থিটা রোলেরও ভূমিকা পালন করছে। সাধারণত বাক্যের প্রধান উপাদান বা lexical head এর সঙ্গে থিটা ভূমিকা যুক্ত থাকে। অনেকসময়ই তা

বাক্যের উদ্দেশ্যের স্থানে থাকে। কিন্তু এই বাক্যের ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ক্রিয়াপদ এখানে থিটা ভূমিকায় অবস্থান করছে। ‘হয়েছে’ এই ক্রিয়াপদটি একটি অনুচ্চারিত ট্যাবু রূপ ক্রিয়া বা শব্দকেও অন্তর্ভুক্ত করে দিচ্ছে।

অর্থাৎ ‘হয়েছে’ এই বাক্যটির Deep structure এ রয়েছে ‘পিরিয়ডস’ বা ‘মাসিক’ বা ঋতুচক্রের কথা। কিন্তু সেই থিটা রোলটি surface structure এ শুধুমাত্র ক্রিয়াপদে অর্পিত হচ্ছে। তবে এটি শুধু বিশেষভাবে মুসলিম মেয়েদের জন্যই প্রযোজ্য নয়, সার্বিকভাবে সমস্ত মেয়েদের মধ্যেই আমরা এর ব্যবহার দেখতে পাব।

২। ভাব বাচ্যের ব্যবহার

আমরা জানি ব্যাকরণগত ভাবে বাচ্য পরিবর্তন করে আমরা একই অর্থবোধক বাক্য বলতে পারি। কিন্তু, আমাদের স্বাভাবিক জীবন অভিজ্ঞতায় বাচ্যের পরিবর্তন করে আমরা যখন কথা বলি তখন সবসময় আমাদের একইরকম উদ্দেশ্য থাকে না।

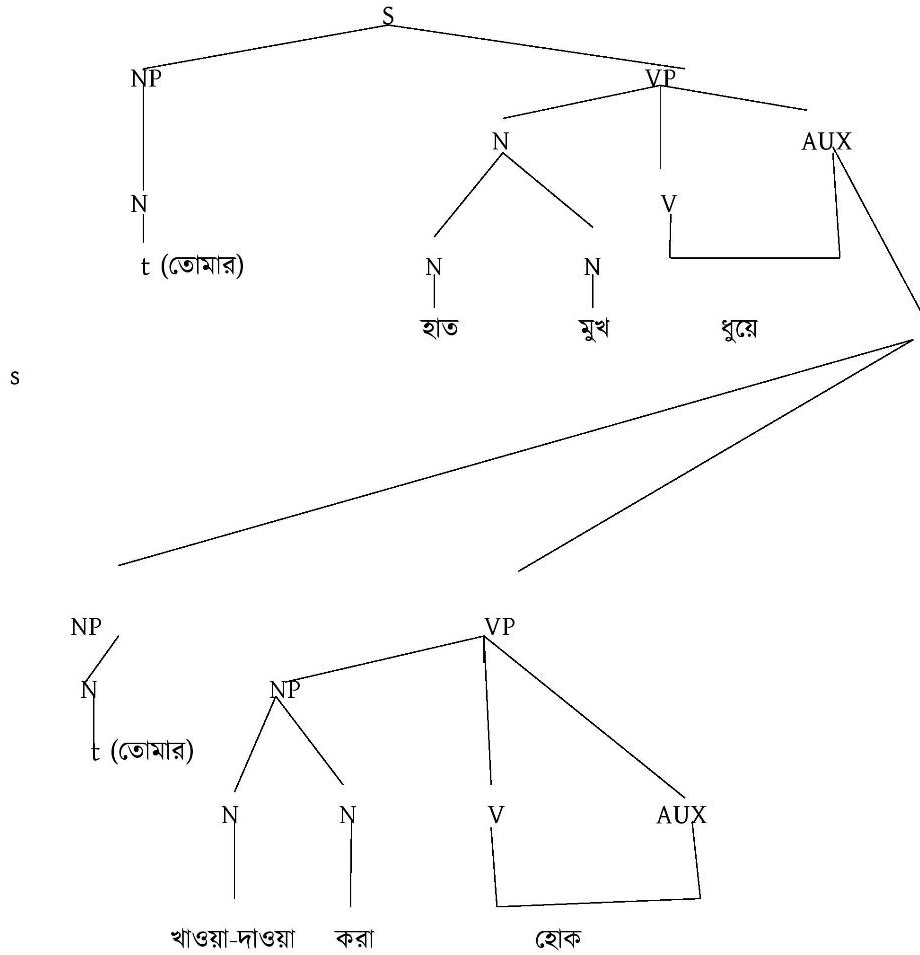
আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী বাচ্য পরিবর্তন করে কথা বলে থাকি। কর্তৃবাচ্যে বক্তা অনেক সরাসরি তার নিজের বক্তব্য জানায়। সেটা কোনো ক্রিয়া হতে পারে বা কিছু নির্দেশমূলক বা বর্ণনামূলক বাক্যও হতে পারে। কর্মবাচ্য যেখানে কর্ম প্রধান সেখানে আমরা দেখি বাক্যের কর্তা গৌণভাবে অবস্থান করে।

মুসলিম মেয়েদের কথায় বিশেষ করে পরিবারের বয়সে বা সম্পর্কে বড় পুরুষদের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে আমরা ভাব বাচ্যের ব্যবহার দেখব। এছাড়া পরিবারের বড়ো কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রসঙ্গেও তারা অনেক সময় ভাব বাচ্যে কথা বলে থাকে।

এখন এইরকম ক্ষেত্রের কয়েকটি উদাহরণ বা বাক্যের গঠন আমরা দেখব।

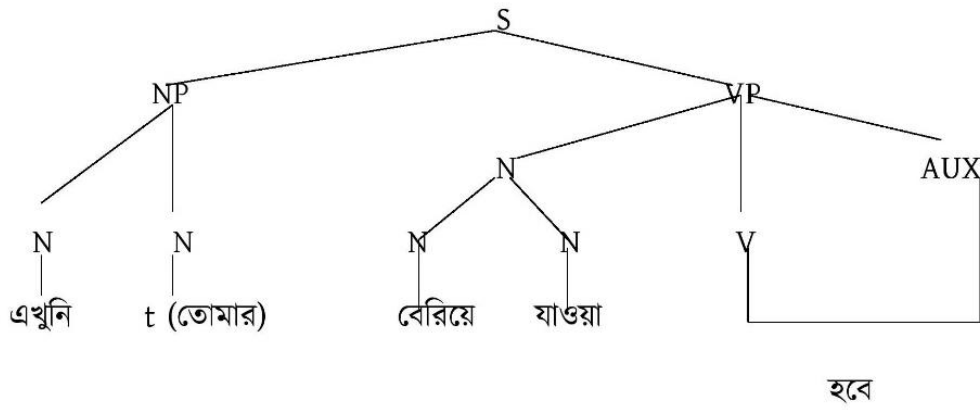
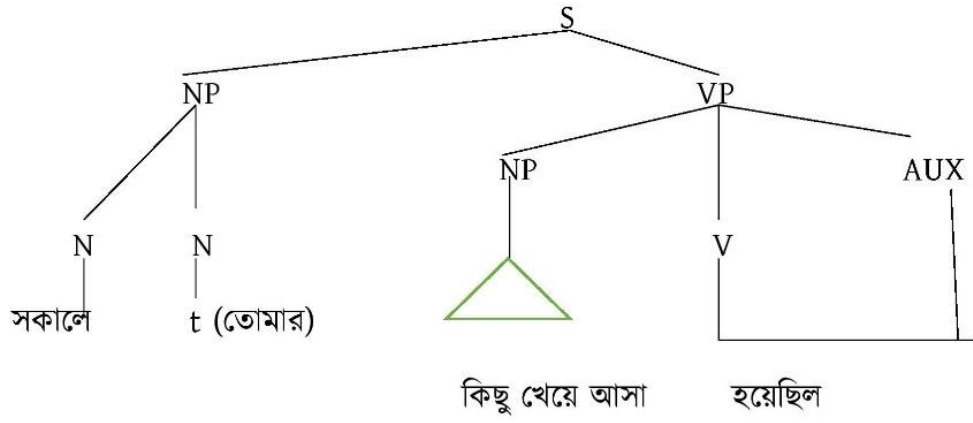
- “হাত মুখ ধুয়ে একটু খাওয়াদাওয়া করা হোক”

- “ তাড়াতাড়ি গোসল করে নিলে ভালো হতো ”
- “তাকের উপরে বইটা নিলে হবে।”
- “সকালে কিছু খেয়ে আসা হয়েছিল?”
- “এখুনি বেরিয়ে যাওয়া হবে?”
- “আর একটু থাকলে হতো না?”
- “ডাক্তারকে এখন পাওয়া যায় কি না দেখা গেলে ভালো হতো”

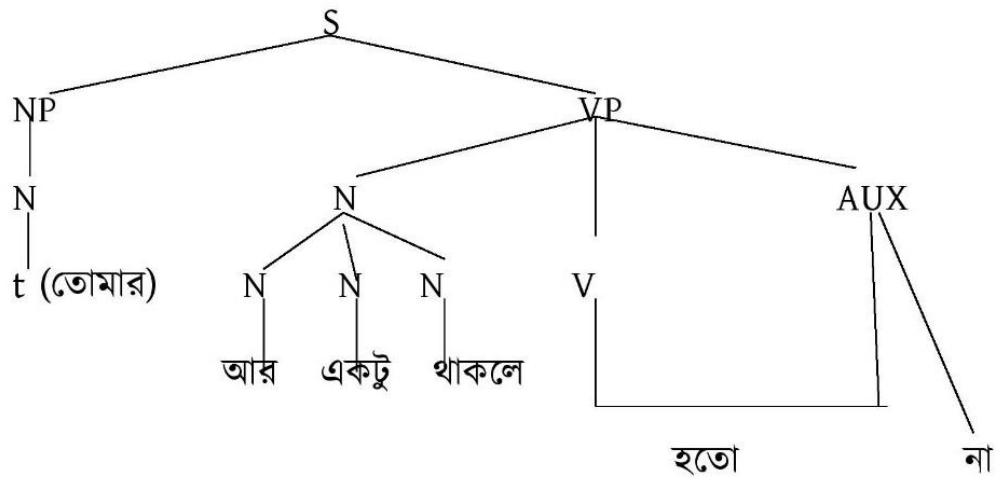


সকালে কিছু খেয়ে আসা হয়েছিল

এখুনি বেরিয়ে যাওয়া হবে?



“আর একটু থাকলে হতো না?”



- “ডাক্তারকে এখন পাওয়া যায় কি না দেখা গেলে ভালো হতো”

তাদেরকে হীনমন্যতা ও নিজের সিদ্ধান্তের উপর আত্মবিশ্বাসের অভাবকে নির্দেশ করতে পারে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে প্রায় সংযোগহীন গ্রামের মহিলাদের মধ্যে আমরা এই প্রবণতা বেশি দেখতে পাব বাড়ির বড়োদের সামনে বা পুরুষদের সামনে। মেয়েলি আড্ডায় এই সংকোচ অনেক কম। আবার লজ্জা সম্ভবমত ও বড়োদের সামনে তারা মৃদুভাবে নিজেদের কথা প্রকাশ করে ও সরাসরি বলতে চায় না। তখন তারা এই ভাব বাচ্যের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

অতীত কালের স্থানে ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তির ব্যবহার

বাংলা ভাষায় তিনটি প্রধান ক্রিয়ার কাল আছে। প্রত্যেকটি কালের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। এই ক্রিয়া বিভক্তি দিয়েই আমরা মূলত কালকে চিহ্নিত করে থাকি। উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিম মেয়েদের কথার মধ্যে অতীতকালের বর্ণনার মধ্যে আমরা অনেকসময় ক্রিয়া বিভক্তির স্বাভাবিক বিপর্যয় ঘটতে দেখব।

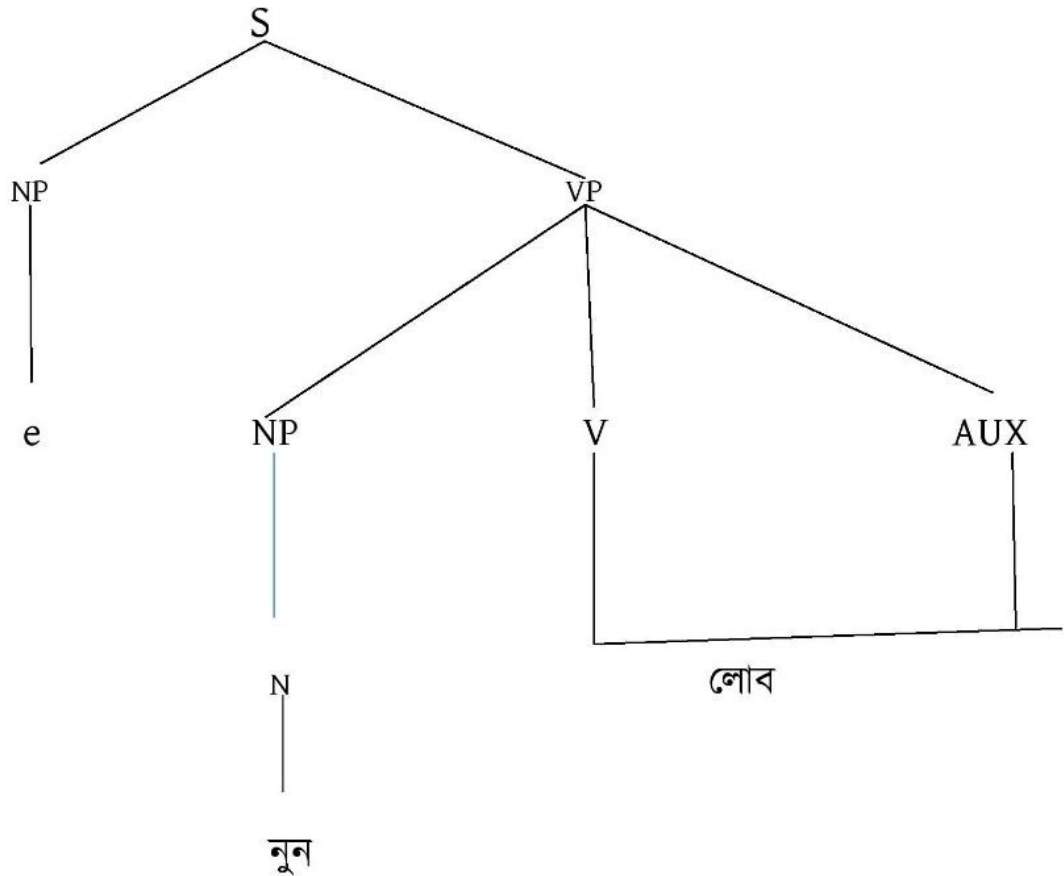
এখানে কয়েকটি বাক্যের গঠন আমরা দেখে নেব।

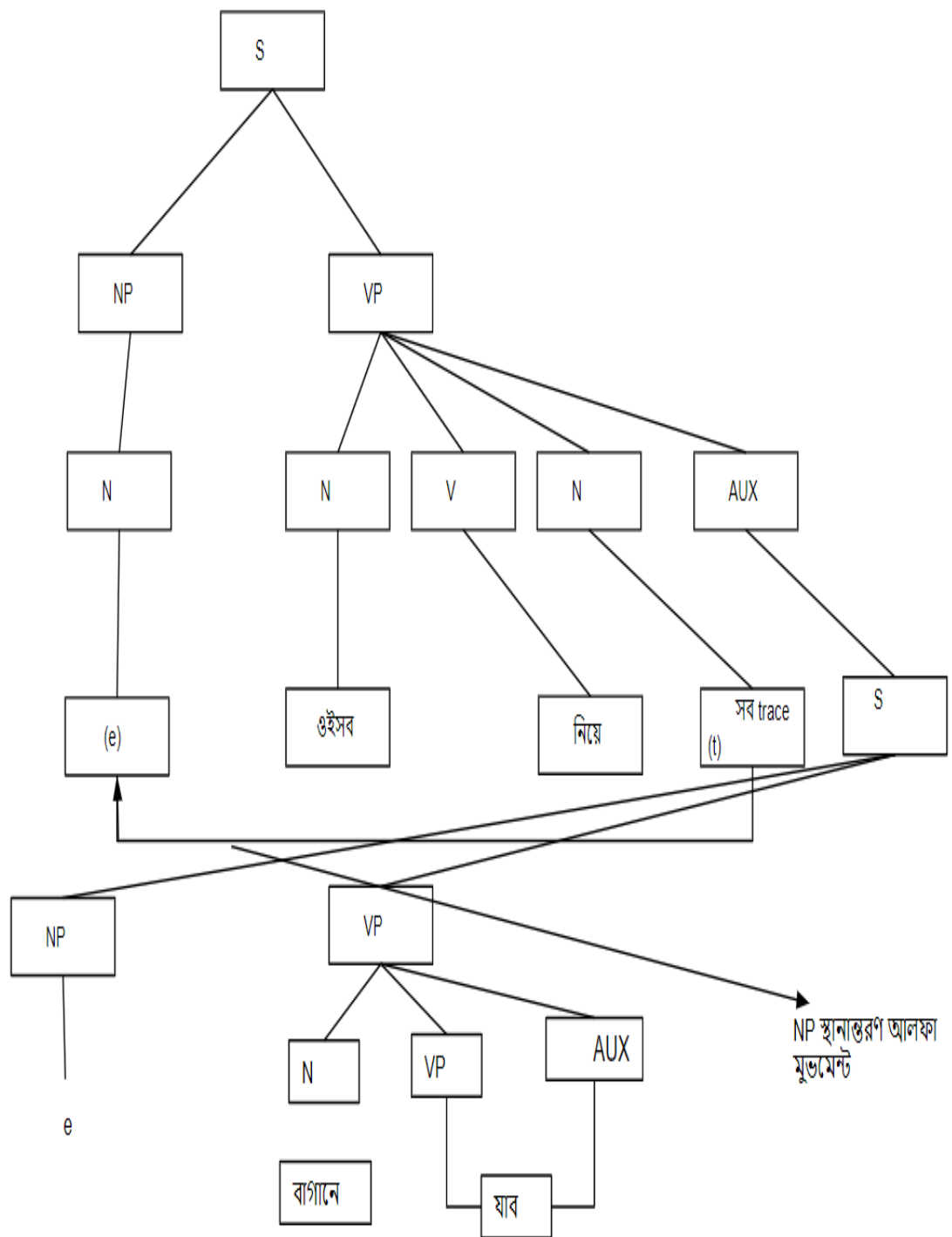
“বটি লোব। নুন লোব। মশলা লোব। জিরে হলুদ। জিরে গোলমরিচ। ওইসব নিয়ে সব বাগানে যাব। গিয়ে ঘাস ছিল ঘাসের ওপরে বসব। কয় ভায়বুনি। আমাদেরতো অন্য লোক লাগত না। এবার গোল করে বসে ওইসব আম পিস পিস করে কেটে এরকম করে মাখিয়ে সব বসেবসে খাব। আর ওই শানের পুকিরি দুই দিকে দুটো কুল গাছ ছিল। কী করব! নৌকার ওপরে আমরা গামছা লোব। সাবান লোব। আবার ঐ গা ঘসা এ লোব। আর নুন লোব কাগজে করে। লিয়ে আমরা ওঠব। উঠে কী করব। নৌকায় বসে কুল পাড়ব আর খাব। কত খেয়িচি সত্যি। ”

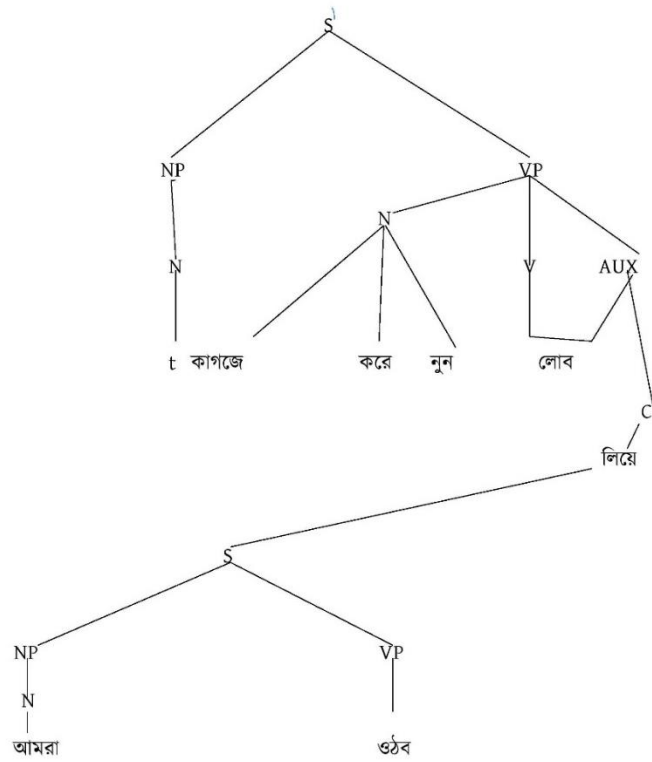
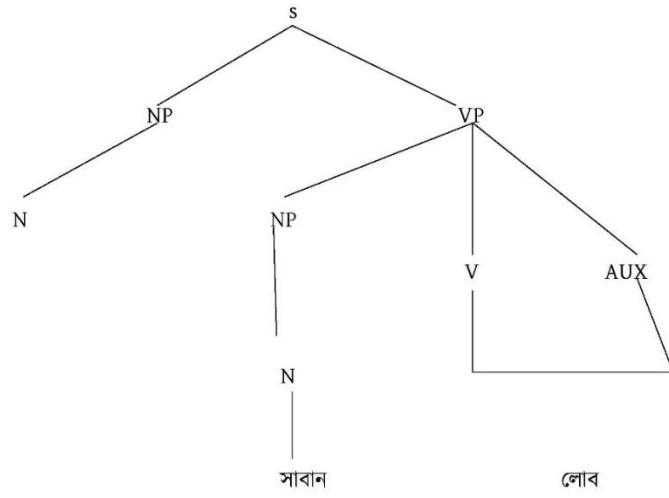
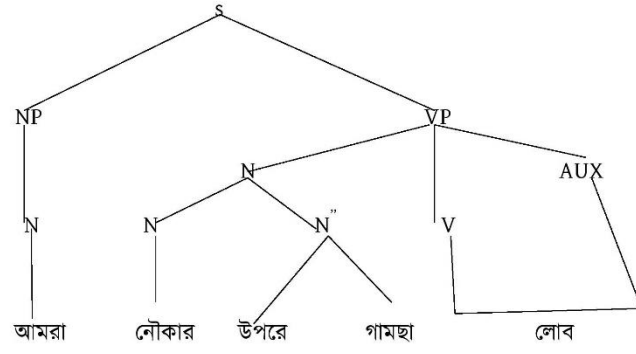
- মজিদা খাতুন

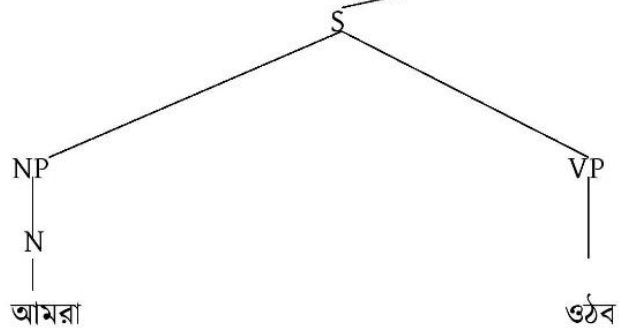
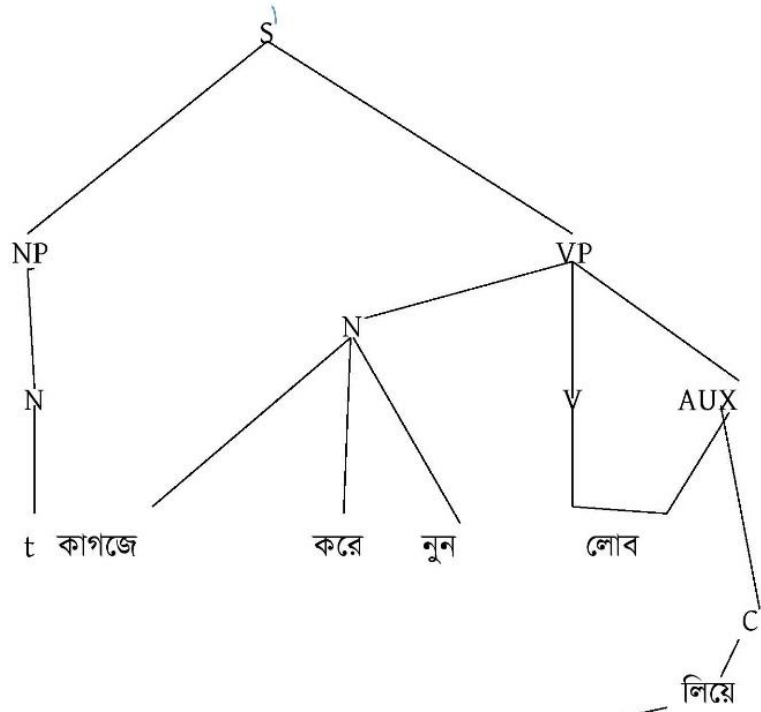
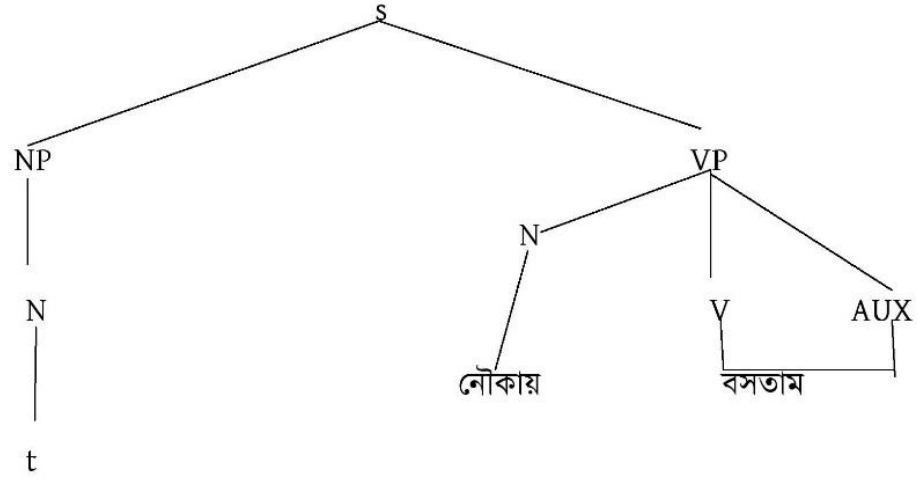
এখানে আমরা সমগ্র অনুচ্ছেদটি পড়লে বুঝতে পারব বক্তা আসলে অতীতচাৰিতা কৰছেন। স্মৃতি রোমন্থনের সময় অতীতের কিছু অংশে স্বাভাবিক অতীত ক্রিয়ার বিভক্তি যোগ করলেও কিছু অংশে কৰছেন না। যে অংশে কৰছেন এবং যে অংশে কৰছেন না সেখানে সূক্ষ্মভাবে নজর কৰলে বুঝব যে অংশ কোনো ঘটমান অতীত কাল, বক্তা যেখানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ কৰেছিলেন সেই অংশে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বসে যাচ্ছে। আর সাধারণ অতীত বা বর্ণনামূলক অংশে কিন্তু এই বিপর্যয় ঘটছে না।

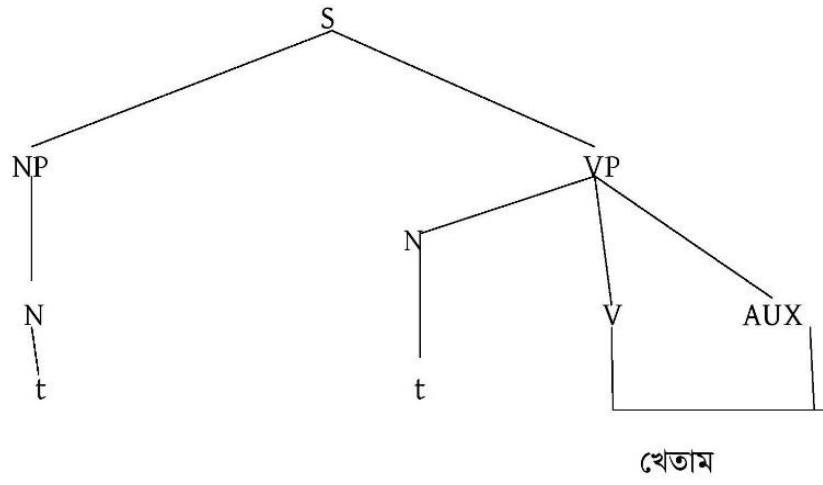
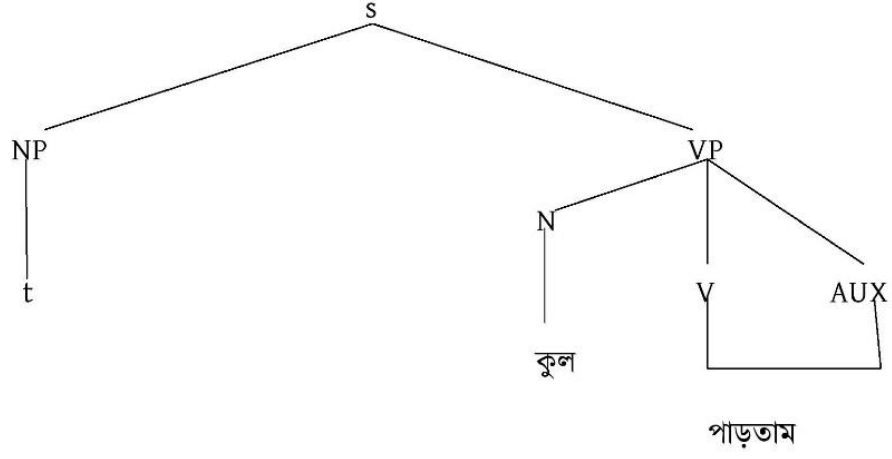
আমরা উভয় শ্রেণির বাক্যের আন্বয়িক গঠন লক্ষ্য কৰব।











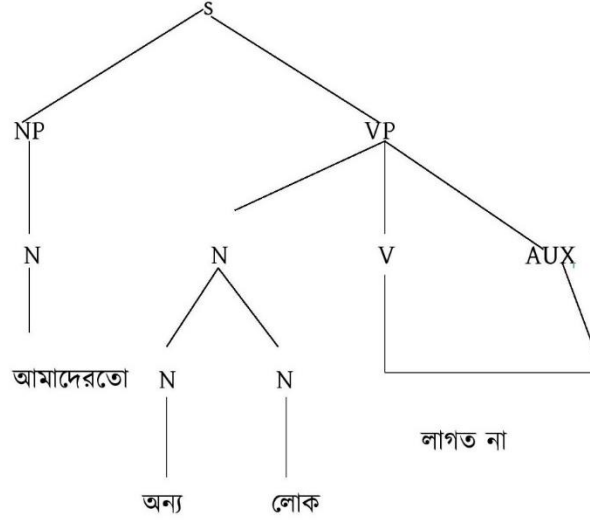
s^1 বসতাম > বসে

s^2 পাড়তাম > পাড়ব

s^3 খেতাম > খাব

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটির বাক্যের গঠনগুলো পরপর রেখে দেখলেই আমরা বুঝতে পারব, বক্তার কথার মধ্যে ক্রিয়ার কাল এক থাকেনা। মূলত অতীত কালের বর্ণনামূলক বিষয়গুলোতে অতীত কালের ক্রিয়ার বদলে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু আবার যখন তারা ঘটমান অতীত ছাড়া সাধারণ অতীতের কথা বলছে তখন তাদের ক্রিয়াপদ ভবিষ্যৎ কালের হচ্ছে না।



ক্রিয়ার কালের এই বিপর্যয়ের মধ্যে তাদের অতীত রোমন্থন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে খেয়াল করব, যে বাক্যগুলো ঘটমান অতীত কালের অর্থাৎ, যেখানে কোনো ক্রিয়ার বর্ণনা করছেন সেখানে কালের বিভ্রাট ঘটছে। বক্তা যখন বলছেন তখন সেই অতীতেই অবগাহন করছেন মনে হচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া ফেলে আসা স্মৃতির ক্রিয়ার কাল ভবিষ্যৎ করে দিয়ে কি আসলে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন সেই স্মৃতিকেই? বাক্যের গঠনের মধ্যে এই অতীতমেদুরতা ছায়া ফেলে যাচ্ছে। কিন্তু যখনই আবার সাধারণ অতীতের বাক্য বলছেন ঠিক তার পরেই, তখন কিন্তু কালের এই বিপর্যয় অনুপস্থিত। যেমন – ‘আমাদের তো অন্য লোক লাগত না’ এই বাক্যে কিন্তু কাল সঠিক। কারণ এই বাক্যে বক্তার বলার সঙ্গে সঙ্গে তার অধিভাষায় উঠে আসছে না অতীত স্মৃতি। এ নেহাতই একটি তথ্য মাত্র। ফলে এখানে, মুসলিম নারীর অতীত কালের বর্ণনার সময় তাঁর স্মৃতি রোমন্থন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে উল্লেখ্য, অল্পবয়সীদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা অনেক কম। তাদের বাক্য গঠনে প্রথগত শিক্ষা, ব্যাকরণের স্থান দৃঢ়। কিন্তু যে প্রজন্মের মহিলারা ছোটবেলাতেই বাবা মায়ের বাড়ি থেকে ছিন্নমূল হয়ে স্থানান্তরিত হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি আকুলতা ধরা পড়ছে তাদের বাক্য গঠনে। হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখিনি। ফলে মুসলিম মহিলাদের অধিভাষার জগতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৪। সম্বোধন পদের বৈচিত্র

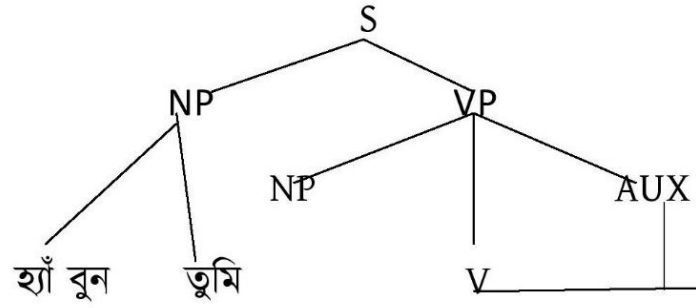
মেয়েদের কথার মধ্যে সাধারণভাবেই ধর্ম নির্বিশেষে আমরা খেয়াল করব, সম্বোধন পদের বৈচিত্র অনেক বেশি। তার একটি অন্যতম বড়ো কারণ হল, অনেক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুরুষদের নাম মুখে আনতে পারে না, চায় না। সামাজিক ট্যাবু সেখানে প্রবলভাবে বিদ্যমান। অন্যদিকে, কিছু ধর্মের ক্ষেত্রেও অনেক সময় বিশেষ বিশেষ সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা দেখব, শ্রী সম্বোধন পদটি হিন্দু সমাজে যত বেশি ব্যবহৃত হয় মুসলিম সমাজে তত হয়না। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমরা চিঠি পত্রে ‘জনাব’ এই সম্বোধন পদটি ব্যবহার করে থাকেন।

এছাড়া মেয়েদের কথোপকথনে সম্বোধন পদের বিচিত্র ও অভিনব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সম্বোধন পদের অবস্থানও বাক্যের একই জায়গায় স্থির নয়। মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বাক্যের গঠনে সম্বোধন পদের অবস্থান ও তার অর্থগত তাৎপর্য আমরা এখন লক্ষ্য করব।

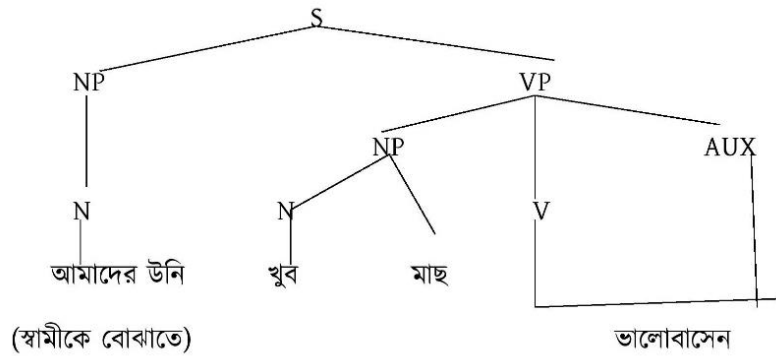
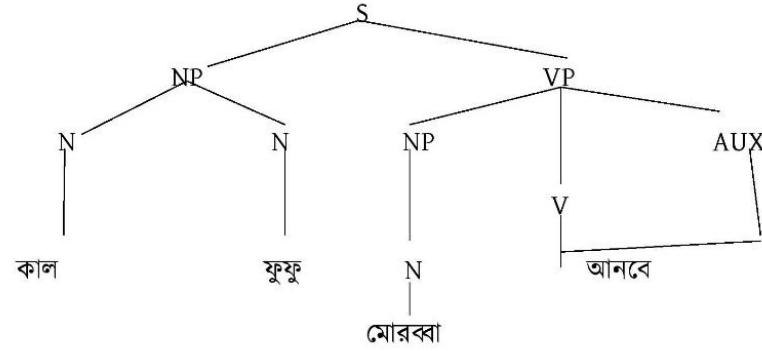
সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ‘জি’ যোগে সম্বোধন করার রেওয়াজ আছে। তবে যেহেতু বাঙালি মুসলিমের একটি আত্মপরিচয়ের সংকট সবসময়ই আছে, তারা কখনো হিন্দু বাঙালির সঙ্গে কখনো অবাঙালি মুসলিমের সঙ্গে নিজের পরিচয়কে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে থাকে ফলে ‘জী’ সম্বোধন অনেক মুসলিম পরিবারে পরিবার-সূত্রে না পেয়েও ব্যবহার করে থাকে। বড়োদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে সাধারণত এই ‘জি’ সম্বোধন পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চল ভিত্তিক মুসলিম মেয়েদের মধ্যেও আমরা কিছু বিশেষ সম্বোধন পদের ব্যবহার দেখতে পেয়েছি। যেমন মুর্শিদাবাদ জেলায় ‘হা বুন’ বলে মেয়েদের মধ্যে কথা বলার প্রবণতা খুব বেশি। মালদার বেশ কিছু জায়গাতেও এর ব্যবহার দেখা যায়। ‘বুন’ যেহেতু শুধু মুসলিমরাই বলে থাকে দিদি বা বোনকে তাই হিন্দু সমাজে এই সম্বোধন পদের ব্যবহার

নেই। যে কোনো অপরিচিত মুসলিম মহিলাকেও তারা 'বুন' বলে সম্বোধন করে থাকে। কিন্তু হিন্দু মহিলাদেরকে সাধারণত তারা বুন বলে না।

এছাড়াও সংসারে স্বামী ভাসুর শ্বশুর দের নাম নিতে নেই এই টাবু অনেক হিন্দু পরিবারে যেমন আছে, অনেক মুসলিম পরিবারেও আছে। সেক্ষেত্রে নামের বদলে বিভিন্নরকম সম্বোধন পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া আত্মীয়বাচক এমন কিছু সম্বোধন আছে যা শুধু মুসলিম মেয়েরাই ব্যবহার করে থাকে। যেমন – ননদ, দেবর, ভাণ্ডর, ইত্যাদি।



যাও



(স্বামীকে বোঝাতে)

ভালোবাসেন

৫। লগ্ন বাক্যের ব্যবহার

মেয়েদের বাক্য গঠন খেয়াল করলে আমরা দেখব, বাক্যের মধ্যে লগ্ন বাক্যের সংযোজন পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে এই লগ্ন বাক্যের সংযোজন অনেকক্ষেত্রেই বক্তার আত্মবিশ্বাসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অঞ্চল ভেদেও আমরা এই লগ্ন বাক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য দেখতে পাব। যেমন মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ‘লায়’ ‘তাই না’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা অঞ্চলে আমরা দেখব ‘তাই না’ কথাটি মেয়েরা কোন নিজস্ব মতামত বা মন্তব্যের পর শ্রোতার অনুমোদন লাভের ক্ষেত্রে বলে থাকে। এমন নয় যে পুরুষেরা এই পদটি ব্যবহার করে না, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এর ব্যবহার অনেক বেশি।

এরকম বেশ কিছু বাক্যের উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি

১। তোমরা কাল এসছো লায়?

২। “আজ বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, না?”

৩। “এই শাড়িটা পরবো? ভালোলাগবে?”

৪। “আমার কি এটা করা উচিত হবে, কি বলিস?”

৫। “একটু মধু খাওয়া ভালো, না , এই সময় ?”

৬। “রাতে বেরোব না সকালে যাব বলতো”

৭। “এই লোকটা কি ভালো, কি মনে হয় তোর?”

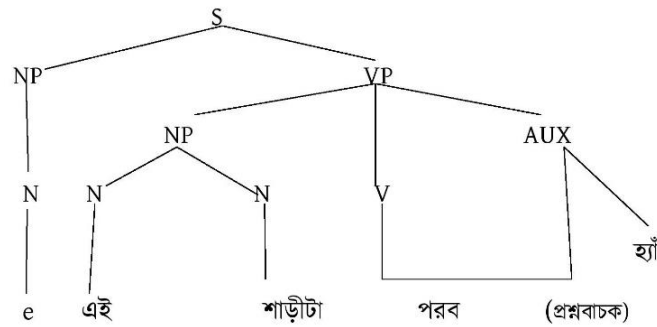
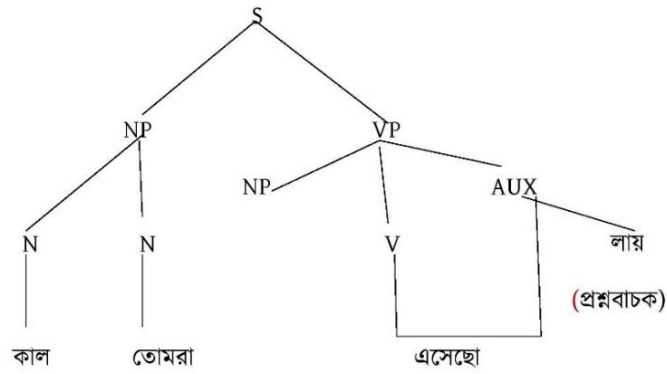
৮। “রাতের বেলা আয়াতুল কুরসি পড়ে শোওয়া ভালো , তাই না?”

৯। “আজান দিলে মাথায় কাপড় দিতে হয়, বুঝলি ?”

১০। “বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িটাই আসল বাড়ি হয়ে যায়, তাই না?”

উপরোক্ত বাক্যগুলি খেয়াল করলে আমরা দেখব, দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নানা মন্তব্যের পর, কখনো মন্তব্যের আশায় মেয়েদের বাক্য গঠনে লগ্ন বাক্যের সংযোজন ঘটেছে।

আবার ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও লগ্ন বাক্যের আগমন ঘটেছে। এইভাবে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বাক্য তুলে এনে মেয়েদের তথা মুসলিম মেয়েদের বাক্যে লগ্ন বাক্যের প্রয়োগ যে অধিক পরিমাণ তা বোঝা হয়তো অনেক সময় অসুবিধেজনক। কিন্তু এক বা একাধিক মেয়েদের কথাবার্তা বা কথোপকথন দীর্ঘদিন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পারব যে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কথায় লগ্ন বাক্যের ব্যবহার অনেক বেশি। তাদের বাক্য গঠনে এই লগ্ন বাক্যের আধিক্য তাদের ভাষার শব্দার্থতাত্ত্বিক এবং অধিভাষায় বিশেষ জগতকে চিহ্নায়িত করে।



৬। একই শব্দের বারংবার ব্যবহার

১। পরে না বিধবারা পরে না আমাদের সাইটে এখানে।

২। আসতো, আগে যখন ঘেরা ছিল না তখন আসতো

৩। এখন কোন উপায় নেই, পাসপোর্ট ছাড়া উপায় নেই এখন।

৪। আত্মীয় স্বজন এখন প্রচুর, বাংলাদেশে সবারই প্রচুর আত্মীয় স্বজন

৫। জমি ওখানে আছে, মানে সবারই জমি ওখানে আছেই

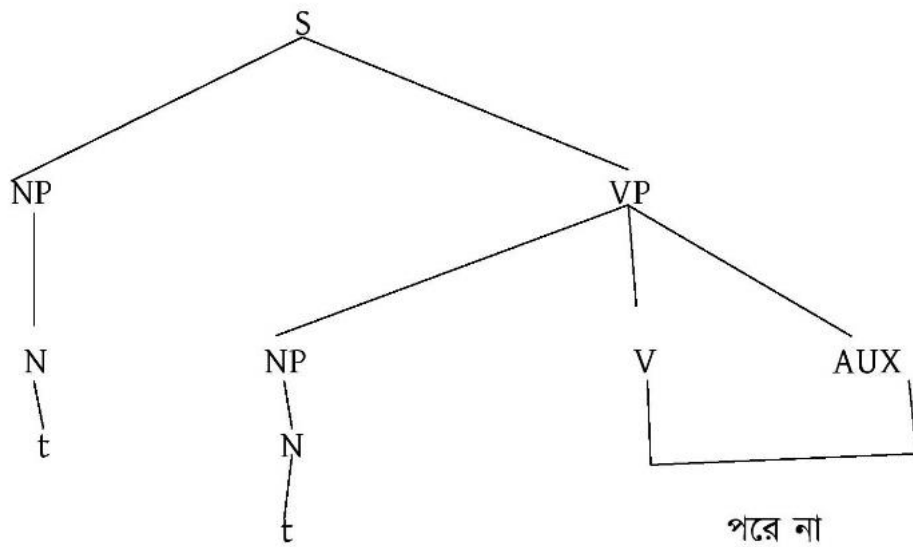
৬। হয় না, ওই জমিগুলোতে কিছু হয় না

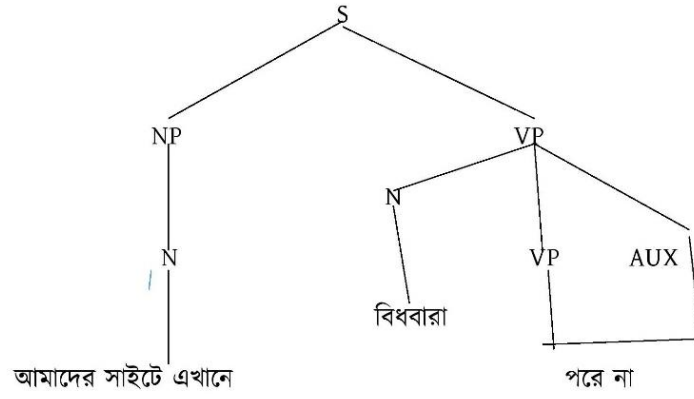
৭। বাড়িয়ারা ঝাল খায় বেশি ঝাল খায়

৮। আর খাবারদাবার আমাদের থেকে বেশি খায়, বেশি খায়

মেয়েদের বাক্য গঠন খেয়াল করলে আমরা দেখব, তাদের কথায় একই কথার পুনরাবৃত্তি

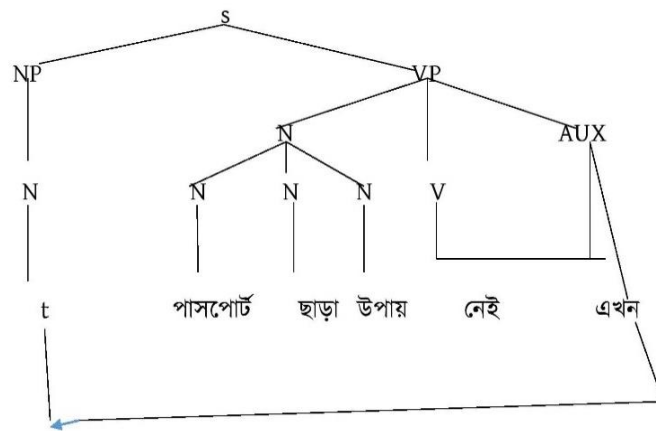
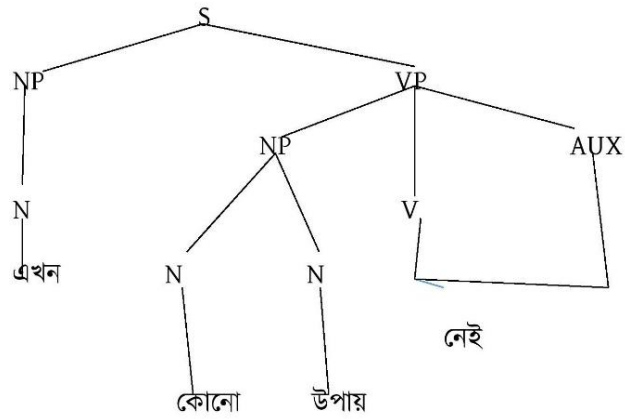
অনেক বেশি। উপরোক্ত বাক্যগুলি খেয়াল করলে আমরা সেটা বুঝতে পারব।





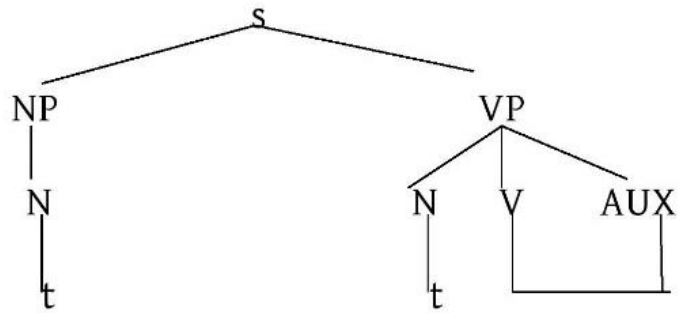
বাক্যের প্রথম অংশে কিছু অংশ উহ্য রাখলেও পরের অংশে সেই অংশটি বক্তা নিজেই পরিস্ফুট করে দিচ্ছেন অনেকসময় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এখন কোন উপায় নেই, পাসপোর্ট ছাড়া উপায় নেই এখন।

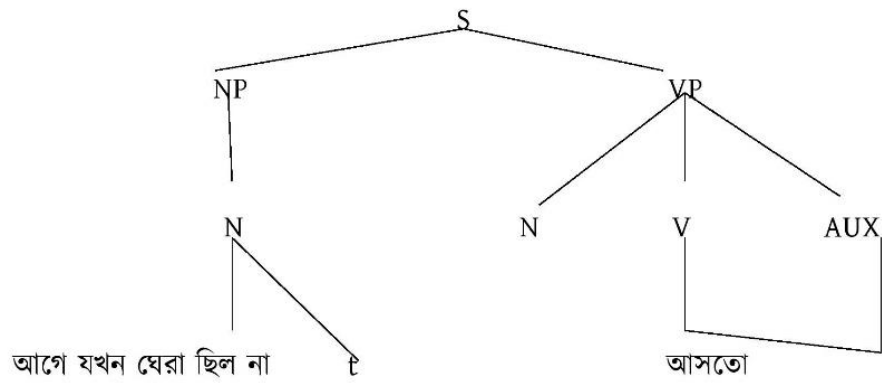


alpha movement

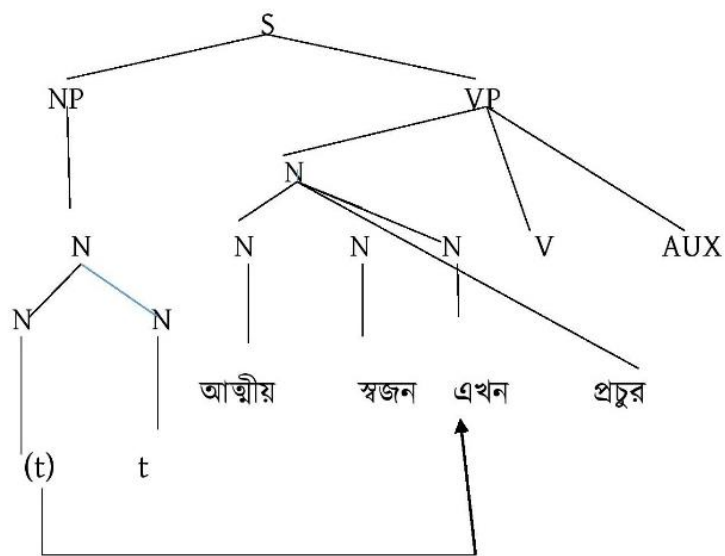
আসতো, আগে যখন ঘেরা ছিল না তখন আসতো



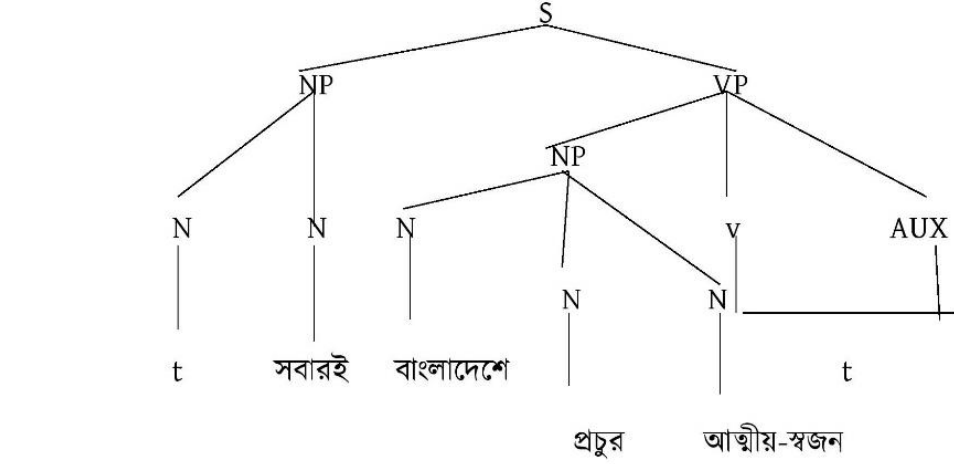
আসত



আত্মীয় স্বজন এখন প্রচুর, বাংলাদেশে সবারই প্রচুর আত্মীয় স্বজন



ALPHA MOVEMENT



৭। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

আমরা ব্যাকরণ এর শুরুর অধ্যায়ে ছোটবেলায় জেনেছিলাম প্রতিটি পূর্ণ ও আদর্শ বাক্যে এক বা একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে কিন্তু একটি সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই থাকবে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখে থাকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে context এ বাংলা ভাষায় এই অসমাপিকা ক্রিয়ার গুরুত্ব সমাপিকা ক্রিয়ার থেকে কোনো অংশ কম তো নয়ই বরং কথার মারপ্যাঁচে এই অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি রসায়ন শাস্ত্রের অনু পরমানু গুলোর মতোই ব্যাকরণগত উপাদানে ছোটো হলেও ভয়ংকর শক্তিশালী।

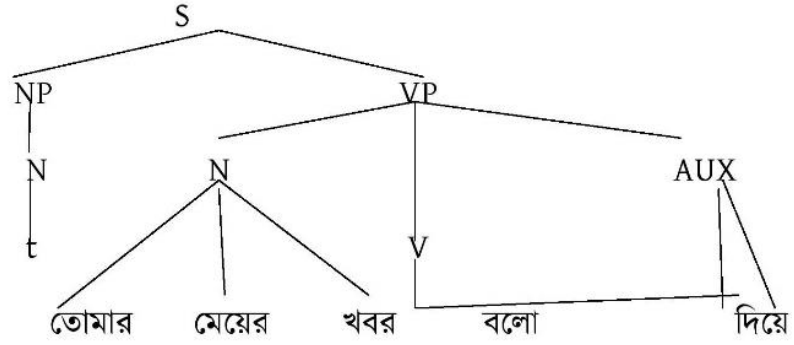
কিছু কিছু ক্ষেত্রে বক্তা এই অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি দিয়ে বাক্যও শেষ করে দেন। বাক্যের পরিপূর্ণ ভাব বা প্রকাশ তখন বেশ কিছুটা গিয়ে বর্তায় শ্রোতার কাছে। তবে অবশ্যই এই ধরনের কথোপকথনের সুযোগ ব্যক্তিগত স্তরে যতটা থাকে ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক স্তরে ততটা থাকে না।

মেয়েদের কথায় আমরা অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার দেখতে পাব।

- বাক্য আলংকারিক অসমাপিকা ক্রিয়া

মেয়েদের ভাষায় বেশ কিছু অসমাপিকা ক্রিয়া এমন দেখা যায় যা বাক্যের প্রথমে বসে প্রসঙ্গান্তরে যেতে সাহায্য করে থাকে ।

যেমন – দিয়ে বল তোমার মেয়ের কী খবর ? এখানে, ‘দিয়ে’ এই অসমাপিকা ক্রিয়াটির এই বাক্যে কোনো নির্দিষ্ট thematic role নেই। বাক্যে অনেকাংশে আলংকারিক বা কথা শুরু বা কখনো প্রসঙ্গান্তরে যেতে সাহায্য করে থাকে ।



এখানে কর্তা বা N উহ্য আছে (t). ‘দিয়ে’ সংযোজন করে বাক্য গঠিত হচ্ছে।

- অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত ব্যবহার

অতীত কালের স্মৃতিচারণের সময় মুসলিম মেয়েদের মুখে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত ব্যবহার আমরা খুব বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করতে পারি।

যেমন- আমরা খেতে খেতে কত কথাই না বলব! –

এখানে দেখব এই অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত ব্যবহার ঘটমান কালের চিহ্নক রূপে প্রতীকায়িত।

আবার বিষয়টা আমি তখন খাচ্ছিলাম এর থেকে ভিন্নও। আমি তখন খাচ্ছিলাম বললে তা সরাসরি অতীত কালের কথা বলছে। কিন্তু মূল বাক্যটি যদি ঘটমান অতীত না হয় কিন্তু অতীতে কোনো একটি কাজ করার সময় আর একটি কাজ করা হত – সময়ের এই

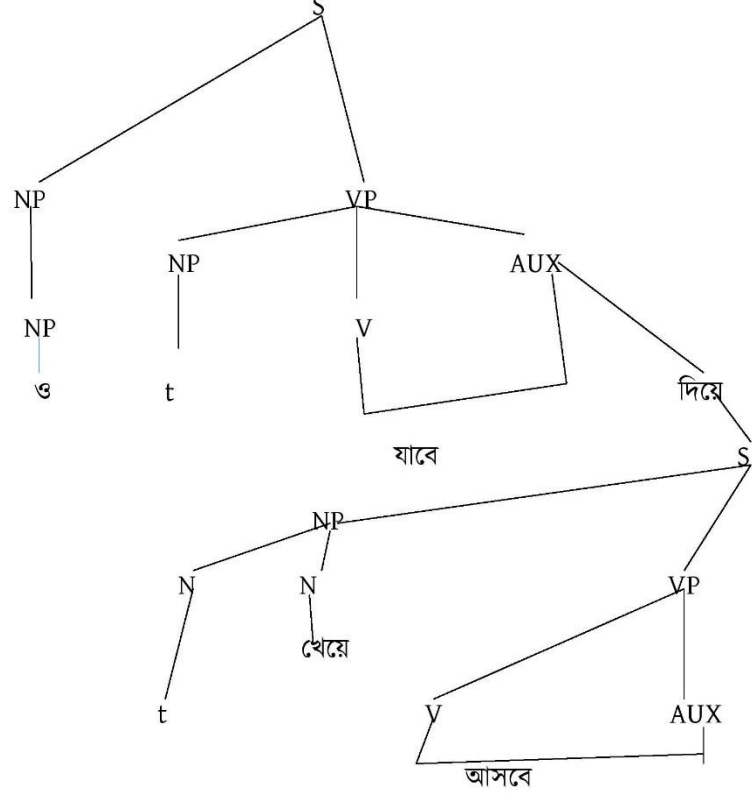
```

graph TD
    S --> NP1[NP]
    S --> VP1[VP]
    NP1 --> N1[N]
    N1 --> Amra[আমরা]
    VP1 --> NP2[NP]
    VP1 --> V1[V]
    VP1 --> AUX[AUX]
    NP2 --> N2[N]
    NP2 --> N3[N]
    N2 --> Koto[কত]
    N3 --> Kothai[কথাই]
    V1 --> V2[V]
    V1 --> V3[V]
    V1 --> V4[V]
    V2 --> Khete1[খেতে]
    V3 --> Khete2[খেতে]
    V4 --> Bolbo[বলব]
    AUX --> Na[না]
  
```

অতীত কালের ঘটমান অতীতকে অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বুঝিয়েছে। কিন্তু ক্রিয়ার কাল আমরা দেখলাম ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া হয়ে গেছে। এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলাংকারিক ‘না’।

- তার বদলে আমরা দেখব পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলাতেই মুসলিম মেয়েরা এটিকে এভাবে বলছে। অর্থাৎ, গিয়ের পরিবর্তে যাব বলে আর একটি অসমাপিকা ক্রিয়া ‘দিয়ে’র আবির্ভাব

ঘটানো হচ্ছে। এখানে ‘দিয়ে’ অসমাপিকা ক্রিয়াটি পুরোপুরি আলংকারিক থাকছে না আর।
বাক্যের দুটো clause কে এখানে যুক্ত করছে দিয়ে এই অসমাপিকা ক্রিয়াটি। ফলে এখানে
অনেকটা অব্যয়ের মতো কাজ করছে এই ‘দিয়ে’ অসমাপিকা ক্রিয়াটি।



যাবে শব্দটিকে গিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াতে রূপান্তরিত করে না বলে তারা আর একটি
অসমাপিকা ক্রিয়া ‘দিয়ে’ কে সংযোজন অব্যয় হিসেবে ব্যবহার করছে। যৌগিক বাক্য গঠন
হচ্ছে এখানে। তারা জটিল বাক্য বেশি ব্যবহার করছে না।

- প্রশ্নসূচক অসমাপিকা

কখনো কখনো অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে আমরা প্রশ্নও করে থাকি। তবে সেক্ষেত্রে
বেশিরভাগ সময়ই সেই অসমাপিকার ব্যবহার context sensitive হয়। অর্থাৎ, কোনো
কথোপকথনের আরম্ভের প্রশ্ন অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে হয় না। কথা শুরু হওয়ার পর বক্তার

কাছে সেই বিষয়ে আরোও বেশি কিছু তথ্যের জন্য শেষ হওয়া সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা বোঝানো হল –

- আমি সবাই মিলে রোববার খালার বাড়ি গিয়েছিলাম।
- গিয়ে?
- এখানে আমরা দেখছি প্রথম ব্যক্তি তার কথা যেটুকু ছিল বলে সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের ইতি টেনে দিলেও দ্বিতীয় জন আরো কিছু শোনার প্রত্যাশী। সেখানে গিয়ে কী হল সেই বিষয়ে জানতে প্রথম জনের সমাপিকা ক্রিয়াকে সে অসমাপিকা করে দিয়ে প্রশ্ন করছে। তার কাছেও এই ক্রিয়াটা অসমাপিকা ক্রিয়া রেখে অন্য কোনো ক্রিয়াকে সমাপিকা ক্রিয়া করতে চাইছে।

এখানে দ্বিতীয় জন আসলে খুব সুন্দর করে বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারকে নিজের কৌতূহল মেটাতে স্বল্প কথায় বা বলা ভালো একটি শব্দে ব্যবহার করছে।

একাধিক অসমাপিকা একাধিক বাক্যখন্ড বা clause কে যুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ একই বাক্যে অনেকগুলো বাক্যকে বিগরভিত করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে। যেমন –

“ঠামি বাড়ি গিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে চাটাই বুনে চা করে খেয়ে শাউড়ির দিয়ে আবার চলে এলুম।”

- এই বাক্যটি deep structure এ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে

এখানে মোট টি বাক্য আছে-

ক। আমি বাড়ি গিয়েছি

খ। আমি খেয়েছি

গ। আমি চাটাই বুনেছি

ঘ। আমি চা করেছি

ঙ। আমি চা খেয়েছি

চ। আমি শাশুড়িকে চা দিয়েছি

ছ। আমি আবার চলে এলাম

বাক্যের কর্তা একই জন হলে এভাবে অসমাপিকা ক্রিয়া একই বাক্যের মধ্যে অনেকগুলি বাক্যকে বিগর্ভিত করে নিতে পারে। কোথাও কোথাও বক্তা অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়েই দুম করে বাক্য শেষ করে দিচ্ছে। বা বাক্য শেষ না করেই অন্য বাক্যে চলে যাচ্ছে।

বাক্যের অসমাপিকা ক্রিয়া অনেকসময়ই বক্তার আক্ষেপ অনুশোচনাকেও নির্দেশ করে থাকে।

- ইচ্ছাকৃত অসম্পূর্ণ বাক্য

অনেক সময় দেখা যায় বক্তা কিছু বলতে চাইছেন কিন্তু বলতে ইতস্ততও করছেন। সেই সময় দেখা যায় অসমাপিকা ক্রিয়াতে এসে বাক্য থামিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন, আর এগোতে পারছেন না। কিন্তু বাক্যের গঠন থেকে সুস্পষ্ট যে তার আরো কিছু বক্তব্য আছে।

যেমন-

১। ওখানে গিয়ে

২। না মানে আমি খেয়ে আর

৩। আমি ওখানে শুয়েছিলাম, কিন্তু শুয়ে দেখি

অসমাপিকা ক্রিয়াতে সমাপ্ত বাক্যের অর্থ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কন্টেক্সট সেন্সিটিভ। কোন বিষয়ে বলা হচ্ছে সেটা না বুঝলে অসমাপিকা দিয়ে গঠিত বাক্যের অর্থ অনেকসময়ই বোঝা যাবে না।

অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার মানুষ প্রাধানত দুটো কারণে করে থাকেন। এক, বক্তা সচেতনভাবে নিজের বক্তব্যটি অর্ধসমাপ্ত ছেড়ে দিয়ে শ্রোতার উপলব্ধির উপর ছেড়ে দিতে চাইছেন। হয়ত, সেটাই তাঁর অভিপ্রায়। বা এর অন্য একটি কারণ হতে পারে, সংকোচ বা লজ্জাবশত বা সামাজিক কোনো ট্যাবুর কারণে বক্তা এমন করছেন। মুসলিম মেয়েদের ভাষায় আমরা অনেক এই ধরনের অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখতে পাব।

কথোপকথনের প্রেক্ষিতে না বুঝলে এই অসমাপিকা ক্রিয়াহীন বাক্যের অধিভাষা বোঝা সম্ভব হবে না। এখানেই বক্তার মনোভাষাবিজ্ঞান ও সমাজভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্ব। বক্তা সংকোচ বশত বাক্য পূর্ণ করেননি না ইঙ্গিত ব্যক্ত করেই সমাপ্ত করতে চাইছেন তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। মেয়েদের ভাষা অনেক বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ। মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই ইঙ্গিত আমরা খেয়াল করতে পারি।

এখানে যে সমস্ত বাক্যের গঠন ও তাদের প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করা হল তা যে একমাত্র মুসলিম মেয়েদের কথাতেই আমরা দেখতে পাব, এমন নয়। পুরুষদের মধ্যেও অনেকসময় এইরকম বাক্য গঠন আমরা দেখতে পাব। তবে তা নারীদের তুলনায় অনেক কম। আবার আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের স্বাভাবিক সংকোচ, দ্বিধা যা তাদের বাক্যকাঠামোতে ধরা পড়েছে তা শুধু মুসলিম মেয়েদেরই বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য নয়। হিন্দু মহিলাদের বাক্য গঠনেও আমরা এই প্রবণতার দিকটা লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের সার্বিক শিক্ষার অভাব ও বেহাল অর্থনীতি তাদের সামাজিক অবস্থানকে আরও প্রান্তিক করে তুলেছে। যার ফলে তাদের বাক্য গঠনে এই দিকগুলি বেশি উঠে আসছে

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীর মুখের গল্প-কথা ও অধিভাষার জগৎ

মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মৌখিক ঐতিহ্য প্রবহমান মানুষের মধ্যে। দৈনন্দিন জীবন যাপনের সাধারণ গল্প থেকে শুরু করে নানারকম সংস্কার কিংবদন্তী মিথ মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে যুগ যুগ ধরে। সেসবের লিখিত নিদর্শন নেই। মৌখিক বলেই তার নিজস্ব এক ছন্দ গতি আছে। বেশিরভাগ সময়ই তা বিশেষ কোন একটি বিশেষ ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। কত যুগের কত মানুষের মুখ ফেরত হয়ে তা প্রায়শই দেশ থেকে দেশান্তরেও পাড়ি দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, অনেক অনুশাসন অনেক সময় আমরা দেখতে পাই মৌখিক রীতির মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। বেদের অপর নাম শ্রুতি। ইসলাম ধর্মের হাদিসের বেশিরভাগ বিষয়ই মৌখিক অনুশাসন থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চলমান সমাজের অতীতের কথকতা যেমন ধরা থাকে এখানে, তেমন বর্তমানের ছায়াপাতও ঘটে। যুগে যুগে দেশে দেশে মানব সভ্যতার কৃষ্টির ধারক ও বাহক হয়ে আছে মৌখিক রীতি। ধীরে ধীরে লিপি এসেছে। মুদ্রিত হয়েছে ইতিহাস সংস্কৃতি ধর্ম। তবুও মৌখিক রীতির গুরুত্ব পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারেনি। মৌখিক রীতির নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য মুদ্রণ তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারেনি।

মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন লোকাচার ব্রত গল্পগাথা রূপে যেভাবে প্রবহমান ছেলেদের মধ্যে সেরকম নয়। প্রতিদিনের যাপনের বিভিন্ন লোকাচার রীতি রেওয়াজ মেয়েদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর এই সমস্ত লোকাচারের বেশিরভাগটাই মৌখিক রীতিতে পালিত হয়। বিভিন্ন প্রাচীন গল্প মিথ কিংবদন্তির গল্পও মেয়েদের মধ্যে দিয়ে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। এখনও যেহেতু মেয়েদের জীবনের অনেকখানি অংশ ঘরের মধ্যে কাটে এবং বাইরের বিনোদনের বিকল্প কম তাই ঘরের মধ্যেই

অবসর যাপনের সময় বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে তারা গল্প গুজবকে আশ্রয় করে। ফলত, মেয়েদের গল্প বলার একটি ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে।

মুসলিম বাড়িতেও মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন রকম গল্প বলার একটা রেওয়াজ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। গল্পের বিষয়বস্তুও বিভিন্নরকমের। শিশুদেরকে গল্প শোনানোর যে ধারা দীর্ঘদিন ধরে সর্বত্রই প্রায় প্রচলিত খেয়াল করলে দেখা যাবে সেই ঐতিহ্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শিশুদের সামনেও খুলে যাচ্ছে বিনোদনের অনেক অনেক বিকল্প উপাদান। টিভি মোবাইল ইউটিউব ছাড়াও ইন্টারনেটের বিচিত্র মোহময়ী ঝলমলে ভুবন তাদেরকে গল্প বিমুখ করে তুলছে। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েদের মধ্যেও গল্প বলার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু শিশু মনের উপযোগী রূপকথার গল্প, নীতিমূলক গল্প কোনো কোনো পরিবারে এখনো প্রচলিত। এছাড়া মুসলিম পরিবারে ধর্মীয় নীতিকথা মূলক গল্প, হাদিস কোরানের গল্পও প্রচলিত আছে। এছাড়া সমস্ত জাতি বা গোষ্ঠীতে তাদের নিজস্ব মিথের গল্পও প্রচলিত থাকে। ইসলামিক বিভিন্ন মিথের গল্পও আমরা মুসলিম পরিবারে গল্পের মতো করেই বলা হয় দেখতে পাই।

গল্প বলার প্রথা মেয়েদের মধ্য আদি কাল থেকেই আছে। কখনো সংসারের প্রয়োজনে কখনো ব্রত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দৌলতে মেয়েরা ছড়া কেটেছে, গান গেয়েছে বা গল্প বলেছে। সাধারণ দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও আমরা খেয়াল করলে দেখব, মেয়েদের কথায় প্রবাদ ছড়া ইত্যাদির ব্যবহার অনেক বেশি।

প্রচলিত রূপকথার গল্প বা কোরান হাদিসের গল্প মেয়েরা যেমন বলে থাকে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ছোটোখাটো মুহূর্ত বা ঘটনাও মেয়েরা যেভাবে বলতে পারে পুরুষদের আমরা ততটা দেখিনা। ঘর অন্তর্জগৎ যেহেতু মেয়েদের জীবনের সিংহভাগ জুড়ে থাকে ঘরের মধ্যেই

বিনোদনের রসদ খুঁজে নেয় তারা। হাতের কাজ সারতে সারতে দল বেঁধে গল্প করার প্রবণতা মেয়েদের তাই একেবারে নিজস্ব ধরন।

হাদিস কোরানের বিভিন্ন গল্পতে আমরা খেয়াল করব যে, ইসলামিক বিভিন্ন মিথ উঠে আসছে। আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে আমরা জানি বেশ কিছু একইরকম মিথীয় চরিত্র আছে। আদম হাওয়া ইব্রাহিম ইত্যাদি চরিত্রগুলো সেখানে অল্প বিস্তর গল্প পালটিয়ে একইরকমভাবে আবির্ভূত হতে থাকে। এছাড়া কাবা শরিফ তৈরি বা শয়তান ইবলিশকে নিয়েও বহু গল্প আমরা দেখব ইসলামে আছে। সেইসব গল্প যদিও নারী পুরুষ উভয়েই বলে থাকে।

গল্প বলার চল বিভিন্ন কারণে ঘটে থাকে পরিবারের মধ্যে। ছোটোদেরকে গল্প শোনানো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এছাড়া সকলের মনে ধর্মভাব বজায় রাখতেও, ইসলামের আদর্শ নীতি অনুশাসনগুলি মনে করিয়ে দিতেও বিভিন্নরকম গল্প বলা হয়ে থাকে। ছোটোদেরকে গল্পও বিভিন্ন কারণে শোনানো হয়ে থাকে। কখনো তাদের দৌরাভ্যের হাত থেকে বাঁচতে, তাদেরকে শান্ত রাখতে। বা অনেক সময় ছোটোদের চরিত্র গঠনে সাহায্য করতে বিভিন্ন নীতিকথা মূলক গল্প শোনানো হয়। আবার সুকুমার মনে কল্পনাশক্তির জাগরণে সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন রূপকথার গল্প শোনানো হয়। ধর্মীয় অনুশাসন ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতেও বাচ্চাদেরকে কোরান হাদিসের বিভিন্ন গল্প বলা হয়। ছোটোদেরকে গল্প পরিবারের সবাই বললেও মেয়েরা ঘরে বেশি সময় কাটানোর জন্য ও সন্তান প্রতিপালনের বেশিরভাগ দায়িত্ব মেয়েদের উপর অর্পিত থাকে বলে তারা ছোটোদেরকে বেশি গল্প বলে থাকে

বাড়ির মেয়েরা নিজেদের মধ্যে অবসরে বা কাজ করতে করতে কাজের একঘেয়েমি কাটাতে গল্প করে থাকেন। পরিবারের সকলে মিলে গল্প করে থাকেন। পরিস্থিতি শ্রোতার উপর নির্ভর করে গল্পের ধরন বিষয়বস্তু বদলে যায়।

আমরা মুসলিম পরিবারের মেয়েদের থেকে এখানে বিভিন্ন গল্প সংগ্রহ করেছি। কিছু গল্প বর্তমান গবেষকের নিজের জানা পরিবার সূত্রে। যে সমস্ত গল্প পেয়েছি তাদেরকে বিষয়বস্তুর নিরিখে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা –

১। রূপকথার গল্প

২। পশু-পাখির বিভিন্নরকম গল্প

(এর মধ্যে পশুপাখির গল্পগুলো আমরা এর অন্তর্ভুক্ত করিনি। শেয়াল, বাঘ কুমীর ইত্যাদি বিভিন্ন পশু পাখির গল্পগুলো সব পরিবারেই এক। হিন্দু মুসলিম ভেদে তা পার্থক্য সৃষ্টি করেনি একেবারেই।)

৩। হাদিস-কোরানের গল্প

৪। সাহাবা বা হজরত মহম্মদ বা তাঁর আত্মীয়স্বজনদের জীবনের বিভিন্ন রকম গল্প

বিভিন্ন সময় বা t এবং স্থান বা w এর সমাহারে বিভিন্ন রকম মৌখিক গল্প জন্মায় এবং তা প্রবাহিত হয় নিজের নিয়মে। অনেকসময় পুরনো গল্পের metalanguage বা অধিভাষাকে সময়ের (t) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা হৃদয়ঙ্গম করে ভিন্নভাবে। আমরা গল্পগুলি আলোচনার সময় সেদিকটির প্রতিও দৃষ্টি দেব।

● ধার্মিক ব্যক্তির ফল লাভ

এক পরহেজগার ব্যক্তি নদীর ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে থাকায় তার খিদে পেয়ে গেছিল। এমন সময় হাঁটতে হাঁটতে সে হঠাৎ দেখে পানিতে একটা আপেল ভেসে আসছে। তারপর আপেলটা যখন তার কাছাকাছি চলে আসে সে কোনোকিছু না ভেবে আপেলটাকে নদী থেকে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেলে। খাওয়ার পর তার খিদে মেটে। তারপর

তার মনে হয় সে না বলে অন্যের জিনিস খেয়ে ফেলেছে। কারণ কার গাছের ফল সে জানে না। এরপর সে খুব অপরাধবোধে ভুগতে থাকে। আর কার গাছের আপেল সে খেয়ে ফেলেছে তা খোঁজার চেষ্টা করে। দেখতে থাকে যে আশেপাশে কোথায় আপেল গাছ আছে। এরপর সে চারিদিকে খোঁজ করতে থাকে। অনেক হেঁটে হেঁটে সে একটা বাড়ির বাইরে একটা আপেল গাছ দেখতে পায়। সেই গাছে অনেক পাকা আপেল হয়ে ছিল। তারপর সে ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করে। দেখা হওয়ার পর সে নিজের ভুল স্বীকার করে আর তার অপরাধের শাস্তি সে মাথা পেতে নিতে চায়। বাড়ির মালিক বুঝতে পারে যে ছেলেটি খুবই নেক বান্দা। তখন সেই বাড়ির মালিকটা তাকে বলে যে এই অপরাধের শাস্তি হল তার কালা খোঁড়া ও অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। আর তার বাড়িতে এক মাস ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। তাহলেই তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

বাড়ির মালিকের এই শাস্তি ওই পরহেজগার ব্যক্তি মাথা পেতে নেয়। এক মাস ক্রীতদাস হিসেবে থাকার পর তার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হয়। তবে এই এক মাস একবারের জন্যও সে মেয়েটির দেখা বা গলার আওয়াজ পায়নি। এরপর বিয়ের রাতে যখন প্রথম মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় তখন দেখে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে। কোথাও তার কোনো খুঁত নেই। তখন সে ভাবে যে ভুল করে হয়তো সে অন্য ঘরে ঢুকে পড়েছে। তখন বাইরে এলে মেয়েটির আব্বাজি তাকে জানায় যে এই কালা খোঁড়া অন্ধ মেয়েটির কথাই সে বলেছিল। সে কালা কারণ সে খারাপ কিছু শোনেনি কখনো। খোঁড়া কারণ কোনো খারাপ জায়গায় আজ পর্যন্ত সে যায়নি। আর অন্ধ কারণ কোনো পর পুরুষের মুখ দেখেনি সে। তার সততায় খুশি হয়ে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এরপর ব্যক্তিটি খুশি হয় ও তারা সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ‘Morphology of the FOLKTALE’ এ প্রপ যেভাবে রূপকথার গল্পের গঠন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গঠনরূপের কথা বলেছেন সেইভাবে এই বিভিন্ন গল্পগুলোর গঠনকে দেখা যায় কি না তা দেখব। গল্পটির গঠনকে আমরা প্রপ এর বিভিন্ন ফাংশান দিয়ে বুঝতে পারি কি না এবার আমরা সেটা দেখব।

১। definition – absentation

গল্পের প্রথমে পরিবারের একজন বাড়ি থেকে অনুপস্থিত হয়। এখানেও আমরা দেখি গল্পের পরহেজগার ব্যক্তি নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

২। definition – interdiction

কারোর জিনিস বা বিষয় না বলে গ্রহণ করা পাপ – এই নিষেধ বাণী গল্পে বলা না হলেও এটি পরহেজগার ব্যক্তি মাত্রই জানেন এইরকম ধারণা গল্প থেকে পাওয়া যায়।

৩। definition – violation

এখানে আমরা দেখি খিদের বশে সেই ব্যক্তি নদীতে ভেসে আসা আপেল খেয়ে ফেলেন। অর্থাৎ একটি নিষিদ্ধ ও অধার্মিক আচরণ করে ফেলেন

এরপর আমরা দেখব, প্রপের বিভিন্ন ফাংশান এই গল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে না। কারণ এই গল্পের গঠন অনেক সরল। অনেক চরিত্রের আগমনও এখানে নেই। এছাড়া তথাকথিত ভিলেনও এই গল্পে নেই। কিন্তু সেইসব দিকগুলো বাদ দিলে আমরা দেখব যে গল্পের কাঠামো পরের ফাংশানগুলোর সঙ্গে যাচ্ছে কিনা।

৪। A DIFFICULT TASK IS PROPOSED TO THE HERO (XXV)

এখানে আমরা দেখব, আপেল গাছের মালিক সেই ব্যক্তিকে এক মাস বাড়িতে ক্রীতদাস হিসেবে থাকতে বলে যাতে সে তার চরিত্রের দোষ গুণ খুব কাছ থেকে দেখতে পারে। এবং তার কানা খোঁড়া কালা মেয়েকে বিয়ে করতে বলে।

৫। THE TASK IS RESOLVED

আমরা দেখি গল্পের নায়ক তার উপর অর্পিত কাজটি সুসম্পন্ন করে। খুব বিস্তারিত বর্ণনা এই ঘটনার গল্পে পাওয়া যায় না।

৬। THE HERO IS MARRIED

আমরা দেখি গল্পের শেষে ব্যক্তিটির বিয়ে হয়ে যায়। যদিও জানা যায় মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। এখানে আমরা দেখলাম গল্পটা যদিও খুব ছোটো এবং সরল সে ক্ষেত্রেও গল্পের ক্রমে আমরা প্রপের ফাংশানগুলোর ক্রম এর সমন্বয় লক্ষ্য করলাম। যদিও স্বাভাবিক কারণেই মাত্র ৬টি ফাংশান এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই গল্পটির মধ্যে চারিত্রিক বিভিন্ন গুণাবলী যেমন সৎ বিবেকবান মানুষের পুরস্কার লাভের কথা আছে। অন্যদিকে মেয়েদের চরিত্রের মধ্যে কাজীকৃত দিকগুলি এবং তার সৌন্দর্য পুরুষের কাছে মহার্ঘ্য পুরস্কার স্বরূপ তাও জানানো হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের অন্তঃপুরে অবস্থান ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগহীন থাকাকে মেয়েদের ভালো গুণের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। পরোক্ষভাবে আদর্শ নারী পুরুষের চরিত্রের প্রতিও দিক নির্দেশ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে এই গল্পটির গঠনটি রূপকথার মতোও।

এই গল্পটি শুনেই আমরা বুঝতে পারি এই গল্পের সময়কাল বর্তমান সময় থেকে অনেক পিছনের। আবার সম্ভবত হজরত মহম্মদের ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগে এই গল্পের

সময়কাল হতে পারে না তাও বোঝা যাচ্ছে। কারণ এই গল্পে ইসলাম ধর্মের অনুশাসনগুলো নীতিগল্পের মতো করে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং গল্পের যে স্থান তার ভৌগোলিক অবস্থান, শুধু এ রাজ্য নয় এ দেশেরও বাইরে। অর্থাৎ, এই গল্প বহির্দেশ থেকে আসা একটি গল্প যা সম্ভবত অন্য ভাষা থেকে এসছে। তারপর এই দেশের মুসলিমদের মধ্যেও এই গল্প ছড়িয়ে গেছে। এ দেশের সংস্কৃতি ভাষার সঙ্গে মিশে গল্পটি খানিক এদেশের আকার লাভ করেছে। ফলে এই গল্পটিতে অনেকরকম স্থান বা w এর সম্মিলন ঘটেছে। আর একটি নির্দিষ্ট সময়ে তা তৈরি হয়েও অনেকগুলো সময়কে (t) ধারণ করে আছে। একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা তাদের নিজেদের জীবনের প্রায় কোনো সিদ্ধান্তই নিজে নিতে পারত না। এই গল্পে আমরা দেখি মেয়েটি গল্পে একেবারে নিষ্ক্রিয় একটি চরিত্র হিসেবে রয়ে গেছে। সে কাকে বিয়ে করবে বা করতে চায় তা ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনি। রূপকের মধ্যে দিয়ে তার চক্ষু কর্ণ ও পায়ের ব্যবহারহীনতাকে গ্লোরিফাই করা হয়েছেও। ধরে নেওয়া যায় তা তার স্বেচ্ছায় নেওয়া সিদ্ধান্ত নয়। বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো মানসিক পরিসর তাকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই অতীত সময়ের আদর্শ নারীর সংজ্ঞাকে যখন বর্তমান সময়ে গল্পের মাধ্যমে হলেও বলা হচ্ছে তখন আসলে পুরাতন আর নতুনের দ্বন্দ্বের, ইসলাম এবং আধুনিক সমাজের বিপ্রতীপতায়, ব্যক্তিস্বাভাব এবং পিতৃতান্ত্রিকতার বিরোধে মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম নারী মননকে পুরনো ভাবাদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম মেয়ের অন্তর্জগতে বিভিন্ন দ্বন্দ্বিকতা নিয়ে এই গল্প তাই দ্বন্দ্বময় অধিভাষার জগৎ তুলে ধরে।

- ঠাকুরমার ঝুলির গল্প - সাত ভাই চম্পা ও পারুলের গল্প।

ঠাকুরমার ঝুলির বিভিন্ন গল্প হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত বাড়িতেই বিশেষত বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের শোনানোর জন্য বলা হয়ে থাকে। সাত ভাই চম্পা ও পারুলের গল্পও তেমনই একটি জনপ্রিয় গল্প।

গল্প বলার সময় স্মৃতি শক্তির দুর্বলতাবশত এবং মুখ ফেরতা হতে হতে গল্প খানিক বদলে যায়। আমার সংগৃহীত গল্পও মূল গল্প থেকে কিছুটা সরে এসছে। কিন্তু গল্পের মূল কাঠামো একই আছে। এই গল্পটির গঠনটিকে এখন আমরা প্রপের ফাংশানগুলো দিয়ে ব্যখ্যা করতে পারি কি না দেখব।

১। ONE OF THE MEMBERS OF A FAMILY ABSENTS HIMSELF FROM HOME.

সাতটি রানির সন্তান না হওয়ায় রাজা মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

২। AN INTERDICTION IS ADDRESSED TO THE HERO

রাস্তায় এক ফকিরের সঙ্গে দেখা হয় রাজার। আর রাজা তার সন্তানহীনতার কথা জানালে ফকির একটা গাছের শিকড় দেয় যেটা বেটে খেতে বলে সাত রানীকেই।

৩। THE INTERDICTION IS VIOLATED

রাজা ছোটো রানীকে বেশি ভালবাসত বলে বাকি সাত রানী তাকে না দিয়ে শিকড় বেটে নিজেরা খেয়ে নেয়। তারপর ছোটো রানী শুধু শিল ধুয়ে খায়।

৪। THE VILLAIN IS DEFEATED

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় ছয় রানী সন্তান সম্ভবা হতে পারে না।

৫। THE INITIAL MISFORTUNE OR LACK IS LIQUIDATED

ছোটো রানী শুধুমাত্র শিল ধুয়ে খেয়েই গর্ভবতী হয়।

৬। A FALSE HERO PRESENTS UNFOUNDED CLAIMS

ছোটো রানীর ৭ টা ছেলে ও একটি মেয়ে হয়। কিন্তু বাকি রানীরা রাজাকে জানায় যে ছাগল ছানা কুকুর ছানা ভাল্লুক ছানা বিড়াল ছানা ইত্যাদি হয়েছে। একটাও মানুষ হয়নি। এর পর তারা সমস্ত সন্তানকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়।

৭। A DIFFICULT TASK IS PROPOSED TO THE HERO

এরপর রাজা ছোটো রানির সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতো অপয়া অলুক্ষণে বলে। অন্যদিকে, ৭ টি ছেলে নদীর ধারে গাছে ফুল হয়ে ফুটে থাকে আর মেয়েটিকে একজন মানুষ করে কুড়িয়ে। কিন্তু ছোটো রানী মনে মনে পথ চেয়ে বসে থাকে সন্তানদের।

৮। THE TASK IS RESSOLVED

মেয়েটি তার ভাইদের অস্তিত্ব বুঝতে পারে। এবং রানী কেও মা হিসেবে চিনতে পারে। ছোটো রানী সেই ফুল গাছের কাছে গেলে সন্তানেরা তার কোলে এসে পড়ে। এভাবে সে তার সব সন্তানদের ফিরে পায়

৯। THE HERO IS RECOGNIZED

রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছোটো রানীকে আবার যথাযোগ্য সম্মান দেয়।

১০। THE FALSE HERO OR VILLAIN IS EXPOSED

ছয় রানীর ষড়যন্ত্র রাজা বুঝতে পারে।

১১। THE VILLAIN IS PUNISHED

রাজা ছয় রানীকে শাস্তি দেয়।

এই গল্পটি খুবই পরিচিত রূপকথার গল্প যা শুধু মুসলিম পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রূপকথার গল্প মানুষের বিশেষত শিশুর কল্পনাশক্তির খোরাক যোগান দেয়। যদিও, অনেকসময় রূপকথার গল্পতেও আমরা হিংসার উপাদান থাকতে দেখি। এই গল্পটিতেও তা আছে। তবে রূপকথার গল্পের আবেদন সমস্ত ধর্মের শিশুদের কাছেই সমানভাবে আদরণীয়।

- তিন বন্ধুর গল্প

তিন বন্ধু গুহার মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে দেখে মুখ বন্ধ। পাথর আটকে গেছে। আল্লাহ না বের করলে বের হতে পারবে না। এই বিপদে তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে লাগল। নিজের নিজের যত নেক আমল আছে সেইগুলো স্মরণ করে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে বসল। তখন দেখা যায় পাথরের মুখটা অল্প অল্প করে সরে যাচ্ছে। তখন তারা তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একে অপরকে তাদের নেকি সম্পর্কে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে।

প্রথম জন বলে সে মায়ের খিদমত করতো। বকরি ও গরু নিয়ে মাঠে চরাতে যেত। বাড়ি ফিরে তাঁদের দুধ দুইয়ে মাকে খাইয়ে পরিবারকে খাইয়ে নিজে খেত। একদিন অনেক রাত হয়ে যায়। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আমি দুধের গ্লাস নিয়ে সারারাত মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়েছিলাম। মা ভোরের আজান শুনে উঠে দেখে ছেলে দুধের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে মা ছেলের জন্য অনেক দোয়া করে।

দ্বিতীয় জন বলে সে তার চাচাতো বোনকে ভালোবাসে। গোপনে কামনা করে তাকে। তারপর একদিন দুজনে মিলিত হয়। চরম মুহূর্তে তার আল্লাহর কথা স্মরণে আসে। বুঝতে পারে সে জ্বিনা করছে। তখন সেই সেই জ্বিনা করা থেকে বিরত থাকে।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল আমার খামারে প্রচুর লোক কাজ করতো। সেখানে ১০ বা ২০ দেহরান পেতো। একজন হঠাৎ কাজ ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার বেতনের টাকা নিয়ে যায়নি আর। অনেক দিন পর সে ফিরে এসে তার প্রাপ্য বেতন ফিরে চায়। তখন ১০-১২ বছর কেটে গেছে মাঝে। তখন এই ব্যক্তি তাকে মাঠের প্রচুর বখরি দেখিয়ে বলে যে সব তারই। সে অবাক হয়ে যায়। আসলে তার বেতনের টাকাতে সে দুটো বখরি কিনেছিল। যা থেকে আজ তার অনেক অনেক বখরি।

তিনজনের নেকির গল্পই আসলে আল্লাহ নির্দেশিত অনুশাসন। মায়ের সেবা করা ইসলামে চরম পুণ্যের। বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা ক্ষমাহীন অপরাধ। আর প্রত্যেকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক যথা সময়ে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আছে ইসলামে। এই সমস্ত গল্পের সাহায্যে ইসলামিক রীতি নির্দেশগুলিকে সঞ্চরিত করে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে সঙ্গে দয়াময় আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি যে বান্দাকে বিপদের মুখ থেকে রক্ষা করেন তাও দেখানো হয়েছে। তিনিই একমাত্র উদ্ধারকর্তা।

এই গল্পটিরও সময় (t) আগের এবং স্থান (w) ও এদেশীয় নয় বলেই অনুমান করা যায়। গুহার উল্লেখ এখানে একটি বিশেষ সময় এবং মরু প্রদেশের দিকে ইঙ্গিত করছে। এছাড়া বেশ কিছু শব্দের প্রয়োগ যেমন – ‘বখরি’, ‘নেক আমল’, ‘জিনা’ ইত্যাদি শব্দগুলি একেবারেই মুসলিম সমাজের শব্দ। অন্যদিকে, বখরি শব্দটি বিদেশ থেকে আগত যা পরবর্তীকালে কিছু পরিমাণ বাঙালি মুসলিমদেরকেও আমরা ব্যবহার করতে দেখি। এই গল্পটি এখন মুসলিম পরিবারের মধ্যে, মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। তাদের মুখে মুখে এভাবেই তারা ইতিহাসকেও ধারণ করে রাখছে। ইসলামিক শিক্ষা এভাবেই সময়ের সরণি বেয়ে দেশ কাল সীমা পেরিয়ে চলেছে মৌখিক রীতির মাধ্যমে। তাদের অধিভাষার জগতে এই গল্পটি ধর্মীয় অনুভূতির অনুরণন সৃষ্টি করে।

- বাদশাহ হারুন রশীদের গল্প

বাদশাহ হারুন রশিদ আর তার স্ত্রী বেড়াতে বেরিয়েছে একদিন। যেতে যেতে পথের ধারে একটা ছেলেকে মাটি কাদা দিয়ে তৈরি জান্নাত বিক্রি করতে দেখে। স্ত্রীর জান্নাতটা দেখে পছন্দ হয়। কিন্তু স্বামী নিতে চায় না ধুলোর জান্নাত। তাও তার স্ত্রী জেদ করে জান্নাতটা কেনেন। বাড়ি ফিরে সেদিন রাতে বাদশাহ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে দেখেন যে অপূর্ব সুন্দর

জান্নাতের ভেতর তার স্ত্রী জোবেদা আছে। বাদশাহ সেই জান্নাতে ঢুকতে গেলে বাদশাহ বাধা দেয়।

পরের দিন ঘুম ভেঙে বাদশাহ সেই ধুলোমাখা ছেলেটির খোঁজে বেরিয়ে পড়ে যে মাটির জান্নাত খুঁজছিল। কিন্তু ছেলেটিকে বাদশাহ আর খুঁজে পায়নি। তারপর এক ফকিরকে সে তার স্বপ্নের কথা বলে। ফকির তার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে বলে যে স্ত্রী না দেখে জান্নাতের উপর বিশ্বাস করেছে কিন্তু বাদশাহ সেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

ইমান বা বিশ্বাস ইসলাম ধর্মের মূল সোপান। বিশ্বাস ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারবে না। ছোটো এই গল্পের মধ্যে দিয়ে আসলে যে অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লাহকে দেখা যায় না তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তার নিয়ম নীতির প্রতি গভীর বিশ্বাসই বান্দাকে জান্নাতবাসী করবে। এই গল্পের w = বাগদাদ (বর্তমানের ইরাক) হলেও, এবং সময় বা t ৭৬৩-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ হলেও এই গল্প আমরা দেখছি বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে জানা একটি গল্প যা মৌখিকভাবে চলে আসছে। গল্পটির অধিভাষা একদিকে যেমন অতীতের ইসলামিক গল্পের কাছে নিয়ে যায় অন্যদিকে ইমানহীনতার প্রতি এক ধরনের ভীতিও তৈরি করে। এই গল্পটি কোনো অমুসলিমের কাছে এরকম ব্যঞ্জনা বয়ে আনবে না।

- কোরবানির গল্প

ইসলামে কুরবানি তথা বকরি-ইদের কথা আছে। এই ইদে সাধারণত কোন পশু কুরবানি দিয়ে তার মাংস গরিব দুঃখী মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়। কুরাবানি অর্থাৎ ত্যাগ। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাজার বা হাট থেকে কুরবানি উপলক্ষে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি কিনে এনে তার মাংস বিতরণ করা হয়ে থাকে কিন্তু ইসলামে কুরবানি প্রিয় পোষা

পশুর দিতে পারলেই ভালো। যার উপর মায়া নেই তাকে ত্যাগ করার প্রশ্ন নেই। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা ইমান পরীক্ষার্থে এই কুরবানি কীভাবে শুরু হয় তা ইসলামের একটি প্রচলিত ও জনপ্রিয় গল্প। আল্লাহর প্রতি নিবেদন ও আত্মোৎসর্গের এক চমৎকার নিদর্শন এই গল্পটি পুরুষ নারী নির্বিশেষে সবারই কম বেশি জানা। গল্পটি খানিক এরকম –

ইব্রাহিম স্বপ্নে দেখেন আল্লাহ তাকে কুরবানি দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। ইব্রাহিম আল্লাহকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি আল্লাহর জন্য পারেন না এমন কাজ নেই। তিনি পরদিন একশ উট ও দুশ্বা কুরবানি দিলেন। কিন্তু সেদিন রাতেও তিনি আল্লাহর নির্দেশ পেলেন যে তার সবথেকে প্রিয় জিনিসটা তাকে কুরবানি দিতে হবে। তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন যে তার সবথেকে প্রিয় জিনিস কী। স্ত্রী পরিজন সবার কথাই মনে হল। কিন্তু সবথেকে প্রিয় তার পুত্র ইসমাইল। এরপর তিনি আল্লাহর আদেশে তার প্রিয়তম পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ইসমাইলের গলায় তিনি যখন ছুরি চালালেন দেখা গেল ইসমাইল অক্ষত থেকে গেলেন আর তার বদলে একটি দুশ্বা জবাই হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। এভাবে ইব্রাহিমের কুরবানি সার্থক হয়ে ওঠে। আর আল্লাহর প্রতি তার গভীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

আল্লাহর প্রতি বান্দাদের ভালোবাসার আদর্শ স্বরূপ ইব্রাহিমের এই কুরবানির গল্প প্রচলিত মুসলিম মেয়েদের মধ্যেও। এছাড়া ইসলামে কুরবানি একটি অবশ্য পালনীয় ধর্মাচরণ হিসেবে পরিগণিত। তার ইতিহাস হিসেবেও এই গল্পটিকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। জাগতিক সমস্ত মায়া ভালোবাসা সম্পর্ক ছাড়িয়ে ভগবানের প্রতি একাগ্র ভালোবাসা ভক্তিই যে কোনো মুসলমানের আদর্শ সেই গল্পই কুরবানির গল্পের মধ্যে নিহিত। ফলে কুরবানির গল্পটি একটি নির্দিষ্ট স্থান কালের মধ্যে থেকেও সর্বকালের সব জায়গার মুসলিমদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কুরবানির গল্পের অধিভাষা মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র ত্যাগের নিদর্শন

ও আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু এই গল্পটি হিন্দু মহিলাদেরকে আমরা বলতে দেখব না বা তাদের অধিভাষার জগতে এই গল্পের আলাদা কোনো আবেদনও সেই অর্থে নেই।

- জিনের গল্প

ইসলামে জিনের গল্প প্রচলিত। মনে করা হয় মনুষ্য সমাজের সমান্তরালে এই পৃথিবীতে জিনদের বাস আছে। মানুষ মাটি থেকে তৈরি কিন্তু জিনরা আগুন থেকে তৈরি। কোরানের মধ্যেও আমরা দেখব বহুবার জিনের প্রসঙ্গ এসছে। যদিও জিন কোরানের কোনো মৌলিক ধারণা নয়। প্রাক-ইসলামিক যুগের বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মের মধ্যে জিনের ধারণা পাওয়া যায়।

মেয়েদের প্রতিদিনের জীবনে তারা জিন সম্পর্কিত নানা গালগল্পও সঞ্চারিত করে থাকে। অনেক সময় তারা জিন দেখেছে বা জিনের উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে বলে দাবি করে থাকে। আর তা থেকে অনেক অলৌকিক গল্প বলে থাকে। এই প্রবণতা সাধারণত গ্রামের মেয়েদের মধ্যে আমরা বেশি দেখতে পাব।

জিনের গল্পগুলো অপ্রাকৃত অলৌকিক গল্প। এখানে w = মুসলিম বিশ্বাস সঞ্জাত অলৌকিক জগৎ। আমাদের বাস্তব জগতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে এই গল্পগুলো অর্থহীন। কিন্তু বিশ্বাসী মুসলিমের কাছে এদের অস্তিত্ব আছে। t বা সময়ও এখানে বাস্তব জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে জিন দেখা শুধু নয়, জিন ভর করে থাকার গল্পও আমরা পাব। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, জিন ভর করার বিষয়টি আমরা শুধু মেয়েদের উপরেই দেখব! যুগে যুগে আমরা সমাজ নির্ধারিত পথে না হাঁটা মেয়েদেরকে ডাইনি আখ্যায়িত করে এসছি। এ প্রসঙ্গে আমাদের ১৪৭০ – ১৭৫০ এ ইউরোপ ও আমেরিকায় উইচ হান্টের কথা মনে পড়বে। জিনে যাদের ধরতে পারে সেইরকম মেয়েদের আচরণ ও

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও সমাজে একটি ধারণা আছে। জোরে হাসি, জোরে কথা বলা, খোলা চুল ইত্যাদি আরো বহুবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় জিনের প্রকোপ থেকে বাঁচতে। তাই মেয়েদের মধ্যে জিনের গল্প গড়ে ওঠার সুযোগ অনেক বেশি থাকে।

- নীতিমূলক গল্প

নীতিমূলক গল্পের ঐতিহ্য বহু পুরনো সারা বিশ্ব জুড়েই। ঈশপের গল্প সারা পৃথিবীতেই জনপ্রিয়। এছাড়া ভারতের পঞ্চতন্ত্রের গল্প বুদ্ধ জাতকের গল্পও নীতিমূলক গল্পের জন্য বহু প্রচলিত। রামায়ণ মহাভারতের গল্প মুসলিম পরিবারগুলিতে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা বই, পাঠ্যসূচির মধ্যে দিয়ে আসে ঠিকই কিন্তু সমস্ত রকম মুসলিম পরিবারে এগুলো জানা গল্প নয়। তুলনায় ধর্মীয় নীতি কথা বা হজরত মহম্মদ বা তাঁর সাহাবাদের জীবন নিয়ে অনেক কথা গল্প কিংবদন্তীর মতো করে চালু আছে।

এদের মধ্যে অনেক গল্পই হাফেজ সাহেব বা মৌলবি সাহেব মারফতও বাড়িতে চালু থাকে। তাই ক্রমে বাড়ির মেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইসলামিক মিথও উঠে আসে অনেক গল্পতে। এইসব গল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম হল – কাবা শরীফের গল্প, আদম-ইভের গল্প, ইসমাইলের কুরবানির গল্প ইত্যাদি। ইসলামিক এই মিথগুলোতে আমরা দেখব যে আব্রাহামিক ধর্মগুলোর যে সাধারণ কিছু মিথ পাওয়া যায় সেইগুলো গল্পতেও উঠে আসছে। এছাড়া ইসলামে আদর্শ নারী হিসেবে আয়েশা এবং ফতেমার সততা ত্যাগ ও দারিদ্রের মধ্যেও অবিচলিত মানবতার গল্পগুলো উঠে আসে।

এখন আমরা ইসলামিক মিথ উঠে আসছে যে গল্পগুলোতে সেগুলো নিয়ে খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

নীতিমূলক বিভিন্ন গল্প যেগুলো ধর্মকে আশ্রয় করে বলা হয়ে থাকে তা অনেকসময়ই হজরত মহম্মদ বা তাঁর সাহাবাদের জীবন বা হজরত মহম্মদের অনুগামী মানুষদের জীবনকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে। আদম হাওয়ার গল্প আব্রাহামিক ধর্মগুলিতে প্রচলিত। কিছু কিছু জায়গায় সামান্য পরিবর্তন সহ এই আব্রাহামিক এই মিথগুলো খ্রিস্টান ইসলাম বা ইহুদি ধর্মের মধ্যে পাওয়া যায়।

কোরান মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা নিয়ে নির্দেশিকা দেয়। হাদিস কোরানের বিভিন্ন গল্পে গল্পের আকারে সেইসব মূল্যবোধ গঠন করতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে হজরত মহম্মদ আয়েশা ও ফতেমার জীবনের ছোটোখাটো ঘটনা গল্পের মতো করে বলা হয়ে থাকে।

- ইউসুফ- জুলেখার গল্প

ইয়াকুব নবী। ইউসুফের আব্বা ইয়াকুব। ইউসুফও নবী।

ইয়াকুবের দুটো বিয়ে। একপক্ষে দুটো সন্তান। বনি আমিন ও ইউসুফ। অন্যদিকে ১০ জন সৎ ভাই। ইউসুফের ১১টা ভাই মোট। ইউসুফ এক রাতে স্বপ্নে দেখে ১১টা তারা, নক্ষত্র এবং সূর্য তাকে সেজদা করছে। ইউসুফ তখন বালক। এই অলৌকিক স্বপ্ন দেখে তখন সে তার বাপকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এই স্বপ্নের মানে কী। ইউসুফ শুনে তখন সব বুঝল। বুঝতে পারল যে তার এই ছেলে নবী হবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে ইয়াকুব জানায় যে ১১টা নক্ষত্র হল তোমার ১১টা ভাই আর চাঁদ আর সূর্য তোমার মা আর আমি। তুমি ভবিষ্যতে নবী হবে তাই তোমাকে সবাই অনুসরণ করবে, সেজদা করবে। ইউসুফকে নবী খুব ভালোবাসতো। স্বপ্নের খবর তার অন্যান্য ভাইদের কানে যাওয়ার পর তাদের খুব হিংসে হয়। মনে মনে তার ১০ ভাই ইউসুফকে আগে থেকেই হিংসে করতো। স্বপ্নের কথা শুনে তারা মনে করল তাদের খুব বিপদ হবে ইউসুফ নবী হয়ে গেলে। তারা প্রথমে ভাবল মেরে

দেবে ইউসুফকে। তাদের মধ্যে এক ভাই তখন বলে যে আমরা তো এক বাপেরই ভাই। এমন কিছু কর যাতে ও ইয়াকুবের চোখের আড়ালেও চলে যাবে আবার প্রাণেও মারা যাবে না। তখন ওরা ভাবল গরু চরাতে যাওয়ার সময় ইউসুফকে নিয়ে যাবে। তারপর ইউসুফকে মাঠে নিয়ে গিয়ে চড় থাপ্পড় মারে। বলে তুই নবী হয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করবি! এই বলে তাকে হুঁদারায় ফেলে দেয়। তারপর তার জামায় ছাগলের রক্ত লাগিয়ে বাড়ি এসে বলে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে নিয়েছে। বলে বাপের কাছে তারা কান্নাকাটি করে। কিন্তু তার বাপ দেখল জামাটা কোথাও ছেঁড়েনি।

যখন তারা ইউসুফকে হুঁদারায় ফেলে দিচ্ছিল সেইসময় একদল বণিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ইউসুফ প্রচণ্ড সুন্দর। সমস্ত নবীদের মধ্যে তাকে সুন্দর মনে করা হয়। ওত সুন্দর বালককে দেখে বণিকরা ভাবল একে বিক্রি করে তারা অনেক টাকা পেতে পারে। তখন সেই বণিকরা ইউসুফকে মিশরের আজিজের কাছে নিয়ে যায়। অন্যদিকে জুলেখা এই সময় স্বপ্নে ইউসুফকে দেখে। তার বাড়ি মিশরের অন্য জায়গায়। কিন্তু চারপাশে সে ইউসুফকে খুঁজে পায় না। পরে আর একদিন জুলেখা ইউসুফকে স্বপ্নে দেখে। সেখানে ইউসুফ জুলেখাকে বলে মিশরের আজিজের কাছে গেলে তার খোঁজ পাবে। জুলেখা খুব সুন্দরী ছিল। মিশরের আজিজ এই সময় জুলেখাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ফলে জুলেখা ইউসুফের আশায় রাজি হয়ে যায়। তার আন্না মাও রাজি হয়ে যায়। জুলেখা ভাবে তার স্বপ্নের পুরুষকে পেয়েছে। কিন্তু বাসরঘরে দেখে ইউসুফ নয়, অন্য কেউ। বিয়ের রাতে জুলেখা বলে সে ৭ বছরের একটা তপস্যা করছে। এই ৭ বছর সে কোনো পুরুষের সঙ্গে সহবাস করবে না। তার মধ্যে ৪টে বছর হয়ে গেছে। ৩ বছর এখনো বাকি। আজিজ তার কথা মেনে নেয়। কিন্তু জুলেখার মন তখন আসলে ইউসুফের প্রতি।

এরপর বণিকরা এসে ইউসুফকে বিক্রি করে আজিজের কাছে। ইউসুফ একদিন আয়না দেখে তার রূপের জন্য অহংকার করে। তাই আল্লাহ তার এই শাস্তি দেয়। এরপর জুলেখা একদিন ইউসুফকে দেখে। রাজা ইউসুফকে খুব ভালোবাসে। এরপর জুলেখা বারবার ইউসুফকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। একদিন জুলেখা ইউসুফ এলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করতে বলে। আর তার স্বপ্নের কথা বলে। কিন্তু ইউসুফ বলে এটা পাপ। জুলেখার ঘরে একটা মূর্তি ছিল কাপড়ে ঢাকা। জুলেখা জানায় সে এই মূর্তিকে সেজদা করে। আর ইউসুফ জানায় সে আল্লাহকে মানে। জুলেখা ইউসুফের জামা ধরে টানে আর টানাটানিতে তার জামা ছিঁড়ে যায়। এই সময় আজিজ এসে পড়ে। বিচার হবে এবার। পাশের ঘরে একটা ছোটো শিশু শুয়ে ছিল। বিচারের সময় ইউসুফ বলে শিশুকে জিগ্যেস করতে যে আসলে কী হয়েছে। তখন শিশুকে আনা হল। সেই শিশু অদ্ভুত ক্ষমতায় কথা বলতে পারল। জানালো ইউসুফের কোনো দোষ নেই। জামা যদি সামনে থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে জুলেখা দোষী আর জামা পিছন থেকে ছেঁড়া থাকলে ইউসুফ দোষী। দেখা যায় জামা সামনে থেকে ছেঁড়া। ফলে ইউসুফের শাস্তি হয় না।

জুলেখা এরপর তার সখীদেরকে ইউসুফের কথা বলে। ইউসুফকে এনে তাদের হাতে ছুরি আর ফল দিয়ে ফল কাটতে বলে। কিন্তু প্রত্যেকেরই হাত কেটে যায় ইউসুফকে দেখতে গিয়ে। জুলেখা কিছু পরে আজিজকে বলে তুমি ইউসুফকে কিছু বলো না কেন। জুলেখার কথা শুনে আজিজ তাকে জেলে বন্দি করে। ইউসুফের সঙ্গে দুই বাবুর্চি জেলে বন্দি ছিল। তারা দুজনে একদিন দুটো স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ইউসুফের ছিল। তাদের দুজনের স্বপ্ন শুনে সে ব্যাখ্যা করে দেয়।

প্রথমজন স্বপ্ন দেখে যে সে ফল খাওয়াচ্ছে আজিজকে। আর দ্বিতীয় জন দেখে তার মাথায় একগাদা খাবার আছে। আর সেই খাবারে কাক এসে ঠোকর মেরে যাচ্ছে। তাদের

স্বপ্ন শুনে ইউসুফ বলে যে তারা দুজন খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। একজন সত্যিই আজিজকে ফলের রস খাওয়াবে আর একজনের মৃত্যুদণ্ড হবে। মৃতদেহ তারপর পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেওয়া হবে আর কাক এসে তা ঠোকর দিয়ে যাবে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিয়ে ইউসুফ বলে তা কাউকে না বলতে। এরপর এক সপ্তাহ পর ওরা ছাড়া পায়। আর সব সত্যি হয়। প্রথমজন আজিজকে ইউসুফের কথা বলতে ভুলে যায়। এরপর অনেকদিন কেটে যায়। জুলেখা এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। আজিজ দুটো স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নের কথা আজিজ বাবুর্চিকে বলে। তখন স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য বাবুর্চি ইউসুফের কথা বলে। বাবুর্চি ইউসুফকে আজিজের দুটো স্বপ্নের কথা বলে।

এক, সমুদ্র থেকে সাতটা মোটা গাভী উঠে আসে। উঠে এসে তারা জমির শস্য টস্য খেয়ে সাবাড় করে দিল। দুই, পরদিন স্বপ্নে দেখে যে সাতটা রোগা গাভী উঠে এল। তারা কিছু খেতে পারে না। ইউসুফ এই দুই স্বপ্ন শুনে বলে, সাত বছর প্রচুর শস্য হবে। পরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে।

ধীরে ধীরে আজিজ দেখে যে ইউসুফের ব্যাখ্যা মিলে যাচ্ছে। ইউসুফকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়ে আজিজ তাকে বড়ো পদে বসায়। এই সময় জুলেখা সংসার ছেড়ে চলে যায়। জুলেখার কোনো খোঁজ ইউসুফ নেয়নি। কেনানে খরা হয় এই সময়। সেখান থেকে ইউসুফের দশ ভাই মিশরে এসে বলে ওখানে শস্য নেই। ইউসুফ তার ভাইদেরকে চিনতে পারল। কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারেনি। ইউসুফ তার ভাইদেরকে অনেক বেশি করে শস্য দিল আর বলল ছোটো ভাইকে আনলে আরো বেশি শস্য দেবে। দশ ভাই ফিরে এসে তখন তাদের সঙ্গে বুনি আমিনকে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু যাওয়ার পর ইউসুফ ওর ভাইকে দেখে কান্নাকাটি করে। ইউসুফ বুনি আমিনকে তার কাছে রাখতে চাইল। বুনি আমিনের বস্তায় একটা থালা রেখে দেয় ইউসুফ। তারপর থালা চুরি যাওয়ার অজুহাতে সবার বস্তা দেখা হয়।

বুনি আমিনের বস্তায় সেই থালা পাওয়া যায়। তখন বাকিরা চলে যায়। চুরির শাস্তি স্বরূপ বুনি আমিনকে ইউসুফ যেতে দেয় না। বাকিরা বাপকে গিয়ে বলে কী কী ঘটেছে। তখন ওর বাপ বুঝতে পারে এটা ইউসুফ হবে। তখন ওরা সবাই মিশরে আসে। আজিজ এ সময় শয়্যাগত হয়ে যায়। তখন ইউসুফকে আজিজ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন ধীরে ধীরে ইউসুফকে গোটা দেশের লোক মানে।

আজিজ হওয়ার পর ইউসুফ একদিন রাস্তায় একটা পাগল মেয়েকে দেখে। ইউসুফ বুঝতে পারে মেয়েটা জুলেখা। ইউসুফ তখন জুলেখাকে রাস্তা থেকে নিয়ে আসে। ইউসুফ এরপর স্বপ্ন দেখে যে জুলেখা ওর স্ত্রী। তারপর ইউসুফ আর জুলেখা একসঙ্গে থাকতে শুরু করে।

ইউসুফ জুলেখার গল্প খুবই জনপ্রিয় ও প্রচলিত গল্প। আরবি ফার্সি উর্দু বহু ভাষাতেই ইউসুফ জুলেখার গল্প পাওয়া যায়। এবং প্রত্যেকটা গল্পের সংস্করণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ আলাদা। আমরা ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে এই গল্পটি পেয়েছি। এখানে উল্লেখ্য, কোরানে ইউসুফের কথা থাকলেও জুলেখার কথা নেই। তাই এই গল্পটি মুসলিমদের কাছে নিছক প্রেমের গল্প মাত্রই নয়। তাদের অধিভাষার জগতে গল্পটি বিশেষ তাৎপর্য বয়ে আনে।

- ইসলামিক মিথের গল্প

মুসা নবীর ঘটনা

সে সময় মিশরের রাজা ছিল ফেরাউন। ফেরাউন হঠাৎ করে একদিন স্বপ্ন দেখে জাহাজ উলটো করে ভেসে আছে। তারপর স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা বলে, এখানে একজন শিশু জন্মাবে। সেই শিশুর হাতে তার মৃত্যু ঘটবে। এই সময় মুসা নবী ছিল তার মায়ের গর্ভে। রাজা কাফের। সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে নবজাতকদের কোতল করতে শুরু করে। মুসা জন্মানোর পর তার

এক বোন তার মাকে বলে বড় সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিতে। তাই করা হয়। তারপর সেই সিন্দুক ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের বাড়ির কাছে এসে ঠেকে। লোকজন দেখে সেই সিন্দুকের ভেতরে একটা খুব সুন্দর ছেলে শুয়ে। ফেরাউনের বউ ছিল আশিয়া। সে মনে মনে আল্লাহকে মানতো। আশিয়া বলে এ এখানকার নয়। এতো সুন্দর বাচ্চা, ওকে মেরো না। বাচ্চা মানুষ হতে লাগল। এরপর তার দুধ মায়ের খোঁজ চলে। তখন মুসার মাই দুধ মা হিসেবে আসে। সেই নিজের ছেলেকে প্রতিদিন দুধ খাওয়াতে আসে। ফেরাউনের কিন্তু চিন্তা যায়নি। একদিন একটা বাটিতে আগুন আর একটা বাটিতে ফুল নিয়ে মুসার কাছে আনে। ওর বুদ্ধি আছে কি না পরীক্ষা করার জন্য। এই সময় তখন জিব্রাইল মুসার কানে কানে বলে বাঁচতে চাইলে আগুনে হাত দাও। তারপর ছোট্টো মুসা আগুনে হাত দিয়ে মুখে হাত দেয়। তখন ফেরাউনের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এরপর মুসা বড় হয়। তার হাতে সবসময় একটা লাঠি থাকত। লাঠিটা ছেড়ে দিলে সাপ হয়ে যেত। এসময় অনেক জাদুগর এল। তারা সাপের খেলা দেখাত। মুসার সাপটা বাকি সব সাপদের খেয়ে নিল। মুসার এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অনেক মানুষ আকৃষ্ট হয়। মুসা এরপর ইসলাম প্রচার করতে শুরু করে। ফেরাউন তখন বুঝল এ শুক্র। মুসা তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। হারুন মুসার ভাই। তাকেও নবীয়ত করল আল্লাহ। হারুন ও মুসা দুজনে মিলে ইসলাম প্রচার করছে। ফেরাউন বলে, আল্লাহ বলে কেউ নেই, আমিই আল্লাহ। ফেরাউনের লোকজন মুসাকে তাড়া করে। তখন মুসার সামনে লোহিত সাগর। আল্লাহর কাছে দুয়া করে রাস্তার জন্য। তখন আল্লাহ সাগরের জল দুভাগ করে দেয় ও মাঝখানে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। সেখান দিয়ে মুসা আর তার দলবল অনায়াসে পেরিয়ে যায়। কিন্তু তারপর যখন ফেরাউনের দল পিছন পিছন যেতে চেষ্টা করে সাগর আবার সরে এসে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। তাতে ফেরাউনরা সব মারা যায়।

মুসা নবীর ঘটনা আমরা ইহুদি মিথেও দেখতে পাব। এই গল্পের w বা স্থান হল মিশর। সময় মুসা নবীর সময়কালীন। দেশ এবং কাল দুইই অনেক ভিন্ন বাঙালি মুসলিমদের থেকে। এই গল্প একদিকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ইমানদারদের প্রতি আল্লাহর সহৃদয়তা এবং অবিশ্বাসীর ভয়াবহ পরিণামের কথা বলে। মুসা নবীর এই ঘটনা আদতে একটি মিথ যা বহুলভাবে পরিচিত। ফলে, এই গল্পটির ওয়ার্ল্ড ইতিহাস কল্পনা বিশ্বাস মিশ্রিত। আব্রাহামিক ধর্মগুলিতে এই মিথটি জনপ্রিয়। মুসলিম জন মানসে, তাদের অধিভাষাতে এই মিথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

- হাবিল কাবিলের গল্প

আদম ও হাওয়ার এবেলা ওবেলা দুটো করে সন্তান হতো। জোড়ায় জোড়ায় যারা হত তাদের নিজেদের মধ্যে বিয়ে হতো না। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে বিয়ে হতে পারত। আর প্রতিবার একটা করে ছেলে আর একটা মেয়ে হতো।

এইভাবে একসঙ্গে কাবিল ও আকলিমা জন্মায়। আর হাবিল আর গজা জন্মায় একসঙ্গে। এর মধ্যে আকলিমা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। কাবিল আকলিমাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী কাবিল নয় হাবিল বিয়ে করতে পারবে। তখন হাবিল ও কাবিল শত্রু হয়ে গেল। এরপর আকাশ থেকে ওহি এল। সে এসে দুজনকে কুরবানি দিতে বলে। যার কুরবানি কবুল হবে আল্লাহ তার আবেদন মঞ্জুর করবে।

হাবিল তখন একটা দুধা কুরবানি দিয়ে পাহাড়ের উপর রেখে আসে। আর কাবিল দুধা বিক্রি করার সম পরিমাণ টাকা দিয়ে সে শস্য কুরবানি হিসেবে পাহাড়ের উপর রেখে আসে।

যে কুরবানি কবুল হয় দৈব আগুন এসে সেটাকে পুড়িয়ে দেয়। দেখা যায় হাবিলের কুরবানি কবুল হয়। কিন্তু কাবিলের কুরবানি কবুল হয় না। তারপর কাবিল রাগে উন্মত্ত হয়ে হাবিলকে

হত্যা করে। এটাকেই পৃথিবীর প্রথম হত্যা বলে মনে করা হয়। তারপর কাবিল বুঝতে পারে না যে মৃতদেহ নিয়ে সে কী করবে। এরপর আল্লাহপাক দুটো কাক পাঠালো। কাকদুটো মারামারি করে একজন অন্যকে মেরে ফেলে। তখন কাবিল দেখে জীবিত কাকটা পা দিয়ে মাটি গর্ত করে অন্য কাকটাকে কবর দিয়ে দেয়। সেটা দেখে কাবিল হাবিলকে কবর দিয়ে দেয়। এটা পৃথিবীর প্রথম কবর বলা হয়। এই গল্প অনুযায়ী পৃথিবীর প্রথম মৃত্যু একটা নারীকে বিবাহকে কেন্দ্র করে। আর সেখানে নারীর মতামতের কোন গুরুত্ব দূরের কথা তার কোনো অস্তিত্বই এই গল্পে নেই।

নারীকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইতিহাসে আমরা বহু দেখেছি। অন্যান্য সকল বস্তু সামগ্রীর মতো নারীকেও অধিগ্রহণ করতে হয়। নারীকে বাজি ধরা যায় যুদ্ধে, খেলায়। এই গল্পটিতেও ইসলাম অনুযায়ী পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধ মৃত্যু সবই নারীকে ঘিরে। গল্পটির w = আদিম পৃথিবী ও t = ইসলাম অনুযায়ী প্রাক মানবসভ্যতার সময়। ফলে এই গল্পে ইসলামিক সমাজ অনুযায়ী মানব সভ্যতা গঠন হওয়ার প্রারম্ভিক কাল। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে ‘জিনা’ করার বিষয়টিকে পাপ ও তার বিধ্বংসী পরিণামকে নীতিকথার মতো করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেন।

- দ্বিতীয় আদম

নুহ আদমের পরের নবী। এই সময় গোটা দুনিয়া জুড়ে বন্যা হয়। নুহ ৯৬০ বছর বেঁচে ছিল। এই সময় কাফেরদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই পৃথিবীতে মহা প্লাবন হয়। পৃথিবীর সব ডুবে যায় তখন। ওই সময় একটা বড়ো কিস্তি বা নৌকা বানানো হয়। সেই কিস্তি বা নৌকাতে সমস্ত মানুষ প্রাণিকে জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষ তুলে নেয়। সেই কিস্তিতে সবাই উঠে যায়। শুধু পড়ে থাকে কেনান। কেনান নুহের ছেলে। কেনান আল্লাহকে কবুল করে না। তাই গাছ পাহাড় সহ কেনানও ডুবে যায়। তারপর অনেকদিন পর বন্যা নামার

পর আবার নতুন করে সভ্যতার জন্ম হয়। নুহ থেকে এই সভ্যতা আবার শুরু হয়। তাই নুহকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়।

গল্পটা ছোটো। গল্পের w বা স্থান হচ্ছে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া বা বর্তমান তুর্কি। কোরানে নুহ নবীর প্রসঙ্গ এসেছে। t বা সময়কাল হল আদমের পরের সময়কাল। পৃথিবীতে আবার অরাজকতা শুরু হলে নুহ আসেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে নুহ আসেন। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ক্ষমার অযোগ্য। তাই সমস্ত জড় মানুষ প্রাণি নৌকাতে জায়গা পেলেও কেনান নুহ নবীর সন্তান হয়েও আল্লাহকে অবিশ্বাসের কারণে বাঁচতে পারে না। গল্পটির তাৎপর্যও ও উদ্দেশ্যও খুব স্পষ্ট।

- আজরাইলের গল্প

জান কবজ করে আজরাইল। এক গর্ভবতী নারী মরুভূমি অঞ্চলে গাছের নিচে এক সন্তান প্রসব করে। চারপাশে কেউ নেই। আল্লাহ আজরাইলকে নির্দেশ দেয় ওই নারীর জান কবচ করতে। আজরাইল তখন আল্লাহকে জিগ্যেস করে ছেলেটার কী হবে। আল্লাহ তখন বলে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

আজরাইল গিয়ে মায়ের প্রাণ হরণ করে। এরপর বহুদিন কেটে গেছে। এরপর হুদ বলে একজন নবী এসেছেন। সে আল্লাহর বাণী প্রচার করছে। শাদাত বাদশাহের কাছে আজরাইল যায়। সে আল্লাহকে ইবাদাত করতে বলে। তখন বাদশাহ মজা করে বলে, জান্নাত কী। হুদ জান্নাতের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়। শাদাত সবকিছু শুনে নকল জান্নাত বানায়। আল্লাহ তখন আজরাইলকে বলে ওই বাদশাহের জান কবচ করে আনতে। এরপর নতুন জান্নাত তৈরি হলে বাদশাহ জান্নাত দেখতে সিঁড়িতে পা রাখে। তখন আজরাইল এসে বলে আমি মালাকুল মউত। তুমি এখন যেতে পারবে না। এরপর শাদাত তখন কান্নাকাটি করে বলে যে একবার

অন্তত জান্নাতটা দেখতে দাও। আজরাইল তখন বাদশাহের জান কবচ করে এসে নিয়ে বলে আমার কষ্ট হল সে জান্নাতটা দেখতে পেল না বলে। তখন আল্লাহ বলে সেই গর্ভবতী নারীর শিশুই হল এই বাদশাহ। তখন আজরাইলকে আল্লাহ বলে আমি যা জানি তুমি তা জানো না।

অনেকসময় বক্তার বাচনভঙ্গি, স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে থাকে গল্পের বাঁধুনি। এই গল্পটি গল্পের চেয়েও বেশি একটি ঘটনার বর্ণনা হয়ে থেকে গেছে। এই গল্পটির w আমরা দেখছি মরু প্রদেশ কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে আল্লাহ এবং আজরাইল এই দুটি ইসলামিক চরিত্র গল্পে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে গল্পটি আধা লৌকিক ও আধা অলৌকিক জগতে বিচরণ করেছে। এই গল্পে আমরা দেখি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস বা আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষ হওয়ার শাস্তি সে পেয়েছে। এই গল্পের অধিভাষাতেও আমরা এক ধরনের ইসলামিক নীতি বা পরিমণ্ডল উঠে আসবে।

- অলৌকিক ঘটনা

এটা ঈসার মৃত্যুর ১৫০ বছর পর ঘটনা।

সাতজন লোক ও তাদের সঙ্গে একটা কুকুর ছিল। এরা ইসলামপন্থি ছিল। কিন্তু এরা কেউ নবী নয়। এরা যখন ধর্মপ্রচার করছিল রাজা এদের বন্দি করে। এক রাতে কুকুরকে নিয়ে এরা সাতজন পালিয়ে এসে একটা গুহায় আশ্রয় নেয়। তারপর রাতে ক্লান্ত হয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তাদের খিদে পায়। তারপর তাদের কাছে যা মুদ্রা ছিল সেগুলো নিয়ে তারা দোকানে গেলে দেখে সেই মুদ্রা আর চলছে না। কিছু পরে তারা বোঝে যে শহর রাস্তা ঘাট, মানুষজনের পোশাক পরিচ্ছদ সবই বদলে গেছে। তখন তারা বুঝতে পারে তারা ৩৫০ বছর সময় পেরিয়ে এসেছে।

- খিজিরের গল্প

খিজির যখন পৃথিবীতে বাস করছিল তখন বাদশাহ ছিল জুলকার নাইন। জুলকার নাইনকে খিজির আবেহায়াতের অর্থাৎ অমৃত সুধার কথা বলে। তারপর খিজির আর বাদশাহ জুলকার নাইন আবেহায়েতের সন্ধানে বেরোয়। কিন্তু মাঝ রাস্তায় জুলকার নাইন পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু খিজির আবেহায়াতের খোঁজ পায়। তারপর খিজির অমরত্ব লাভ করে বলে মনে করা হয়। মনে করা হয় খিজির এখন জলের তলায় বাস করে। খিজিরকে জলের দেবতা বলে মনে করা হয়। তাই জলে মল মূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়।

মুসলিমদের মধ্যে একটি প্রচলিত সংস্কার হল জলের মধ্যে বিশেষ করে পুকুরে বা জলাশয়ে মল মূত্র ত্যাগ করতে নেই, কারণ ইসলামিক মিথ অনুযায়ী খিজির জলের তলায় থাকে। অনেকে বিশ্বাস করে খিজির নবী বা ফেরেশতা কিন্তু কোরান বা শাস্ত্রে এর উল্লেখ নেই। এটি এমনি লোক বিশ্বাস। গল্পটির w বা স্থান তাই ইতিহাস ও মিথের জগৎ। মিথ কেন্দ্রিক গল্পের সময় বা t নির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। যে কোনো মিথে অনেকগুলো সময় একসঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। অনেক কালের অনেক উপাদানের সংযোজন ঘটে তাতে। অনেকের বিশ্বাস খিজির এখনো বেঁচে আছে। এই গল্পটির অধিভাষা একটি আলো আঁধারির ইসলামিক মিথের জগতে পৌঁছে দেয়।

- তুর পাহাড়ের সুর্মা

মুসা নবী আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। আল্লাহ একটা জ্যোতি। তুর পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহ একটা আঙুল দেখিয়েছিল। তাতে সেই জ্যোতির প্রভাবে তুর পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই তুর পাহাড়ের ছাই থেকে সুর্মা তৈরি হয়। তাই সুর্মা কে পবিত্র বলে মনে করা হয়।

হজরত মহম্মদ চোখে সুর্মা পরতেন। তার অনেক অনুগামীরাও পরতেন সুর্মা। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে মহম্মদের জীবন অনুসরণীয়। তাঁর সমস্ত আচার আচরণও অনুকরণীয়। মহম্মদের ছোটোখাটো সখ অভ্যাস নিজেদের জীবনে পালন করাটা সুন্নত বলে মনে করা হয়। সুর্মা পরাটাও তাই। সুর্মা তৈরি নিয়ে এই মিথ-গল্পটিও মুসলিম সমাজে প্রচলিত। এই মিথের w বা স্থানকে নির্দেশ করা হচ্ছে তুর পাহাড়ে যা আরবে উপস্থিত। আর সময় বা t হল মুসা নবীর সময়কাল। কিন্তু যেহেতু এটি মিথীয় গল্প ফলে গল্পটির বাস্তব ভৌগোলিক সীমারেখা থাকলেও তা আসলে সবসময় এক পা বাড়িয়ে আছে ইতিহাসের দিকে, কল্পনার দিকে। তাই এই গল্পটিরও সময় খুব একমাত্রিক নয়। মৌখিক পরম্পরার মধ্যে দিয়ে এই মিথগুলি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হয়ে আসছে। যেহেতু এই মিথটি একইসঙ্গে সুর্মার উৎস নির্দেশক এবং আল্লাহর জ্যোতি বা আলো বা মহিমা কীর্তনের ফলে অধিভাষার দিক থেকে এই গল্পটির আবেদন বিশ্বাসী মুসলিমের কাছে খুব বেশি বদলায়নি।

- রূপক গল্প

একজন স্বপ্ন দেখছে তাকে বাঘে তাড়া করছে। সে তখন ছুটছে। ছুটতে ছুটতে সে একটা ইঁদারার কাছে গিয়ে পড়ে। তারপর ইঁদারার নিচে দড়ি দেখে সেই দড়ি ধরে সে নিচে নামতে থাকে বাঘ থেকে বাঁচতে। কিছু পর সে ইঁদারার নিচে অজগর সাপ দেখতে পায়। আর ইঁদারার উপরে বাঘ হুংকার দিচ্ছে। এমন সময় দেখে, সাদা কালো দুটি ইঁদুর যে দড়িটা ধরে সে নামছিল সেটা কাটতে শুরু করেছে। ইঁদারার পাশে একটা আমগাছ ছিল। আমগাছে মৌমাছির চাক আছে। চাক থেকে মধু ঝুলছিল। তখন সে তার ছেঁড়া দড়ি, উপরে বাঘ আর নিচের অজগর সাপ সবকিছুর কথা ভুলে গিয়ে জিভ বের করে সেই মধু খায়। এমন সময় তার ঘুম ভেঙে যায়। তারপর সেই ব্যক্তি সকালে এক পির সাহেবের কাছে যায় স্বপ্ন ব্যাখ্যা করাতে। পির সাহেব তখন তার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে এভাবে –

বাঘ – বদ আমল অর্থাৎ পাপ কাজ

অজগর সাপ – কবর

দড়ি – আয়ু

সাদা কালো হুঁদুর – রাত, দিন

মধু – দুনিয়া

অর্থাৎ, রাত দিন কেটে যাচ্ছে। আয়ু কমে আসছে আর বদ আমল বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে দুনিয়ার মোহে অর্থাৎ মধুতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এদিকে তার কবরে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে।

এই গল্পটির মধ্যে বহু রূপকের ব্যবহার আছে। গল্পটি আসলে রূপকের মাধ্যমে এই অসার জীবনের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহকে নির্দেশ করেছে। ইহলোকের দিন কেটে যাচ্ছে বদ আমল বা পাপ কাজে আর এদিকে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। কবর বা অজগর সাপ কাছে। কিন্তু তাও মানুষ তাৎক্ষণিক আনন্দ ভোগে নিমজ্জিত হয়ে আছে যা চরম সংকটের মধ্যেও মধু খাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়। ফলে গল্পটির মধ্যেই সেই রূপকের ব্যাখ্যা থাকলেও ধর্মভীরু মানুষের মনে এই গল্পটির অধিভাষা বা metalanguage পরলোকের প্রতি আশঙ্কা ও ইহলোকের তাৎক্ষণিক আমোদের প্রতি বিরূপ করে তোলে। এখানে আমরা খেয়াল করব গল্পটি মুখ ফেরতা হতে হতে বাংলায় এসে গাছটি ‘আম গাছে’ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। অনুমান করাই যায় মূল গল্পে রুক্ষ মুরুভূমির দেশে নিশ্চয় গাছটি আম ছিল না। সেক্ষেত্রে খেজুর বা অন্যান্য গুল্ম জাতীয় গাছ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফলে w বা স্থান এবং t বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি গল্পের খুঁটিনাটি বর্ণনা বদলে যাচ্ছে। শ্রোতার নিজস্ব অধিভাষার জগতে তার নিজের মতো করে অধিষ্ঠান ঘটছে এভাবে।

- শবেমিরাজের গল্প

বুরাখে চড়ে হজরত দিদার করতে গেছিল আল্লাহর সঙ্গে। আসমান থেকে এই বুরাখ আসে। সেখানে গিয়ে উম্মতদের জন্য হজরত দুটো উপহার আনে। নামাজ আর রোজা। তিনি ওজু করে গেছিলেন। সেখানে গিয়ে জান্নাত জাহান্নাম সমস্তই দেখেছিলেন। জিবরাইল ফেরেশতা সবকিছু দেখাচ্ছিলেন। আদম থেকে ঈসা সবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ সময় হজরত মহম্মদ ১ বছরের রোজা ছিল যা ১ মাস হয়। আর ৮০ রাকাত নামাজকে ৫ রাকাতে নামিয়ে আনে। তারপর ওখান থেকে দুনিয়াতে ফিরে এসে দেখেন অজুর জল একইরকম আছে। এক মিনিটে তিনি ঘুরে আসেন।

‘বুরাখ’, ‘দিদার’, ‘আসমান’, ‘উম্মত’ ইত্যাদি শব্দগুলির একযোগে ব্যবহার বুঝিয়ে দেয় গল্পটির উৎপত্তি স্থান বা w এদেশের নয়; তার আরো একটি কারণ গল্পটি প্রাচীন। গল্পটির t বা সময়কাল হজরত মহম্মদের সময়কালীন। কিন্তু এই গল্পটির বাস্তব ভিত্তি নিয়ে ধার্মিক মুসলিম সংশয় প্রকাশ না করলেও অমুসলিমদের থাকতেই পারে। ফলে এই গল্পটির অধিভাষা একজন মুসলিম মননে আলাদা মাত্রা বহন করবে।

আমরা এখানে বেশ কিছু গল্প পেয়েছি যা মুসলিম সমাজের প্রচলিত পরিচিত ও নিজস্ব গল্প। কিছু রূপকথার গল্প বাদ দিয়ে এই গল্পগুলি অন্যান্য বাঙালি সমাজে চালু গল্প নয়। এমন নয় যে এই গল্পগুলি মেয়েদের নিজস্ব। তবে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে এই গল্পগুলি বলে থাকে। অন্যদিকে, পুরুষদেরকে বিশেষ করে হাফেজ মৌলবিদেরকে আমরা এই গল্পগুলি মসজিদে জামাতে বলতে দেখব। ধীরে ধীরে ব্যস্ত জীবন থেকে গল্প বলার পাট উঠে যাচ্ছে। একেবারে নবীন প্রজন্ম এই গল্পগুলি থেকে দূরে সরছে। তাদেরকে গল্প বলার লোকও ক্রমশ কমছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাই এই গল্পগুলি প্রবীণদের মধ্যে, ধার্মিক ব্যক্তিদের গল্পের ঝাঁপিতে জমা হয়ে থাকছে। তবে একই গল্প ছেলে ও মেয়ের অধিভাষাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। তাদের অধিভাষার জগৎকেও সেগুলো নির্মাণ করতে সাহায্য করছে।

উপসংহার

একটি ভাষার অর্থবোধ গড়ে ওঠে সেই ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতি থেকে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে আবার অনেকগুলো ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় যে কোনো ভাষার মতোই। মুসলিম মেয়েদের ভাষা প্রয়োগ তাদের অর্থবোধ তাদের চিন্তা চেতনা ও অন্তর্জগতের হৃদিস দেয়। আবার তাদের ভাবনা চিন্তাও তাদের শব্দ বা ভাষা সম্পর্কিত অর্থবোধকে তৈরি করে। অর্থাৎ অর্থবোধ আর সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক। আমরা অনেকসময় খেয়াল করি না ভাষার অর্থবোধও চিন্তা মনন নির্মাণে সহায়ক। অর্থাৎ এটি একটি উভমুখী প্রক্রিয়া।

বাংলা ভাষাতে এমন অনেক শব্দ আছে যা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নয়। নয় তার কারণ আমাদের সমাজ লিঙ্গ নিরপেক্ষ নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভাষা নির্মাণও তাই একপেশে। কোনো কোনো পেশা, ঘরের কাজ, মানবিক গুণাবলী নির্দিষ্ট লিঙ্গের সঙ্গেই যুক্ত। আর তার ফলে বিভিন্ন শব্দও। যেমন, স্ত্রী সতী প্রভৃতি শব্দবন্ধ যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীদের জন্যই নির্দিষ্ট। এদের কোনো লিঙ্গান্তর নেই। মুসলিম সমাজেও আমরা বেশ কিছু শব্দ পাব যা বিশেষভাবে বিশেষ লিঙ্গের মানুষদের সঙ্গে সংযুক্ত।

যেমন ‘সাহাবা’ শব্দটি ধর্মীয় পরিসরে মুসলিমদের কাছে একটি পরিচিত শব্দ। এই শব্দটির সময় ফ্রেম বা t হজরত মহম্মদের জীবন কালীন সময়ের। আর স্থান বা w হল আরব। কিন্তু সাহাবারা সবাই পুরুষ ছিলেন। ফলে সাহাবা শব্দটি বলতেই নারী পুরুষ নির্বিশেষের কাছে যে অর্থ তৈরি হয় তা একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

‘ভাত খেল না’ এই শব্দটি ডিভোর্স বলতে ব্যবহৃত হয় ঠিকই। কিন্তু এটিও শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মেয়েটি ছেলেটির ভাত খেল না। স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব এক্ষেত্রে বর্তায় তার বরের উপরে। এই পদবন্ধটি বলা হলেই তাই বোঝা যাবে

কোনো একটি মেয়ের তার বরের কাছ থেকে চলে আসার কথা বলা হচ্ছে। কারণ ধরে নেওয়া হচ্ছে মেয়েটি উপার্জনক্ষম।

বেওয়া – বিধবা মুসলিম মেয়েরা অনেকেই নামের শেষে বেওয়া লেখেন তাদের বিধবা অবস্থা বোঝাতে। এইরকম কোনো শব্দ পুরুষদের নামের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে দেখিনা।

বিবি/বেগম – বিবি বা বেগমও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েরা ব্যবহার করেন। এবং পুরুষদের জন্য এই শব্দগুলোর কোনো লিঙ্গান্তর নেই।

পয়গম্বর– পয়গম্বর সবসময় পুরুষই হয়। কোনো নারীকেই আমরা পয়গম্বর রূপে পাইনি। ফলে পয়গম্বর বলতেই আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা কোনো পুরুষের। তা কোনোভাবেই নারীর নয়।

মৌলবি – ইসলাম ধর্মের পণ্ডিত বা ধর্মীয় গুরু। এক্ষেত্রেও আমরা দেখব মৌলবি বলতেই আমরা পুরুষকেই বুঝি। কোনো নারীকে নয়। মেয়েরাও মাদ্রাসা ইত্যাদিতে পড়ে মাওলানা ডিগ্রি লাভ করতে পারে কিন্তু সচরাচর মৌলবি বা মাওলানা বলতে আমরা পুরুষকে বুঝি। নারী পুরুষ নির্বিশেষে এই শব্দের অধিভাষাতে পুরুষের ধারণা পাওয়া যায়।

পবিত্র – বিভিন্ন ধর্মে পবিত্রতার ধারণা বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। ইসলামে জমজমের পানিকে পবিত্র পানি বলে মনে করা হয়। হিন্দু ধর্মে গঙ্গা জলকে পবিত্র বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন সমাজে পবিত্রতার ধারণা বিভিন্ন বস্তু বা ধারণার সঙ্গে যুক্ত। প্রায় সবরকম বাঙালি সমাজেই ‘পবিত্র নারী’র একটা ধারণা আছে। কিন্তু পবিত্র পুরুষের কোনো ধারণা সেভাবে কোনো সমাজেই পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি, পবিত্র পুরুষ কথাটি প্রচলিতই নয়। কারণ পুরুষের পবিত্রতার দাবিই সমাজে নেই। বলা বাহুল্য, নারীর পবিত্রতা নির্ভর করে মূলত দৈহিক শুচিতার উপর। আর এই শুচিতা স্বামীর প্রতি তাদের একনিষ্ঠ মানসিক

ও দৈহিক নিবেদনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই মুখ্য নয়। তাই পুরুষের পবিত্রতা বিচার এক অলীক বিষয়। পবিত্রতার সঙ্গে নারীকে মিলিয়ে দেখার এই অভ্যেস হিন্দু মুসলিম সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই আছে। তাই পবিত্রতার অভাবে মেয়ে নষ্ট হয়। ছেলে নষ্ট হয় না। এই শব্দবন্ধটিও তাই আমাদের সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যকে পরিস্ফুট করে।

বেশ্যা, কুলটা – এই শব্দগুলিরও কোনো লিঙ্গান্তর বাংলা ভাষায় নেই।

ছিদাল – এটিরও কোনো লিঙ্গান্তর হয় না। এই শব্দগুলি মেয়েদের যৌনতা যৌন আকাজ্জা বা যৌন পেশা সম্বন্ধীয়।

এছাড়া কয়েকটি পেশা আছে যেমন জেলে চাষি কৃষক এদের লিঙ্গ পরিবর্তন করলে জেলে-বৌ বা কৃষক-বৌ হয়। কিন্তু সেটা জেলের বৌ বা কৃষক বৌকে বোঝায় কিন্তু কোনো মেয়ে যদি মাছ ধরাকে বা চাষ করাকে পেশা হিসেবে নেয় তাহলে তার জন্য আলাদা কোনো শব্দ নেই। এখানে একটি পেশা সম্বন্ধীয় শব্দকে মুখ্যত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে একটি বিশেষ লিঙ্গের সঙ্গে। আর অন্য লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত শব্দকে সেই শব্দটির বশ্যতা করতে হচ্ছে। এ থেকে জীবিকা কেন্দ্রিক শব্দের সঙ্গে লিঙ্গ নির্ভর পেশার এক ধরনের সংযুক্তির সম্পর্ক প্রতিফলিত হচ্ছে।

মেয়েদের রূপ সৌন্দর্য কেন্দ্রিক অনেক শব্দই আছে যেগুলোর কোনো লিঙ্গান্তর হয় না। যেমন হাস্যময়ী মক্ষীরাগী কেশবতী মায়াবতী যৌবনবতী আবেদনময়ী ইত্যাদি শব্দগুলো শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। পুরুষদের জন্য নির্দিষ্টভাবে রাখা সৌন্দর্য বা রূপ কেন্দ্রিক কোনো বিশেষণ সেরকমভাবে বাংলা ভাষায় নেই।

মেয়েদেরকে বোঝাতে যে যে শব্দগুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত সেগুলি হল – নারী, রমণী, মহিলা, মেয়েলোক, মেয়েমানুষ, মেয়েছেলে, স্ত্রীলোক ইত্যাদি। আর উলটো দিকে ছেলেদের বোঝাতে যে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল – মানুষ, লোক, পুরুষ, ব্যক্তি ইত্যাদি। একটু খেয়াল করলে দেখব, মানুষ লোক ব্যক্তি এইসবগুলিই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এগুলো বললেই আমাদের মনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা একজন পুরুষের তা কোনো নারীর নয়। তাই নারী বোঝাতে এইসব শব্দের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ শব্দ যোগ করতে হয়েছে। যেমন মেয়েমানুষ, স্ত্রীলোক, মেয়েলোক ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরুষ হয়ে উঠছে মনুষ্য প্রজাতির প্রধান ভাগ আর নারীকে উপ বা অন্তর্গত একটি বিশেষ শ্রেণিতে ফেলা হচ্ছে। অন্তত আমাদের রোজকার ভাষা ব্যবহার তাই বলছে।

সমাজে যথার্থ পুরুষ হওয়ার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্যও আরোপ করেছে। সেই সংজ্ঞায় না পরলে তাকে কাপুরুষ, না-মরদ (মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকে অনেকসময়) বলা হয়ে থাকে। সাধারণত সাহস বীরত্ব ব্যক্তিত্ব কাঠিন্য এই সমস্ত গুণাবলীর অভাবেই কাপুরুষ বা না-মরদ বলা হয়ে থাকে। উলটোদিকে নারীত্ব অর্জন করতে হয় না। একটি মেয়ে তার লিঙ্গ-চিহ্ন সমেত নারী হয়েই জন্মায়। তাই সে নষ্ট হতে পারে অপবিত্র হতে পারে কিন্তু নারীই থাকে। এবং খারাপ এবং নষ্ট যেভাবে একটা নারী হয় পুরুষের পৌরুষ হরণ একেবারেই সেভাবে হয় না। দুটো একেবারেই ভিন্ন বিষয়।

মেয়েছেলে – ছেলেমেয়ে

মেয়েমানুষ – ছেলেমানুষ

আপাতভাবে শুধু শব্দ সজ্জা দেখে মনে হতে পারে কারো যে এই দুটি বিপরীত শব্দ। কিন্তু আমরা জানি মেয়েছেলে বলতে যা বোঝায় আর ছেলেমেয়ে বলতে যা বোঝায় তাদের মধ্যে

কোনো মিল নেই। মেয়েছেলে শব্দটি সাধারণত শব্দের এলিট শ্রেণি ব্যবহার করে না, বা করলেও অভিজাত শিক্ষিত মেয়েদের জন্য ব্যবহার করে না। সাধারণত নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত নারীদের মেয়েছেলে বলা হয়। গ্রামের দিকে অবশ্য মেয়েছেলে কথাটি বলার রেওয়াজ অনেক বেশি। আর মেয়েছেলে বললেই একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকেই বোঝা যায়। উলটোদিকে ছেলেমেয়ে বলতে কখনো কারোর সন্তানাদি বোঝায়। যেমন - আমার ৩ টে ছেলেমেয়ে। আবার কখনো ছেলে মেয়ের দল বোঝাতেও ছেলেমেয়ে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে বললে যে ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে তা কখনই প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের নয়। অপেক্ষাকৃত ছোটোদের জন্য ছেলেমেয়ে কথাটি তখন ব্যবহৃত হয়।

আর ‘ছেলেমানুষ’ বা ‘ছেলেমানুষি’ শব্দটিতে একধরনের সারল্য এক ধরনের অপরিণত শিশু সুলভ ভুল বা দৌরাছ্যের কথা আছে। যা কখনোই মেয়েমানুষ শব্দটির মধ্যে নেই। উলটে মেয়েমানুষ শব্দটির মধ্যেও প্রাপ্তবয়স্ক যুবতী নারীর ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়।

নারী পুরুষের শৈশবকে বোঝাতে ছেলেবেলা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর বিপরীতে তসলিমা নাসরিনের ‘মেয়েবেলা’ শব্দটির ব্যবহার আমরা জানি। তবে বাংলাতে আর একটি শব্দ আছে যা লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। সেটি হল ছোটোবেলা। এই শব্দগুলি মুসলিম হিন্দু সমস্ত গোষ্ঠীতেই প্রচলিত।

অন্যান্য অনেক ভাষার মতোই বাংলা ভাষার শব্দতেও লিঙ্গ বৈষম্য দেখা যায়। এছাড়া বেশিরভাগ গালাগালিও আমরা দেখি মেয়েদের যৌনতা বা যৌনাঙ্গকে কেন্দ্র করে। মেয়েদেরকে শরীর সর্বস্ব করে দেখার প্রবণতা যেহেতু একটা ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তাই সমস্ত ধর্মের মধ্যেই এবং সমস্ত সমাজে পিতৃতান্ত্রিকতা বহমান। আর তারই প্রতিফলন ঘটে ভাষায়। অপভাষার মধ্যে তার অকৃত্রিম বেআব্রু প্রয়োগ ঘটে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যপূর্ণ ভাষাতে এটা খুব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ঘটনা যে সমস্ত লিঙ্গের মানুষের কাছে সেই ভাষার সমস্ত সিগনিফায়ার সব লিঙ্গের মানুষের কাছে একই বিষয় সিগনিফাই করবে না। মুসলিম মেয়েদের কথাতেও আমরা দেখলাম শব্দার্থ ও অধিভাষার এক নিজস্ব জগৎ তাদের আছে। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে যে কোনো বাংলাভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে তা এক। আবার কখনো নারী পরিচয়টা তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠছে। হিন্দু নারী মুসলিম নারীর অধিভাষা সেখানে খানিক এক হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অজস্র আমির পরিচয় অস্তিত্ব একাত্ম হয়ে থাকে বিভিন্ন সামাজিক ভূমিকায় যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে কখনো বা তার প্রকাশ ঘটেও না। সেরকম যেকোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের মধ্যেও অজস্র সামাজিক স্থানান্তর জুড়ে জুড়ে থাকে। সেই সমস্ত সামাজিক ভূমিকা বা অবস্থান প্রত্যেক ব্যক্তি বা সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে অর্থবোধের ক্ষেত্রে।

মুসলিম নারীর ভাষার ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ সময় বিশেষভাবে তাদের নিজস্ব জগতের ছবিটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেও শুধু সেইসব ভাষা ছাড়াও ভাষার আরো বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ আছে যা হয়তো অন্য ভাষাগোষ্ঠীর থেকে পৃথক নয়। সেই পুরোটা মিলিয়েই তাদের অন্তর্জগৎ নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য এই যে অধিভাষার জগৎ তা স্থির অনড় কোনো বিষয় নয়। সভ্যতা ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার, জীবন শৈলীর পরিবর্তন, মূল্যবোধের পরিবর্তন ভাষার অধিভাষা বা মেটা ল্যাঙ্গুয়েজের জগতকেও পালটে পালটে দেয়। মেয়েদের শিক্ষাবিস্তার বা কর্মজগতে প্রবেশ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পুরুষের অধিকৃত একচেটিয়া পেশাগুলোর জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ধীরে ধীরে। সর্বস্তরে সেই পরিবর্তন না হলেও অন্তত পরিবর্তন ঘটানোর দাবি উঠছে।

যেমন রাষ্ট্রপতির বদলে রাষ্ট্রপ্রধান

সভাপতি - সভামুখ্য

চেয়ারম্যান - চেয়ারপার্সন

ইত্যাদি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দগুলিকে বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে মেয়েদের এইসব পরিসরে অংশগ্রহণের কারণে। আবার অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, ছাত্র ইত্যাদি পেশা ভিত্তিক শব্দের লিঙ্গান্তর না ঘটিয়ে এই শব্দগুলিকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ শব্দ হিসেবে দেখার কথাও ভাবা হচ্ছে।

একদিকে শব্দভাণ্ডারের শব্দগুলোর মধ্যে লিঙ্গ-সাম্য আনার কথা ভাবা হচ্ছে অন্যদিকে নারী পুরুষ লিঙ্গ চিহ্নের এই বাইনারির বিপরীতে কেউ কেউ নিজেদের কোনো একটি জেন্ডার আইডেন্টিটির খোপের মধ্যে রাখতে অস্বীকার করছেন। নারী পুরুষ সম্পর্কিত চেনা ধারণা বৈশিষ্ট্যগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করছেন। এছাড়া আছে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের আত্মপরিচয়ের নিজস্ব সংগ্রাম। কুইর থিওরি শিক্ষাজগতে এখন আলোচিত বিষয়। চিরাচরিত সামাজিক ভূমিকার বাইরে বেরিয়ে এসে নারী পুরুষ উভয়েরই লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করা শুরু হয়েছে। শিক্ষাজ্ঞান ছাড়িয়ে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন এবং কর্মসূচিও দেখা যাচ্ছে সমগ্র বিশ্ব জুড়েই। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে খুব স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে সচেতনতা সীমাবদ্ধ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা যোগ নেই।

ইসলামে যেহেতু হেটেরোসেক্সুয়ালিটি বাদ দিয়ে দিয়ে অন্য যেকোনো রকম সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশান নিষিদ্ধ তাই প্রথাগত ধার্মিক মানুষেরা এই বিষয়গুলোকে ‘অপ্রাকৃতিক’ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো একক ব্যক্তি ধর্ম বা পরিবার থেকে প্রাপ্ত সংস্কার থেকে বেরিয়ে মুক্ত চিন্তার চর্চা না করলে এইসব ট্যাবু থেকে বেরোতে পারে না। এটা অবশ্য সার্বিকভাবে সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্যই প্রযোজ্য।

কোনো শিশুকে তার নিজস্ব লিঙ্গ-পরিচিতি খুঁজে নেওয়ার বা আবিষ্কার করার কোনো সুযোগ সচরাচর আমাদের সমাজে দেওয়া হয় না। লিঙ্গ-চিহ্নকই বা যৌনাঙ্গই সেক্ষেত্রে একমাত্র পরিমাপক হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র কানে শুনে আমরা বেশিরভাগ সময়ে নির্ভুলভাবেই পুরুষ না নারীর ভাষা বুঝতে পারি। সেটা অবশ্য মূলত তাদের ভাষার ধ্বনিগত পার্থক্যের জন্য। মেয়েদের কণ্ঠ অনেক বেশি পেলব হয়ে থাকে শারীরবৃত্তীয় কারণে। এছাড়া মেয়েদের গলার pitch ও ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই মেয়েদের গলা সাধারণত তীক্ষ্ণ হয়। এছাড়া মেয়েরা সাধারণভাবে কথা বলার সময় অনেক বেশি অধিধ্বনি বা intonation এর ব্যবহারও করে থাকে। যেমন –

“ কীইইইইইই সরবনাআআশ! বৃষ্টিতে সব ভিজে গেল! আল্লাহ! তোল তোল জামাকাপড়গুলো তোল! ঈশশ ! যাহ! কী হল! ”

বিস্ময়বোধক বাক্যের ব্যবহারও অনেক বেশি লক্ষ্য করা যায় মেয়েদের কথাবার্তায়।

নারী পুরুষের প্রাকৃতিক বিভাজন স্বীকার করেও তাই বলা যায় যতদিন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈষম্য যত প্রকট থাকবে ততদিন লিঙ্গ ভিত্তিক আলাদা ও বিশেষ অধিভাষার জগতের মধ্যে পার্থক্য তত প্রকট থাকবে। অধিভাষার এই জগৎ অনুধাবনের চেষ্টা ল্যাবরেটরির পরীক্ষার মতো অভ্রান্ত নিশ্চিত সম্পূর্ণ অখণ্ড হবে না। সমাজবিজ্ঞানের যে কোনো শাখাতেই কোনো কিছু শেষ কথা নয়। বিনা মন্তব্যে বিনা বিতর্কে তা গ্রহণীয়ও নয়। এছাড়া মানুষের অধিভাষার জগৎ এক অর্থে দুর্জয়ের ও বিমূর্ত। তা যেমন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যেতে পারে তেমন একই ব্যক্তিরও সময় জীবন-পর্ব পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে কিছু শব্দের ক্ষেত্রে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এছাড়া আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে এই জীবন এই পৃথিবীকে উপলব্ধি করি গ্রহণ করি। তাই যে কোনো দুজন

মানুষের অধিভাষার জগতের মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকে যাবে যা এই সন্দর্ভের মধ্যে ধরা হয়নি।

সময় এবং স্থান মানুষের জীবনের দুই প্রধান আলম্ব বিন্দু। এর মধ্যে সময়কে আমরা কোনোভাবেই নির্বাচন করতে পারি না। স্থানের ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য এখানে অনেকরকম হতে পারে। আমরা সব স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই শব্দার্থ স্থান ও সময় সাপেক্ষ।

এই সন্দর্ভের অনুসন্ধান বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। অর্থাৎ, synchronic বা এককালীন সময়ের মুসলিম মেয়েদের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষা চালিয়ে এই গবেষণার কাজ করা হয়েছে। তাই অতীত এবং ভবিষ্যতে সামাজিক পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে তা পরিবর্তিত হবে।

আমরা চারটে জেলায় এই ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি মুসলিম মেয়েদের উপর। দুই চব্বিশ পরগণা এবং মালদা মুর্শিদাবাদ – এই চার জেলার স্বতন্ত্র ইতিহাস। ভৌগোলিক অবস্থান বেশ আলাদা। দুই চব্বিশ পরগণা কোলকাতা নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত। আর মালদা মুর্শিদাবাদ কোলকাতা থেকে অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত। এই চার জেলার অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জলবায়ুগত পার্থক্য রয়েছে। মালদা আর মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত। ইসলামের প্রসার ও পালনের ধরনও খানিক আলাদা আলাদা। মেয়েদের অবস্থানও আলাদা। আর ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য তো আছেই। ফলে এই গবেষণা সন্দর্ভে চার জেলার মেয়েদের একত্রে অধিভাষার জগৎ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হলেও কিছু সূক্ষ্ম ফারাক থেকে যাবে।

‘মুসলিম মেয়ে’ এই শব্দবন্ধটির অধিভাষাতে মুসলিমদের নিজস্ব এক ধারণা যেমন আছে, অন্যদিকে অমুসলিমদের ক্ষেত্রেও ‘মুসলিম মেয়ে’ শব্দবন্ধটির অধিভাষাতে যে ধারণা

আছে তা সবসময় এক নয়। তবে মুসলিম মেয়েরা যখন নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকে তখন তারা নিজেদের ‘মুসলিম’ পরিচিতি নিয়ে অনেক বেশি সচেতন থাকে আবার অমুসলিম বা সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি অন্য ধর্মের হয় তবে তারা তাদের সামনে তাদের ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে সংকুচিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম মেয়েরা যেমন তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের সামনে ‘ভালো মুসলিম’ প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকে আবার সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের সামনে তারা অনেক সময় মুসলিম পরিচয় বলতে যা বোঝা হয় সেইসব চিহ্ন বা আচার-অনুষ্ঠানকে তারা যথাসম্ভব লুকিয়ে ফেলতে চায়। যেমন- তারা নিজেদের মধ্যে ‘পানি’ বললেও অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের সামনে ‘জল’ বলে থাকে কারণ সংখ্যাগুরু ‘জল’ বলে থাকে। আবার আত্মীয়বাচক শব্দগুলোও তারা পরিবর্তন করে নিয়ে সংখ্যাগুরুর মতো করে বলতে চেষ্টা করে। যেমন- আব্বা – বাবা, আম্মা – মা, ভাই – দাদা, খালামা – মাসি, খালু – মেসো, ফুপু – পিসি, দাদীমা – ঠাকুমা, নানিমা – দিদা ইত্যাদি। এছাড়া শুধু ভাষা নয়, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব পরিবর্তন ঘটছে। বিবাহিত মহিলাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা মাথা আবৃত করে থাকে, কিন্তু অনেক সময়ই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সামনে তারা পর্দা নিয়ে সচেতন নয় বা সচেতন ভাবে পর্দা করে না – এই দুই প্রকারই দেখা যায়। আবার, নারী পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক মেলামেশা নিয়ে ইসলামে সাধারণত একটু অস্বস্তি থাকে। অনেক সময় আমরা খেয়াল করি, মুসলিম মেয়েরা তাদের আত্মীয়স্বজন বা সমাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে কুণ্ঠিত হলেও বাইরে বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্কুল কলেজের মাধ্যমে যোগাযোগের স্থাপনের ফলে এই সংকোচ তাদের কেটে যায়। কিন্তু বাইরে তাদের চরিত্রের মধ্যে এই দিকটি প্রকাশ পেলেও রক্ষণশীল পরিবারের আবহে ফিরে গেলে তাদের এই দিকটি তারা সবসময় প্রকাশ করে না। ফলে তাদের চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব বা দ্বৈততা খেয়াল করতে পারি। যার প্রকাশ তাদের ভাষার মধ্যেও খেয়াল করতে পারি। বিভিন্ন অবস্থান ও পরিস্থিতি অনুসারে তাদের ভাষা প্রয়োগ পালটে যায়। এই পালটানোর

প্রবণতা আমরা পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে বেশি খেয়াল করব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে মেয়েরা অনেকভাবে অবদমিত বলে, তাদের অনেক বেশি ‘পারফেক্ট’ হওয়ার দিকে লক্ষ্য থাকে। যার প্রভাব তার ভাষাতেও পড়ে। তারা অনেক বেশি মান্যায়িত আদর্শ ভাষা বলার চেষ্টা করে থাকে। উচ্চারণ ভঙ্গিতেও সেটা ধরা পড়ে। অর্থাৎ, তাদের অস্তিত্ব নিয়ে তারা সবসময় এক ধরনের সংকটে থাকে। অর্থাৎ নিজেদেরকে প্রমাণ করার একটা তাগিদ আমরা খেয়াল করব। তাদের সাজ-সজ্জা, ভাষা, আদব কায়দা এসমস্ত কিছুতেই তাদের একটা পারফেক্ট হওয়ার দায় থাকে। ছোটো থেকেই মেয়েদেরকে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এই প্রতিযোগিতাটা এতো বহুস্তরীয় নয়। সমাজে ছেলেদের স্বীকৃতি বা মর্যাদা তাদের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অনেক সময় আমরা জীবিকা বা পড়াশুনার ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বহুস্তরীয়। যার প্রভাব তাদের আচরণে ও ভাষাতেও পড়ে। তাই সর্বক্ষেত্রেই মেয়েদের ‘সঠিক’, ‘ভালো’ হওয়ার দায় থেকে তাদের মধ্যে অনেক বেশি দ্বন্দ্ব দেখা যায়। জীবনের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন তারা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয় ‘ভালো’ মেয়ে বা ভালো মুসলিম মেয়ে হওয়ার জন্য। সেই অপরিপূর্ণ আশা স্বপ্ন তারা একদিকে যেমন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বুনে দিতে চেষ্টা করে অন্যদিকে কিছু কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ধরনের ঈর্ষা কাজ করে থাকে। তাই শাশুড়ি – বৌমার বা ননদ- বউদি বা অন্য বেশ কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে যায়। ফলে, তাদের অন্তর্জগৎ অনেক বেশি দ্বন্দ্বময়। তাদের ভাষাও পুরুষদের থেকে অনেক বেশি ইঙ্গিতময়।

‘মুসলিম মেয়ে’দের ক্ষেত্রেও আমরা এক দ্বন্দ্বিক অন্তর্জগতের সন্ধান পাবো। যেখানে ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন একটা আলাদা মাত্রা সংযোগ করেছে। এছাড়া ‘মুসলিম মেয়ে’ সম্পর্কিত যে ধারণা জন-মানসে আছে তা বেশিরভাগ সময়ই আধুনিক চিন্তাভাবনা মননকে

বিস্কুদ্ধ করে। ইসলামের পর্দা করার রীতি, পুরুষের চারটে বিবাহ রীতি সবই খুবই সমালোচিত। অন্যদিকে ইসলামে ভালো মেয়ে হওয়ার জন্য যে সমস্ত অনুশাসন আছে তা অনেকসময়ই তাদেরকে যে দিকে চালিত করার চেষ্টা করে তা পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে একেবারে খাপ খায় না। আর নিষেধের জন্যই তাদের একরকম তীব্র আকর্ষণও আমরা খেয়াল করব।

তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে অন্তর্জগতের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। তাদের ভাষার মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। w = স্থান ও t বা সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম মেয়েদের ভাষা ও অধিভাষার জগৎ অনেক বদলে গেছে। একই পরিবারে তিন প্রজন্মের মেয়েদের কথা থেকে তা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারব। যেমন পোশাক, বিয়ে, সংসার - সামগ্রিকভাবে জীবন সম্পর্কেই অনেক মূল্যবোধ দৃষ্টিকোণ পালটে গেছে। অনেক নতুন শব্দ এসে জায়গা করে নিয়েছে। পুরনো শব্দ কালের নিয়মে হারিয়ে যাচ্ছে। একই শব্দেরও অধিভাষা বা meta language বদলে যাচ্ছে। ভাষা থেকে অধিভাষার জগতে পৌঁছানোর এই যাত্রা তাই সরলরৈখিক নয়। অনেক সূচক মাত্রা নির্ভর। এই গবেষণা সন্দর্ভে মুসলিম মেয়েদের ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক ও তা থেকে অধিভাষার দিকগুলি অনালোচিত থেকেছে। আগামীদিনের গবেষক নিশ্চয় এই নিবন্ধের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বইয়ের তালিকা

আচার্য, পরমেশ। বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯

আজাদ, হুমায়ন, বাক্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

গনী, ওসমান। কোরান শরীফ বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা। মল্লিক ব্রাদার্স। কোলকাতা, ২০০৭

গোস্বামী, কৃষ্ণপদ। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস। করুণা প্রকাশনী। কোলকাতা। জুলাই, ২০১৬ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। ধ্বনিঃ চেতনার নির্বাক বিদ্যুৎ। শ্রীময়ী। নববর্ষ সংখ্যা। কোলকাতা। ১৪২৪

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। নারীর ভাষা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ইন্দাস, কোলকাতা, ২০০৬

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, দেজ পাবলিশিং। ২০০৪

চক্রবর্তী, উদয়কুমার। বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ। অরবিন্দ পাবলিকেশন। ২০১৩

চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার। বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, কোলকাতা। ডিসেম্বর, ১৯৯৬,

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। বাংলাভাষা প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা। ১৯৭৫

চৌধুরী, কমল। চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। জুন, ২০১৬

চৌধুরী, কমল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দ্বিতীয় পর্ব। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। মে, ২০১১

চৌধুরী, কমল। সম্পাদনা। মালদহর ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। ২০১৯

থানবী, হাকীমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী। নূরানী বাংলা কোরআন শরীফ
মূল আরবীর বাংলা উচ্চারণ, অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টীকাসহ। অনুবাদ মাওলানা মোঃ
মাজহারুল ইসলাম। মীনা বুক হাউস। ঢাকা।

দত্ত, বসু, শর্মিলা। বাংলায় মেয়েদের ভাষা। কোলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ২০০৬

দত্ত, মিলন। মুসলিম সমাজ। কারিগর। ২০১৭

দাশ, নির্মল। বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
কোলকাতা। ২০০০

দাশ, শিশিরকুমার। ভাষাজিজ্ঞাসা। প্যাপিরাস। কোলকাতা। ১৪১৭

দে, অশোককুমার। ঐতিহাসিক শব্দার্থতত্ত্ব – একটি মূল্যায়ন। ত্রিদিপ প্রকাশনী। কোলকাতা।
১৯৯৫

নাথ, মৃণাল। ভাষা ও সমাজ। নয়া উদ্যোগ। কোলকাতা। ১৯৯৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। ভাষা ভাষা কথা। কারিগর। কোলকাতা। ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। সাহিত্য একাডেমী। নিউ দিল্লি। ১৯৭৮

বিশ্বাস, নুরুল আমিন। মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনমানস। বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন। কোলকাতা।
জানুয়ারি, ২০১১

বিশ্বাস, সুখেন। প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রত্যয় প্রকাশনী। কোলকাতা। ২০১২

বোখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল। সহীহ বোখারী শরীফ। অনুবাদ হজরত মাওলানা শামছুল হক, শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। মীনা বুক হাউস। ঢাকা। ২০১৯

মওদুদী, সাইয়েদ আবুল লালা। রাসায়েল ও মাসায়েল। আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস। ঢাকা। ২০০৮

মওলানা, হজরত। মুস্তাখাব হাদীস, হাফিজিয়া কুতুব খানা, দঃ ২৪ পরগণা। ২০১৪

মজুমদার, পরেশচন্দ্র। বাংলাভাষা পরিক্রমা (১ম খন্ড), সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮৩

মজুমদার, পরেশচন্দ্র। বাংলাভাষা পরিক্রমা (২য় খণ্ড) সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮৬

রশিদ, মোহাম্মদ হারুন। সংকলন ও সম্পাদনা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান। বাংলা একাডেমি ঢাকা। ঢাকা। ২০১৬

রায়, ভারতী। নারী ও পরিবারঃ বামাবোধিনী পত্রিকা (সংকলন ও সম্পাদনা)। আনন্দ পাবলিশার্স। কোলকাতা। ২০০২

শ, রামেশ্বর। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, ১৩৯৪

সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। সাহিত্যলোক। কোলকাতা। জানুয়ারি, ২০০২

সরকার, পবিত্র। বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। জানুয়ারি, ২০০৬

সরকার, পবিত্র। ভাষা দেশ কাল। মিত্র ও ঘোষ (তৃতীয় মুদ্রণ)। কোলকাতা। ১৪১৯

সরকার, পবিত্র। ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ। দে'জ পাবলিশিং। কোলকাতা। জানুয়ারি, ২০০৩

সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স (পঞ্চদশ মুদ্রণ)। কোলকাতা। ২০১৫

সেনগুপ্ত, পল্লব। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। পুস্তক বিপণি, কোলকাতা। জানুয়ারী, ২০১০।

হাসান, জাহিরুল। বাংলায় মুসলমানের ইতিহাস। পূর্বা প্রকাশনী, ২০১৫

ভূমায়ুন, রাজীব। সমাজভাষাবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী। ঢাকা। ২০০১

হোসেন, সেলিনা, সালমা আখতার এবং মাসুদুজ্জামান। সম্পাঃ পুরুষতন্ত্র নারী ও শিক্ষা। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। ২০০৭

ইংরেজি বইয়ের তালিকা

Adichie, Chimamanda, Ngozi. *We Should All Be Feminists*. Fourth State. 2014

Ahmed, Aziz. *An Intellectual History Of Islam in India*, Edinburgh University Press, 1969

Ahmed, Hilal. *Siyasi Muslims*. Penguin Viking. 2019

Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press (Veritas paperback edition). 2021

Ahmed, Syed Nesar. *Origins of Muslim Consciousness in India*, Greenwood Press, London. 2004

Allan, Keith. *Natural Language Semantics*. Blackwell. 2001

Armstrong, Karen. *Muhammad Prophet For Our Time*. Harper Perennial. 2007

Asher, Ron. *In Encyclopedia of Language and Linguistics*, ed. Pergamon Press. Oxford. 1994

Babakhan, Ziauddin Khan Ibn Ishn. *Islam and the MUSLIMS in the Land Of Soviets*. Progress Publishers. 1980

Bach, Kent, *Thought and Reference*, Clarendon Press, Oxford, 1987

Bach, Kent and Robert M. Harnish, *Linguistic Communication and Speech Acts*, MIT press, Cambridge, 1979

Backhouse, Anthony E. Connotation. *International Encyclopedia of Linguistics*, ed. William Bright, vol. 1, Oxford University, Oxford, 1992

Barthes, Roland. *Mythologies*. trans by Jonathan Cape. The Noonday Press. New York. 1972. pdf

Beauvoir, Simone. *the Second Sex*. trans. by Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier. Vintage Books. London. 2011

Bentham, Johan F.A.K van. *A Manual of Intensional Logic*, Chicago University Press, Chicago, 1988

Bhattacharyya, Kalidas. *Possibility of Different Types Of Religion*. The Asiatic Society. 1974

Bussmann, Hadumod, *Dictionary of Language and Linguistics*, trans and edited by Gregory P Trauth and Kerstin Kazzazi, Routledge, New York, 2006

Bussmann, Hadumod. *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*. translated and edited by Gregory Trauth and Kerstin Kazzazi. Routledge. 1998

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Rutledge. New York. 2006

Chatterji, S. K. *Origin and Development of the Bengali Language* in 3 part, Rupa & Co. Calcutta. 1975

Chomsky, Noam, *Syntactic Structures*, Mouton, Hague, 1957

Chomsky, Noam. *Aspects of the Theory of Syntax*, MIT Press, Cambridge, 1965

Chomsky, Noam. *Language and Mind* (Third Edition). Cambridge University Press. Cambridge. 2006

Clark, Herbert H. and Eve V, Clark. *Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics*, Harcourt Brace, New York. 1977

Coate, Jennifer. *Women, Men and Language A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language* (Third edition). Routledge. 2013. pdf

Cresswell, Max J. *Structured Meaning: The Semantics of Propositional Attitudes*. MIT Press, Cambridge, 1985

Danesi, Marcel. Edited. *A Basic Course in Anthropological Linguistics*. Canadian Scholars' Press Inc. 2004. pdf

Datta, Kusum. *Women's Studies And Women's Movement In INDIA*. The Asiatic Society, 2007

Di Sciullo, Anna Maria and Edwin Williams, *On the Definition of Word*, MIT press, Cambridge, 1987

Eaton, M, Richard. *The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760*. University Of California Press. 1993. pdf

Empson, William. *Seven Types Of Ambiguity*. Chatto and Windu. 1949. pdf

Fodor, Jerry A. *Psychosrmantics: the Problem of Meaning in the Philosophy of Mind*. MIT Press. Cambridge. 1987

Gibbon, Margaret. *Feminist Perspectives On Language*. Pearson Education Limited. New York. 1999

Heusinger, Klaus von., and Ken Turner. *Where Semantics Meets Pragmatics*. Vol 16, Elsevier Ltd. 2006. pdf

Huck, J, Geoffrey. Goldsmith, A. John. *Ideology And Linguistic Theory Noam Chomsky And The Deep Structure debates*. Routledge. London and New York. 1995. pdf

Huges, Maeve. *Epic Women East And West*. The Asiatic Society. 2015

Jackendoff, Ray. *Foundations Of Language Brain Meaning Grammar Evolution*. Oxford University Press. pdf

Jespersen, Otto. *Language Its Nature Development And Origin* . Henry Holt & Company. 1921

Jourdan, Christine. and Kevin Tuite. *Language, Culture, And Society Key Topics In Linguistic Anthropology*. Cambridge University Press. Cambridge. 2006

Kearney, Christopher A. *Social Anxiety and Social Phobia in Youth Characteristics, Assessment, and Psychological Treatment*, Springer, 2005

Khan, Zafrulla, Muhammad. *Woman in Islam*. Islam International Publications Limited. 2008

Lasersohn, Peter. *Subjectivity and Perspective in Truth Theoretic Semantics*. Oxford. 2017

Lasersohn, Peter. *Subjectivity and Perspective in Truth-Theoretic Semantics*. Oxford University Press. Oxford. 2017

Leech, Geoffrey. *Semantics : The Study of Meaning*. 2nd ed. Penguin. 1981

Lyons, John. *Semantics*. Cambridge University Press, 1977

Madan, T. N., *Two Faces Of Bengali Ethnicity: Muslim Bengali Or Bengali Muslim*, The Developing Economics: vol -10, issue-1, 74-85, 1972

Mazumdar, Rinita. *a short introduction to Feminist Theory*. Anustup. 2010

Millett, Kate. *Sexual Politics*. University of Illinois Press. 1970

Mirza, Hazrat. *The Economic Structure Of Islamic Society*. Nazir Dawat-O-Tabligh Ahmadiyya Community Qadian (India), 1996

Mujeeb, M. *The Indian Muslims*. Munshiram Manoharla Pvt. Ltd. New Delhi. 1996

Propp, Vladimir. *Morphology Of The Folk Tale*. University of Texas Press. 2009. pdf

Reimar, Nick, *Introducing Semantics*. Cambridge University Press. 2010

Robins, R, H. *A Short History of Linguistics*. Lowe & Brydone (Printers) Ltd. 1976.pdf

Russell, Bertrand. *On denoting. Mind*, Reprinted in Logic and Knowledge. Allen and Unwin. London. 1905

Salzmann , Zdenek. Stanlaw, James. Adachi, Nobuko. *Language Culture And Society An Introduction To Linguistic Anthropology* . Westview Press. (5th ed). 2012. pdf

Salzmann, Zdenek., James M. Stanlaw and Nobuko Adachi. *Language, Culture, and Society An Introduction to Linguistic Anthropology*. 5th ed. Westview Press.2012.pdf

Sapir, Edward. *Language*. Brace. New York. 1921

Sarkar, Narayan, Jagadish. *Islam In Bengal*. Ratna Prakashan. Calcutta. 1972

Schaff, Adam, translator. *Introduction to Semantics*. By Wojtaseiwicz, Olgierd. Pergamon Press. 1962

Searle, John R. *Expression and Meaning : Studies in the Theory of Speech Acts*. Cambridge Press, Cambridge. 1979

Sen, Sukumar. *Women's Dialect In Bengali*. Jijnasa Publication. pdf

Shah, Idries. *The Way of the Sufi*. Amaryllis. 1980

Thakur, D. *Linguistics Simplified Semantics*. Bharati Bhawan. 2001

Ullmann, Stephen A. *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*, Blackwell, Oxford,1962

Vansina, Jan. *Oral Tradition A Study In Historical Methodology*. trans by H. M. Wright. ROUTLEDGE & KEGAN PAUL, London. 1965. pdf

Vansina, Jan. *Oral Tradition As History*. The University Of Wisconsin Press. England.1985.pdf

Wierzbicka, Anna . *Understanding Cultures through Their Key Words English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford University Press. 1997

Yamaguchi Masataka., Dennis Tay and Benjamin Blount. Editor. *Approaches to Language, Culture, and Cognition The Intersection of Cognitive Linguistics and Linguistic Anthropology*. Palgrave macmillan. 2014. pdf

Yzerbyt, Vincent Y., Guy Lories and Benoit Dardenne, (edt) *Metacognition Cognitive and Social Dimensions*, Sage Publications, London, 1998

E-Journals

Agherdien, Wesahl. *Marriage and Divorce: Opportunitis and challenges Facing South African Muslim Women with the Recognition of Muslim Personal Law*. Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 2005. pp. 68-77. Taylor & Francis Ltd. <https://www.jstor.org/stable/4066701>. accessed on 07.06.2018

Donovan, Josephin. *Women and the Framed-Novelle: A Tradition of Their Own. Signs* , Summer, 1997, Vol. 22, No. 4 (Summer, 1997), pp. 947-980
Published by: The University of Chicago.
<https://www.jstor.org/stable/3175225>. accessed on 08.08.2018

Higginbotham, Evelyn Brooks. *African-American Women's History and the Metalanguage of Race*. Signs, winter, 1992, Vol. 17, No 2. pp. 251-274. The University of Chicago Press.
<http://www.jstor.com/stable/3174464>. accessed on 03.09.2017

Leezenberg, Michiel .*"Metaphor and Metalanguage,"* 2007 . Baltic International Yearbook of Cognition. Logic and Communication: Vol. 3.
<https://doi.org/10.4148/biyclc.v3i0.24>. accessed on 03.05.2018

Miriam, Cooke, Fawzia Ahmad, Margot Badran, Minoo Moallem and Jasmin Zine. *Roundtable Discussion: Religion, Gender, and the Muslimwoman. Journal of Feminist Studies in Religion* , Spring, 2008, Vol. 24, No. 1 (Spring, 2008), pp. 91-119 Published by: Indiana University Press on behalf of FSR, Inc.
<https://www.jstor.org/stable/20487917?seq=1&cid=pdf>. accessed on 8.06.2018

Stall, Frits. *The Concept Of Metalanguage And Its Indian Background*. Journal of Indian Philosophy, September 1975, Vol. 3, No ¾ , pp. 315-

354, Springer Stable. URL: <https://www.jstor.org/stable/23436906>
.accessed on 18.07.2017

Women and the Framed-Novelle: *A Tradition of Their Own* Author(s):
Josephine Donovan Source: *Signs* , Summer, 1997, Vol. 22, No. 4 (Summer,
1997), pp. 947-980 Published by: The University of Chicago Press Stable
URL: <https://www.jstor.org/stable/3175225>

Zerzan, John. *Patriarchy, Civilization And the origins of Gender*.
www.insurgentdesire.org.uk, accessed on 16.06.2017

পরিশিষ্ট

ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত (নির্বাচিত)

(আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার পরিবর্তে গল্পের পরিসর তৈরিতে বেশি মনোযোগ দিয়েছি এখানে। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য শুধু নির্দিষ্ট তথ্য জানা ছিল না। তাদের অন্তর্জগতের হাল-হদিশ পেতে চেয়েছি তাদের ভাষা-ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। তাদের কথা বলার ধরনকে যথাসম্ভব অকৃত্রিম রাখা হয়েছে তাই এখানে।)

• স্থান - মহতীপুর, মালদা

আমি- কী নাম আপনার

সফেরা - সফেরা বেওয়া।

আমি - এটা কি অনেকদিনের বাড়ি?

সফেরা - হ্যাঁ। অনেকদিনকার বাড়ি এটা। পাশেই বাংলাদেশ।

আমি- বাড়িতে কে কে আছেন?

সফেরা - বাড়িতে আমরা লোক আছি চারটা। আমি আছি। আমার ছেলে আছে। বউ বাচ্চা আছে।

আমি - মাটির বাড়ি। খুব সুন্দর রঙ করা তো। এটা কী আপনার শ্বশুর বাড়ি? আর বিয়ের আগের বাড়ি কোথায়?

সফেরা - আমার বাপের বাড়ি ওই পাড়াতে।

আমি - আপনারা বাপের বাড়িই বলেন নাকি মায়ের বাড়ি বলেন?

সফেরা- হামাদের এদিকে বাপের বাড়ী বলে।

আমি -আপনারা ‘আব্বা’ বলেন না কি বাবা বলেন?

সফেরা - হামরা বাবা বলি।

আমি -আচ্ছা। এখানে ‘জল’ বলার চল বেশি নাকি ‘পানি’ বলার?

সফেরা - হামরা পানি বলি। জল হিন্দুরা বলে।

আমি- আচ্ছা। কত বছর হয়েছে আপনার বিয়ে?

সফেরা- আমার বিয়ে চল্লিশ বছর হোয়েল। বয়স ছিল ১৫ বছর তখন বিয়ে হয়েছিল গো। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

আমি - আমি এই রিসার্চ করছি।

সফেরা - আমাদের এলাকার ভাষা কিন্তু ভালো। আমাদের বাড়ী শেরপারা, ওখানকার ভাষা আবার ভালো না। বাড়িতে বৌটা নেই গো। বাচ্চাদের স্কুল ছুটি। তাই মায়ের বাড়ী ঘুরতে গেছে। এখন সব আব্বা মাই বলে। আগে সবাই বাবাই বলতো।

আমি - হিন্দু মুসলিম পাশাপাশিই থাকেন এখানে। বেশ ভালো।

সফেরা - জাতিগত একটা বিদ্বেষ আছে। তবে সবাই যে খারাপ তা নয়। বেশিরভাগই ঘোষ। কিছু বইন চাই , মানে হিন্দুদের মধ্যে ভাগ আছে। আর মুসলিমদের মধ্যে মোমিন হানাফি সাফই আছি। আমরা বেশি সাফি সবাই।

আমি - আচ্ছা, আপনার নাকে নাকের দেখছি না।

সফেরা - বেওয়া জি। স্বামী মারা গেলে পরতে হয় না। নাকের পরতে হয় না। হাতের পরতে হয়না, রঙ্গিন শাড়িও পরা যায় না। পরা যায় না। আমাদের এখানে বিধবরা পরে না। রঙ্গিন শাড়ি পরে না।

আমি - আর ধরুন যাদের বিয়ে হয়নি, তারা নাকের পরে?

সফেরা - হ্যাঁ তারা সব পরবি। হাতের নাকের সব। পায়ের নূপুরও পরে। সবই পরে।

আমি - এখানে তো পাশে বাংলাদেশের বর্ডার। ওখান থেকে লোকজন আসে?

সফেরা - আগে আসতো। এখন না। তারঘেরা হয়েগেছে। এখন আসে না। আগে আসতো। এখন কোন উপায় নেই। পাসপোর্ট ছাড়া উপায় নেই। মোহতীপুরে অনেক আত্মীয় স্বজন আছে। কিন্তু এখন আসতে পারে না। আর জমি এদিকে ওদিক পড়েছে। সবারই আছে জমি ওদিকে। আমাদের নামেই আছে। কিন্তু কে যাবে।

আমি - আপনারা বিয়ে দেন বাংলাদেশে?

সফেরা - না না। এখন নয়। আগে হয়েছে। তারঘেরার পর আর ওসব হয়না। এখন আর বিয়ে হয় না।

আমি - আচ্ছা এখানে সবাই কেন বলছে ভয়ের ব্যাপার আছে সন্দের পর? কী অসুবিধে আছে?

সফেরা - সন্ধে হয়ে গেলে একটু ভয়ের ব্যাপার আছে। গরু আছে। হিন্দু মুসলিম পাশাপাশি থাকি।

সফেরার অল্পবয়সী আত্মীয়া - গাড়ি লেগে গেলে খুবই মুশকিল। ঝামেলা লেগেই যাবে। তাই সতর্কভাবেই চলে। ঝামেলা পছন্দ করে না। আমাদের এখানকার মানুষ ঝামেলা পছন্দ করে না। সন্দের আগে তাই সবাই ফিরে আসে।

আমি - এমনি ঝামেলা হয়? মানে হয়েছে এরকম কখনো?

সফেরার আত্মীয়া - ঝামেলা হয়েছে বলতে হয়েছে ৯৮ সালে। বিয়ে হয়নি তখনো। ওই সময় ১৯৯৮ সালে হয়েছিল। তাছাড়া আর হয়নি।

আমি - এখানে মেয়েরা কাজ-কন্ম করে কিছু ঘরের কাজ ছাড়া?

সফেরা - এখানেও ঘরে ঘরে সবাই বিড়ি বাধে। মহিলারা নিজেদের রান্নাবান্না বাচ্চা-কাচ্চা সামলে যেটুকু পারে ওই বিড়ি। বসে থাকে না কেউ।

আমি - আপনার পুরো নাম কী? মানে এখন তো বেওয়া। আগে কি ছিল?

সফেরা - আগে ছিল শুধুই সফেরা। বিয়ের পর মোল্লা। এখন বেওয়া।

আমি - আচ্ছা।

(পাশ থেকে) চামেলি মণ্ডল - আমার নাম চামেলি মণ্ডল। আমার আব্বার বংশের যে নাম সেটাই রেখে দিয়েছি। আর শ্বশুরবাড়ীর টাইটেল ইসলাম।

আমি - আচ্ছা। বিয়ের সময় এখানে সিঁদুর পরে?

চামেলি - না। বিহারিদের মধ্যে হয় ওটা। আমাদের এখানে না। একদম না।

আমি - আপনার বাপের বাড়ী কোথায় ছিল

চামেলি - সুজাপুর।

আমি - এখানে বিয়ের পর মেয়েরা আলাদা কিছু পরে?

চামেলি - বিয়ের পর নাকেরটা পরে থাকতেই হয়। নাহলে লথারাপ লাগে। আর সবাই বলবে যে কেন পরেনি। থারাপ লাগে একটা।

আমি - এখানে কত বছর বয়সে বিয়ে হয় মেয়েদের?

চামেলি - ওই ১৫ ১৬। মাধ্যমিক পাশ করার পর বেশিরভাগের হয়ে যায়।

আমি - আচ্ছা এখানে কোনো বাদিয়া মুসলিম আছে ?

কদবানু - আমি খোটা আছি। বাদিয়াতে বিয়ে হয়েছে। ভাষা খুবই আলাদা।

আমি - আপনার নাম কী

কদবানু - আমার নাম কদবানু বিবি। বিয়ের আগে কদবানু খাতুন।

আমি - আচ্ছা। এটা কি আপনার মেয়ে? ও পড়াশুনা করছে?

কদবানু - পারলাম না পরাইহতে আর মেয়েটাকে। কে২ এর ফর্মটা ফিলাপ ভুল হয়েছে।

নাকি মাস্টারই নিয়ে নিয়েসে! ওর বাপকে বললাম একটু দেখো কী ভুল হইসে! তা খেটে খাওয়া মানুষ আর যায়নি।

• তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ

নাফিজা বেগম ।

আমি- আপনার কটা ছেলে?

নাফিজা - আমার ছেলি চারটি। বড়োটোর নাম নিয়ামত। মেজোটোর নাম কিয়ামত। তারপর মাহমত তারপর আলামত।

আমি - আপনার কতদিন বিয়ে হয়েছে?

নাফিজা - বিয়ের কথা বলতি পারি আমি! তা বলতে পারবু! আমার স্বামীও নেই। ২৮ বছর স্বামী নেই। তা বলতে পারি কবে হয়েছি! ন বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বোধহয়!

আমি - স্বামী কি করত?

নাফিজা - খেটেখুটে চলত। একটা চায়ের দোকান ছিল। ছেলি মানুষ করিসে তখন কষ্ট করি!

মাঠে ঘাটে খেটে ঘাস কেটি কষ্ট করি! কি করবি! এখন তো মেলা সুখ। এখন সব কিছু। পড়া লেখা ছেলিদের সব কিছু। আর তখন ভাত হয়নি। তখন স্বামীরাও কষ্ট করিছে, আমরাও কষ্ট করিচি। সময়ে ভাত হয়নি। খুদ খেয়ি গৌড়ি খেয়ি মাঠের তরকারি কাঁচা খুদ জবের আটা গুড়ো এইসব! খুবই কষ্ট গেছি তখন। শাক, যবের আটা খুমির করি গরম জলে করি

আমি - আপনারা কি জলই বলেন? না পানি বলেন?

নাফিজা - আমরা মুসলমান পানিই বলি। জল পানি একই।

আমি - আপনার বাড়ি কোথায়?

নাফিজা - রাজামির পাড়াতে বাড়ি।

আমি - আপনার মেয়ে নেই?

নাফিজা - হ্যাঁ তিনটি মেয়ে যি। একটা ওই দেখো। একটা মির পাড়ায়। একটা সাহাপুর পাড়ায়। ছেলি তখন হতো মেলা। সব আবার বাঁচতুও না। মরি জেত কত! তখন তো ওসব ওঠেনি কোনো কিছু! তখন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে মেলা হতু।

আমি - ছেলেরা সব একসঙ্গে আছে?

নাফিজা - না না। এই দেখো মেয়ের। ওই বাড়িটা আমাদের। খুব কষ্টটাইতে মানুষ করিচি। এখন ছেলেরা বাইরে যেতেই দেয় না। কিছু করতে দেয় না। খেতি দেয়। কিছুতো করতে পারবো না। কিছু চিনিনা তো। হারিয়ে যাব তো।

আমি - মায়ের বাড়ি যান না ?

নাফিজা - দুটো বোন আছে খালি। মাও নাই। ভাই ও নাই। দাঙ্গালে বাড়ী। জোয়ান ভাই আমার মরে গ্যাস। মানুষে মেরে দিস। ওই বান মেরে মেরে দিসে! কী করবু আর গিয়ে!

আমি - আপনি কোরান শরিফ পড়তে পারেন?

নাফিজা - না।

আমি - নামাজ পড়েন?

নাফিজা - হ্যাঁ নামাজ রোজাটা করি, করি না। ঠিক নাই। ঘর নাই বাড়ী নাই। কিছু ঠিক নাই গো। পরবু। কোথা কি করবু এইবার বলু। বুড়ি মানুষ হয়ে গিচি। এবার নামাজ টামাজ পরবু। এখন কিছুই পায়নি। সরকারের টাকাও না। কিছু পাইনি মা।

আমি - ওই বিধবা ভাতা পান?

নাফিজা - কিছুই নাই বলছি না। কিছুই পাইনা।

• উত্তর চব্বিশ পরগণা, বেড়াচাঁপা

আপনার নাম ?

মাফুজা খাতুন - বসার জায়গা টায়গা দিই। বসবে?

মাফুজা - তোমার বাড়ী কোথায়

আমি - আমার বাড়ি বারাসাতে।

মাফুজা - আমার নাম মাফুজা খাতুন।

আমি - এই বাড়িটা মনে হচ্ছে অনেক দিনের পুরনো।

মাফুজা - হ্যাঁ। ১০০ বছর তো হবেই। আমরা ছটা ফ্যামিলি থাকি এখানে। বিয়ের ২৭ বছর ধরে।

আমি - আপনি রোজা করেন?

মাফুজা - হ্যাঁ। রোজা নামাজ আমাদের ফরজ। পড়তেই হবে। তোমার নাম কি? তুমি মুসলিম? তুমি একা এসছো?

আমি - হ্যাঁ।

মাফুজা - তুমি কি কোনো প্রজেক্ট করছো?

আমি - হ্যাঁ মানে বলতে পারেন।

মাফুজা - খাওয়া দাওয়া করে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সুমন এসে ডাকল।

আমি - ওর নাম সুমনও?

মাফুজা - হ্যাঁ। ভালো নাম মহম্মদ মিরাদুল ইসলাম।

আমি - অনেক জায়গায় মুসলিমরা দুটো নাম রাখে না। আপনাদের তাহলে সেরকম নিয়ম তেমন নেই?

মাফুজা - ডাক নাম রাখে না। আমাদের এখানে সব ডাক নাম হয়ে গেছে সবার!

আমি - ডাক নাম কীরকম রাখেন?

মাফুজা - সুমন আর সুজন। দুটো ছেলে আমার।

আমি - আপনার ডাক নাম আছে?

মাফুজা - না আমার কোনো ডাক নাম নেই। ওর ওর বাপের ডাক নাম আছে। আমার নেই।

আমি - কী ?

মাফুজা - কালো বলে ডাকে। কালো। আমার ভাসুর রয়েছে, ভাসুরের ডাক্তার বলি ডাকে।

আমার সেজ দেওর আছে। ওর ভালো নাম আছে। আবার ডাক নামও ছিল।

আমি - এই মুরগিগুলো কাদের?

মাফুজা - ও আমাদের সবার। এ এখানে থাকে। আবার সিঁড়ির তলায়ও থাকে। তোমার আব্বা কি করে?

আমি - চাকরি করতো। এখন রিটায়ার করে গেছে।

মাফুজা - জায়গাটা কোথায়?

আমি - বেশ কিছু জায়গায় ছিল আর কী।

মাফুজা - কাজীপাড়ার যেখানে মেলা হয় ওখানে তো আমাদের বাড়ির মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

পালপাকুরিয়া তেও আছে আত্মীয় স্বজন। একটা ফুফু শাশুড়ির বাড়ী, একটা ননদের বাড়ী।

অনেক আছে। ওখানে অনেক আত্মীয় রয়েছে। আর যে জায়গাটা মেলা হয় ওই জায়গাটা

আমাদের একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে। একটা ছেলের বিয়ে হয়েছে।

তুমি একা ঘুরছো, তোমার ভয় করছে না?

আমি - না। ভয়ের কী আছে!

মাফুজা - কোথায় গেসলে সব?

আমি - আপনাদের এখানে সবাবারাতে কি হয়?

মাফুজা - ওই দিনটা সবাই এবাদাতে থাকে। আর রুটি টুটি এমনি সব করে। তার পরদিনটা যার ইচ্ছে হয় দোয়া টোয়া করে।

আমি - কবর জিয়ারত হয়?

মাফুজা - হ্যাঁ হ্যাঁ রাতে মিলাদ হবে। কবর জিয়ারত হয়। সারা গ্রামবাসী মিলে চাঁদা তুলে মিলাদটা করে। আর সবাই সারারাত জাগে ওই দিনটা। যে যেমন পারে আর কী।

আমি - আপনি কোরান পড়তে জানেন?

মাফুজা - হ্যাঁ। হ্যাঁ।

আমি -আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

মাফুজা -গফফার সাহেবের এলাকায়। নেহালপুরে সব পুরনো বাড়ী। আদি বড়োলোক এরা সব। আমার দাদাশ্বশুরের আমলে তৈরি। আর ধান্যকুরিয়াতে আছে ব্রিটিশ আমলের বাড়ী। হিন্দু বাড়ি সব। তখন এসব বাড়ির এতো কদর ছিল। এখানে শেখদের ইয়ে বেশি। আর কিছু কাজি ঘর আছে। তখন এদের এতো সম্মান করতো সব মানুষ। সামনে দিয়ে গেলে জুতো হাতে করে নিয়ে যেত। এতো সম্মান ছিল সব। এখনকার জমিদারবাড়ী গুলো সব বিশাল বিশাল। এখন সুডিং হয়। সুডিং হয় সব। সেরাম সুন্দর সব। দেখার মতো।

আমি - আচ্ছা। আর কে কে আছে এখানে?

মাফুজা - বড়ো জার দুটো ছেলে। তিনটে মেয়ে। মেজ জার চারটে ছেলে।

• উত্তর চব্বিশ পরগণা, বেড়াচাঁপা

আপনার নাম?

আমার নাম? আমার নাম রফিকা বিবি।

রফিকা - আর আপনার ?

আমি - হাসনুহেনা। আপনি এখানে থাকেন?

রফিকা - আমাদের সব পাশাপাশি বাড়ী। একানে সব আমরা খেয়েদেয়ে এসে গল্পগুজব করি সব একসঙ্গে বসে।

আমি - প্রতিদিনই গল্প করেন?

রফিকা - হ্যাঁ আমরা একেন বসে সব প্রতিদিনই গল্পগুজব করি। আর একটা চাচি রয়েছে ওই চাচির বাড়ী। ওই চাচির কাসেই আসি। চাচির বউমা আটা ইয়ে চেলতেসে শিলি ফেলে তাই চাচি ওকেন গেস। এখনো চলছে। এই আমার এটা ভাবি। আমার একটা মেয়ের কে বিক্রি করে দেছিল উত্তর প্রদেশে।

আমি - আপনার?

মাফুজা - হ্যাঁ।

আমি - কে দিয়েছিল?

রফিকা - কে দিয়েছিল এখন! কার দয়া হয়েছিল! তার বে শাদি হয়ে গেছে। ওখানেই থাকে।

তার ৫ টা বাচ্চা।

আমি - আপনি পরে খুঁজে পেয়েছিলেন মেয়েকে?

রফিকা - এগারো বছরের মাথায় ওই মেয়ে নিজি নিজি এয়েচেল।

আমি- চিনতে পেরেছিলেন?

রফিকা - মা আবার চিনতে পারে না। ১৫- ১৬ বছর বয়সে গেসে। ওই সে চাচী। ওই চাচীর কাছে আমরা আসি রোজ। ওই চাচীমার কাছ আসি। আমাদের বাড়িটা ওই স্কুল আসে না, ওই ইশকুলের পেছনে।

আমি - একটা মাদ্রাসাও দেখছি। মাদ্রাসায় এই গ্রাম থেকে কেউ পড়তে যায়?

রফিকা - হ্যাঁ। আমাদের গ্রাম থেকে সবাই যায়।

আমি - স্কুলে যায় না কেউ?

রফিকা - হ্যাঁ। স্কুল থেকে পাশ হয়ে গেলি মাদ্রাসায় যায়। ওটা হাই মাদ্রাসা। গ্রামের মদি গেরামের লোকজনই বেশি যায়। দূরে বেড়াচাপায় যেতি হলি বীণাপাণিতি যেতি হয় মেয়েদের। কী তাই তো? (পাশে থাকা অন্য এক প্রতিবেশীর দিকে তাকিয়ে)

আমি - আচ্ছা, আপনাদের ওখানে কোনো পীর আছে?

রফিকা ও অন্যান্যরা - হ্যাঁ। (সন্মিলিতভাবে) পীর গোরাচাঁদ আছে। ওদিকে পীর গোরাচাঁদের দরগা রয়েছে। বালসোয়ায় ওনার ওই ঔরস হয়। ফল্গুন মাসের ১২ তারিখি। আর একেনে বসেছিল বলে একেনে দরগাটা। তারপর পাশে মসজিদ রয়েছে। একেনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হয়।

আমি - আপনারা যান ?

রফিকা - না আমরা যাই নে। মেয়েছেলেরা বাড়ী।

আমি - না মানে দরগায় যান?

রফিকা - হ্যাঁ। মানত করতি যাই। যার যেখানে যেভাবে মানন করে সেভাবে আদায় করে।

আমি - আপনারা যা চান তাই ফলে যায়?

রফিকা- ভালো চাইলি ভালো হবে। ওনাদের দুয়ায় সব ভালো হয়। যা মানন থাকে।

আমি - আর আশেপাশে কোনো পির আছে?

রফিকা - হ্যাঁ বসিরহাটে আছে।

আমি - কী পির ? মানে নাম?

রফিকা- রুল আমীন পীরের মাজার আছে। ভাঙরেও একটা রয়েছে, কি যেন নাম। হাড়োয়ায় আছে। ঘুটিয়াশরীফে রয়ে। ওগুলো হচ্ছে ছুটছাট পীর।

আমি - এখানে তবলিগ হয় মসজিদে?

রফিকা - না এখানে তবলিগ হয় না। তবলিগ এখানে মানেনা। তবলিগ কেন মানেনা বলোতো ওরা আমাদের নবীরে মানেনা। যার জন্য এই সৃষ্টি তাকেই তারা মানেনা। ওইজন্য আমরা তবলিগকে মানিনে। বড় বড় তবলিগে কেয়াম পাঠ করে না।

আমি - আপনারা সবাই নামাজ পড়েন?

রফিকা - তা মুসলিম হলি পড়তি হবে তো।

আমি - পাঁচ ওয়াক্ত ?

রফিকা - যে যেরাম। হয়তো এক ওয়াক্ত পড়তি না পারলি কাজা পড়ে দেয়।

আমি - ইদের সময় নামাজ পড়েন?

রফিকা -ইদের সময় সবাই মসজিদে নামাজ পড়ে।

আমি - মেয়েরা পড়ে?

না মেয়েরা পড়ে না। একবার পড়েছিলুম। আমার বড় বু বড়ো জাগুলির, একবার ইদের নামাজের এ করেছিল। একবার পড়িছিলুম।

পুরুষ সদস্য - মেয়েদের নামাজ হয় না ঈদে (পাশ থেকে বাড়ির কোনো পুরুষ সদস্য)

রফিকা - ছেলেদের মেয়েদের প্রত্যেকের নামাজ হয়। মেয়েদের যদি নামাজ না হয় জামাত না হয় নামাজের তবে হজটা কী করে হয়! ছেলে মেয়ে সবার জামাত হয়। হজটা তো লাখ লাখ মানুষ থাকে। আমাদের এদিকে মেয়েদের জামাত করায় না তাই। মেয়েদের ইদের দু রাকাত নামাজ মেয়েরা বাড়িতে পড়ে। বাড়িতে হয়। ছেলেরা যে নিয়ত করছে সাইটি মেয়েয়া সেই নিয়ত করছে। তালি হবে না কেন।

আমি - আপনাদের এখানে কিরকম বয়সে বিয়ে হয় মেয়েদের?

রফিকা - ওই ১৮ ১৯। নিয়ম নেই কোনো। যার যেমন হয়। কারোর একটু বেশিতেও হয়।

আমি - মেয়েরা কি এখানে বেশি মাদ্রাসাতেই পড়ে?

রফিকা -হ্যাঁ ওই ইশকুলেও যায় কেউ কেউ কচিকদা। বীণাপাণি বা আশেপাশে যে কয়েকটা রয়েছে। তবে মেয়েরা বেশি মাদ্রাসাতেই যায়।

- উত্তর চব্বিশ পরগণা, দেগঙ্গা

আমি - আপনার নাম?

সাকিলা - সাকিলা।

আমি - বিবি?

সাকিলা - হ্যাঁ সাকিলা বিবি। স্বামীর হাঁটু অপারেশন হয়েছে। এখনো সুস্থ হয় নি। এই পানি গরম করে রেখেছি। গা ধুয়ে দেব। এই তিন মাস ধুয়ে দিই।

সাকিলা - কোথায় তোমাদের বাড়ি কচি ?

আমি - বারাসাত। আপনার বাপের বাড়ি কথায়?

সাকিলা - এই দেখো আজ আমি ডাটা-আলু চচ্চড়ি আর পেপসিঝাল টমেটো দিয়ে চ্যাং মাছ করছি।

আমি - পেপসি ঝাল কি?

সাকিলা- ক্যান্সিকাম। আমাদের বাড়িতে চ্যাং মাছ কেউ খেতি চায় না। আমার

ছেলে কাটা কাপড়ের কাজ করে। ছেলে বড়ো মেয়ে ছোটো। ছেলের বয়স ২৪। এই আমার বৌমা। বৌমার সঙ্গে কথা বল।

আমি - তোমার নাম কি?

মনোয়ারা।

আমি- তোমাকে দেখে খুব কমবয়সী মনে হচ্ছে।

মানোয়ার- মানোয়ারা - আমার বয়স ২০।

আমি- কদিন আছো শ্বশুরবাড়িতে?

মানোয়ারা- এই ৬ মাস। ছ মাস বিয়ে হয়েছে।

আমি - আচ্ছা। কেমন লাগছে?

মানোয়ারা - বিয়ের আগে স্কুল লাইফ একটা আলাদা ইয়ে। এখানে এখন থাকি। এটাও খারাপ না।

আমি - এই বাড়িটা তো তোমাদের?

শাশুড়ি- ১৩ শতক জায়গার উপর আমরা দুই জা থাকি। আমাদের কোনো জমি জায়গা নেই। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে পনেরো বয়সে।

আমি - এতো কম বয়সে বিয়ে?

শাশুড়ি- সে বিয়ে দেব না। একরকম জোর করেই হয়ে গেছে। দেখতে এসছিল। তা ওদের পছন্দ। খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ছেলে খুব ভালো। তা দিয়ে দিলাম। সে বিয়ে তো দিতেই হবে আজ না হোক চার বছর পর। তা মেয়ে খুব সুখী। দোতলা বাড়ী, মোটরের পানি। ওদের ব্যবসা আছে। এই তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। মেয়ের পেটে বাচ্চা। ওদের দোকান আছে। নিজস্ব গাড়ি আছে। ইটের ব্যবসা। কোন অসুবিধে নেই। কোনো অসুবিধে নেই আল্লাহর রহমে। একটু খাটতি হয়। ওত ব্যবসা বাণিজ্য থাকলি তো খাটতি হবে। জামাইরা সব ইটের ব্যবসা করে। ওদের নিজস্ব গাড়ী আছে।

আমি - মেয়ের শ্বশুরবাড়ীটা কোথায়?

শাশুড়ি- এই খামারহাটি। মেয়ে খুব ভালো পড়েছে। শ্বশুর শাশুড়ি ভালো, ফ্যামিলি ভালো, হ্যাঁ। জামাইরা ৪টে ভাই আর ৩টে বোন। তা আমার বেই বিন হেভি ভালো। তিন বছর বিয়ে হয়ে গেছে তা আমার বেইর বোধহয় কুড়িবার আসা হয়ে গেছে।

• মুর্শিদাবাদ, সালার

আমি - আপনার নাম কী

জরিনা - জরিনা বিবি।

আমি - এইটাই আপনার বাড়ি?

জরিনা - না মেয়ের বাড়ি এটা। মেয়ের বাড়িতে থাকি।

আমি - আর আপনার বাড়ি?

জরিনা - এইটাই থাকি। মেয়ের কাছেই থাকি।

আমি - ছেলেরা আছে?

জরিনা - আছে। বাড়িতে। ও পাড়া। এইতো কলিযুগ দেখছো। ভাত দেয় না। দেখে না।

মেয়ের বিয়ে দিইচি যদি তদ্দিন এইটাই থাকি। ছেলে দেখে না।

আমি - আপনি কতদিন বিধবা হয়েছেন?

জরিনা - আমি বিধবা হইছি ৩০ এই না ৩৫ বছর হল। আমার মেয়ে তখন ডেড় বছরকার ছেলে তখন। আজ বিধবা হইনি।

আমি - তারপর কী করলেন?

জরিনা - তখন ছেলেমেয়েরা ছোটো ছোটো। লোকের বাড়িই কাজ কাম করেই কেটেছে। খুব কষ্টে কেটেছে গো।

আমি - আপনার বাপের বাড়ি কোথায়

জরিনা - আমার মায়ের বাড়ি এখানেই তো। আমার ছেলে আমার সঙ্গে দেখাই করতে আসে না। আমার খাওয়া দাওয়া পরনের পিন্ধের কাপড় সবই মেয়ে জামাই। এক নয়া পয়সা ছেলি দেয় না।

আমি- ছেলে কী করে ?

জরিনা - ছেলে ওই ব্যবসা বাণিজ্য করে...

আমি - জামাই কি করে ?

জরিনা - জামাই এই দেখো টাটাসুমো চালায়।

আমি - এটা কি আপনার নাতি ?

জরিনা - হ্যাঁ।

আমি - স্কুলে যায়?

জরিনা- নাহ। সিক্স অবধি পড়েছে। তারপর কাজকাম করে। রাজমিস্ত্রির কাজ করে।

আমি - আর পড়লো না কেন?

জরিনা - গরিবের সংসার। অতো পড়ে কী পেট চলবে? একটা খাড়া আর গলায় অতগুলি গলায় পড়া তাহলে এখন ... কী করে চলবি সেটাতো দেখতে হবি!

(পাশ থেকে মেয়ে)- আমার হেঁটা ছেলিমেয়ে। দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলি। গরিবের সংসার! একজনের খাটুনিতে চলবে বলো। মাকে ঝেড়ি ফেলি দিসে ছেলি! ভাত দেওয়ার ভয়ে মুখি রা কাড়ে না। মেলাই ভালো মন্দ আনে তা কোই দিবে না কখনো! মায়ের বেলায় তখন অসুবিধে ধরে যায়। আমার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না। মরগা বলি না কিছু না।

জরিনা - আমার ১৪ বছরে বিয়ে হইছিল। আমি বড়ো ঘরের বউ ছিলাম। আমার শাশুড়ি খুব ভালোবাসতো। জন্মাদ ছিল না। স্বামীও জন্মাদ ছিল না। আমার শাশুড়ি আমাকে বাপের বাড়ি থুতই না। বলতো আমার বাড়ি ফাঁকা লাগে। আমার খুব ধুমধামে বিয়ে হইছিল। গোটা তালিবপুর গাঁ জানিয়ে, বাজনা বাজিয়ে। ঘোড়াতে করে বিয়ে হইছিল। আর ডুলিতে করে মায়ের বাড়ি যেতাম।

আমি - এখানে সব মাসে বিয়ে হয়?

জরিনা - হ্যাঁ আমাদের মুসলমানে সব মাসে বিয়ে হয়। আষাঢ় শ্রাবণ সবই হয়।

আমি - পৌষ মাসে হয়?

জরিনা - হ্যাঁ সব মাসে হয়।

আমি - রোজা করেন?

জরিনা - হ্যাঁ। সবগুলোই করি

আমি - ইফতারে কী খান?

জরিনা - যা ভাঙরে কাঙ্গালের ভাঙরে যা থাকে তাই খেতে হবে। তাই খাই যা থাকে। কোনোদিন ফল পাকড় হয় , হয়তো কোনোদিন মিষ্টি পরোটা হয় কোনোদিন মুড়ি চপ হয়।

কোনদিন গোস হয়। কেউ বলে কোফতা খাব গোলগোল। হামানদিস্তায় পিসে কখনো টিকিয়া
করি। সবই করি। যখন যেমন।

আমি - মারা গেলে আপনাদের এখানে কী হয়?

জরিণা - মারা গেলে কী হয় আর কী বলবু! গোসল করায় তারপর ভালো কাপড় চোপড়
পিন্ধি ঢেকে ঢুকি দেয়।

নাম - আশ্বিয়া বিবি

বয়স - আনুমানিক ৩২

পেশা - কাম সেলাই, এছাড়া মাঠে কাজ করে, গৃহের কাজ করে।

ঠিকানা - বেঁড়াচাপা

তারিখ - ১০.০২.২০১৬

আশ্বিয়া - এই চিয়ারটা লেসো [কাউকে উদ্দেশ্য করে বললেন]

আমি - না এখানেই ঠিক আছে। আপনি বসুন।

আশ্বিয়া - বসতি হবে তো, আমি বসপোলা।

আমি - এটা কি কাঁথা সেলাই হচ্ছে? [পাশে কেউ কাজ করছিলেন]

আশ্বিয়া - না না এটা কামের কাজ। আড়ির কাজ ও হয়। কাম ও আড়ির কাজ

আলাদা।

আমি - আচ্ছা, তোমার বাপের বাড়ি কোথায়?

আমিয়া - পশ্চিম ভায়তায় ।

আমি - সেটা কোথায় ?

আমিয়া - বোলঘাটার দিকি ।

আমি - কত বছর বিয়ে হয়েছে তোমার ।

আঃ- ৭,৮ বছর হইসে । প্রথম বাচ্চার বয়স ৭ ।

হাঃ- আপনিও পারেন এই কামের কাজ ?

আঃ- হ্যা করিতো । সন্দেরবেলা, বিকেল বেলার দিকে বসি ।

হাঃ- এই কাজটা আগেই পারতে, না এখানে এসে শিখেছো ?

আঃ- আগে পারতুম না, একেনে এসে শিকিচি ।

হাঃ- বাড়িতে কে কে থাকে তোমাদের ?

আঃ- চারি জা, শ্বশুর, শাউরি ।

হাঃ- আর সবাই কোথায় ?

আঃ- তারা একন সব মিটিন করতেসে । সব একসঙ্গে গল্পগুজব করে । সেই

মগরিবের আজান দেওয়ার কিছুকন আগে উঠে আসপে । বসে বসে ওকানায়

কেউ কেউ কাম সেলাই ও করে ।

হাঃ- এখানে কি সবাই মুসলমান ?

আঃ- হ্যাঁ একেনে সবই মুসলমান ।

হাঃ- আচ্ছা সকাল থেকে উঠে কি কি করো তুমি ?

আঃ- সকালে উঠে সংসারের কাজ করি । করা টরার পর একটু বসি । না হলে স্বামী

বাড়ি এলে স্বামীর খেদমত করি । স্বামীর ভাত দেই, পানি দেই । হাওয়া

বাতাস করি । এই আর কি ।

হাঃ- তাই । তুমি এটা বিশ্বাস কর স্বামীর পায়ের তলায় বেহেশ্ত ?

আঃ- হ্যাঁ তা এটা তো সগলেরি করতি হয় বিশ্বাস । আল্লাপাক বলেচে যকন । তরে

কম বেশি কথা রাগের চোটে বলি, এটা সত্যি কতা । স্বামী যেমোন দুষ্টমি

করে, আমরাও তেমোন । এগুলো আমাদের গোনা অবশশই । তা মাথা গরম,

রক্ত পাতলা রাগের চোটে বলে ফেলি । ওরাও তো বলে । মাথা ঠিক থাকে

না তকন ।

আমি - নামাজ পড়তে পারো ?

আম্বিয়া - না ওড়া প্রতি পারি নে ।

আমি - আর কোরান ?

আম্বিয়া এটু এটু জানি । না জানার মতনই ।

আমি - তোমাদের এখানে পীর গোরাচাঁদের মাজার আছে না? যাও ?

আম্বিয়া - হ্যাঁ যাইতো । মানোত করি ।

আমি - কোন উপকার পেয়েছো?

আম্বিয়া – হ্যাঁ হয়েছে । যেমোন আমার ওই বড় ছেলেটা হলি বিশাল অসুস্থ । এবারে

সব ডাক্তার করা হয়, সব রকম করা হয় । শ্বশুর শাশুড়ি আমার আব্বা

মা আমি পাশের ননদ ননদাই সবাই দ্যাকে, ছেলেটা বিশাল অসুস্থ হয়ে

যায় । মাথা একরকম, শরীল একরকম, অনপুরুষ্ট বাচ্চা হয়েসেল । ৯

মাসে হোসেলোতো তা আমার শ্বশুর শাশুড়ি থেকে, আব্বা মা থেকে

সবাই নিয়ে গেসেলো । লিয়ে যাবার পরে মানন করা হয় । মানসিক

মানা হয়েসেল । [পাশে বাচ্চারা খুব কথা বলছিল তাদের উদ্দেশ্যে

আম্বিয়া বললো- বাবা একটা কথা বলদিস তা বাজার বসাচ্ছে ।]

আমি – মানসিক মানে ?

আম্বিয়া – মানসিক মানে যেমন আমি ছোটো করে বলি, এক কেজি চাল রান্না করে

সুজির ক্ষীর রান্না করে ওই খানে ৫টা বাচ্চার দোব । এরকম আমার বড়

ছেলের সময় আমি মোরগ মেনিছিলুম । চাল মেনেসেলো – এগুলো

আমার শ্বশুর শাশুড়ি মেনেসেলো । আমার স্বামী – স্ত্রী খাসি মেনিছিলুম ।

সেই খাসি ওখানে জবাই করে ওখানকার ফকির মিসকিন খাইয়ে

এসিছিলুম । তাই থেকে আমার ছেলে ক্রমে সুস্থ হইতেই থাকে । তেল-

পানিও মেনেচি । এখন ঠিকঠাক । এমন কেউ বলিনিযে এই ছেলেটা

আমার বাঁচবে । এমন কোনো মানুষ বলেনি । এখন সগলেই যাই পীর

গোরাচাঁদের কাছে ।

আমি – জামাতি ইসলাম করো তোমরা ?

আম্বিয়া – না না আমরা ওসব মানিনে । ওটা আমরা কিরকম জানিইনে । ওর

সম্বন্ধে আমরা কিছুই বুঝিনে । আমরা মুসলমান মুসলমান । জামাতি না

তবলিগ না আর একটা কি যেন বলে, ওসব আমরা বুঝিনে ।

আমি – তোমাদেরকে বোঝাতে আসে না ওরা ?

আম্বিয়া – বোঝাতি আসে । আমরা বুঝ মানিনে ।

আমি – শবেবরাতের সময় কি করো তোমরা ?

আম্বিয়া – বাজি টাজি ফাটায় । বাচ্চারা যেমন করে আর কী । এছাড়া নামাজ হয়,

কবর জিয়ারত হয়, জেকের মজলিশ হয় মসজিদি সবই হয় ।

আমি – বাপের বাড়ি যাও ?

আম্বিয়া – না অনেকদিন হয়ে গেসে যাই নে ।

আমি – কে কে আছে ওখানে ?

আম্বিয়া – আব্বা মা রয়েসে, ভাই ভাবি রয়েসে । পতম পতম যাওয়া হতো ঘনঘন ।

এখন আর ছেলে পিলে লিয়ে যাওয়া হয় না ।

আমি – ঈদের দিনে কি করো ?

আম্বিয়া – ঈদের দিনি সবাই আনন্দ করে । মসজিদি নামাজ টামাজ পড়ে । যার

বাড়িতি যেরাম জোগাড় সেরাম কিছু সিমুই টিমুই হয় । এই আর কি ।

আমি - তোমরা, ময়েরা ঈদে নামাজ পড়ো ?

আমিয়া - না । আমার আমরা আর পড়ি নে । ছেলেরা মসজিদি গে পড়ে ।

নাম - নাজমা বিবি

বয়স - ৪০

ঠিকানা - দ্যোঙ্গা

পেশা - গৃহবদ্ধ

তারিখ - ২.০৮.২০১৬

আমি - একটু কথা বলা যাবে ?

নাজমা - হ্যাঁ কেন যাবেনা । আসুন,বসুন । (পরিচয় ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপনের পর)

আমি - সকাল থেকে উঠে কি কি করেন ?

নাজমা - কি কি করি , বলি তাহলে । সকালে উঠলুম । সকালে উঠে প্রথম কাজ

হচ্ছে উঠোন ঝাঁট দেওয়া । তার পরে কাজ হচ্ছে ঘর । ঘর ঝাঁট দেওয়া ।

তারপরে চা খাওয়া । চা খাওয়ার পর থালা বাসন মাজা । তার পরে

তোমার এবার মশলা তরি-তরকারি গোছানো । ওগুলো গুচিয়ে কোনোদিন

গোসল করে আসি, কোনোদিন আসিনে । রোজ যে আসি তার কোনো

ঠিক নেই । গোসল করে এসে রান্নায় বসি । রান্না টান্না করে নামাজ পড়ি ।

আমি – নামাজ পড়েন প্রতিদিন ?

নাজমা – হ্যাঁ নামাজ পড়ি । নামাজটা কাজা না করার চেষ্টাই করি । নামাজ পড়ে

খেয়ে দেয়েএবারে একটু রেস্ট । এইবারে এতক্ষণে একটু রেস্ট হবে ।

এবেরে আসরের আজান দেবে । তখন আবার নামাজ পড়া হবে । নামাজ

পরে এবেরে টাইমকলে পানি আসে । খাওয়া পানি আসে । তারপর

মগরেবের নামাজ । পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ।

আমি – আচ্ছা । আপনার নামটাই জানা হয়নি ।

নাজমা – আমার নাম রানি । ভালো নাম নাজমা বিবি ১৫ বছর বিয়ে হয়েছে ।

বাপের বাড়ি হচ্ছে ভাংড় থানা আমার ১৬ আপ বছরে বিয়ে হয়েছে ।

আমার মেয়ে এবার মাধ্যমিক দেবে । ছেলে ফাইপ উঠবে । আমার স্বামী

সাইকেল এর দোকান । আগে পতম পতম সত্যি কি আমি এখানে ১

মাস থকতাম না । বাপের বাড়ি যেতুম ওখানে গিয়ে ১৫ দিন ১ মাস করে

থাকতুম । আমার ৫ বোন, ২ ভাই । শ্বশুরবাড়ি এরা চারি ভাই দুই বুন ।

আমি যখন এসেছি একটা বুনীর বিয়ে হয়ে গেছে । আর এরা ২ ভাই ।

আমি মেজ বৌ । বড় ভাইর বিয়ে হয়েছে । বড় ভাইর তখন দুটো ছেলে

মেয়ে । একটা ছেলে , একটা মেয়ে । তার পরে আমি । আমার বিয়ের

পরে আমার ছোটো ননদের বিয়ে হয় । ছোটো ননদরা একেনে অনেকদিন

ছিলো । এখনো একটা দেওর আছে ছোটো ।

আমি – এই গ্রামটার নাম কি ?

নাজমা – গোঁসাই পুর এটা ।

আমি – এখানে হিন্দু বেশি না মুসলমান বেশি ?

নাজমা – এখানে হিন্দু মুসলমান দুটোই সমান আছে । এরপর কাহার পাড়া । হিন্দু

শুধু । দেখা যাচ্ছে পাঁচিলে ওপারে শুধু হিন্দু । তারপর আবার মুসলিম ।

ওটা পারুলিয়া

আমি – আপনার বিয়ে এখানে কীভাবে হল?

নাজমা – আমাদের বিয়ে, আগে থেকে দেখা শোনাও ছিল, বাড়ির থেকেও হয়েছে ।

দুটোই হয়েছে ।

আমি – শ্বশুর শাশুড়ি আছেন?

নাজমা – শ্বশুর শাশুড়ি সব আছে । আমার শাশুড়ি ভালো ঝামেলা হয় না । শ্বশুরটা

একটু রসকষহীন । প্রচন্ড মেজাজী । দাপট আছে ।

আমি – আপনি তো বললেন নামাজ পড়েন । রোজা করেন?

নামাজ – হ্যাঁ রোজা করি সব ।

আমি – এখানে সবাই নামাজ রোজা করে?

নামাজ – হুঁ । এখানে সবাই কম বেশি নামাজ রোজা পড়ে । তবে আমার শাশুড়ি প্রায়

একেবারেই পড়ে না বললে চলে। তবে আমার শ্বশুর মসজিদে যায়। পড়ে।

আমি – প্রথম থেকেই এখানে বাড়ি ছিল আপনাদের?

নামাজ – আমাদের পুরাতন বাড়ি ছিল রাস্তার ওই সাইডটায়। ওটা আমাদের দাদা

শ্বশুরের বাড়ি ছিল। ওখানে ভাসুরের বিয়ে হয়।

আমি – আপনাদের কোনো আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশে?

নাজমা – নাহ আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজন নেই বাংলাদেশে। তবে শ্বশুরের চাস্তো

ভাইয়েরা বাংলাদেশে থাকে। সব ছোটোবেলায় বাংলাদেশে চলে গেছে। মানে

অদের চাচাচাচী ছোটোবেলায় নিয়ে গেছে।

আমি – আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

নাজমা – সাইহাটি আমার বাপের বাড়ি। এখান থেকে ২৭ কিলোমিটার। তবে

ট্রেকার আর আটো সবসময় পাওয়া যায়। একদম আটোমেটিক। কিছু

আসুবিধা নেই যাওয়ার।

আমি – তোমাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা তার বাবার বড় ভাই বা ছোটো ভাইদের কী

বলে ডাকে?

নাজমা – বড় চাচা মেজ চাচা, বড় আক্বা মেজ আক্বা যে যে রকম শেখায় তাই

বলে দাকে। আমার মেয়ে যেমন বলে বড় বাপি মেজ বাপি, বড় আম্মি

মেজ আম্মি। আবার মেজ জায়ের ছেলেরা বড় আক্বা বলে ভাসুরকে।

কোনো ঠিক নেই।

আমি – এখানে মেয়েরা কিছু করে? কোনো কাজ টাঁজ?

নামাজ – এদিকে সবাই কাম করে, কেথা করে। হাঁস মুরগী সব পোষে মেয়েরা। গরু

ছাগল সবই আছে।

আমি – আমি নিজে কিছু করেন?

নাজমা – না আমি নিজে খুব অসুস্থ। ওসব পারি না। তোমায় তাহলে বলি। আমার

দোকান দ্যাখে বিয়ে দেচে। ঠিক আসে। আমার যখন বিয়ে হয় আমার

আব্বারা ভেবেছে বিশাল কিছু এদের একটা আছে। বিয়ে দেবার পর

দেখছে নামে তালপুকুর। ঘটি ডুবজেনা। দোকান দেখে বিয়ে দিলি ওই

দোকান মালিক যে প্রত্যেকদিন দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে শোবো আর এসে

বলবে – দাদা আমার কিছু টাকা দাও। দাদা আমার কিছু টাকা দাও। তা

আমি জিগেস করতাম ও লোকটা প্রত্যেকদিন আসে কেন। কে ও

লোকটা। তা বলচে আমার ঘর – মালিক। প্রত্যেকদিন ঘর মালিক টাকা

চাইতে আসে কেন। বলচে দাদা বলে ডাকিতো। ও ওসব কিছু মনে

করেনা। আর তা মাসের ভাড়া। মাসের ভাড়া মাসে দিই। এমনি দেই ওটা

কিছু মনে করি নে। প্রায় দিন আসে। হঠাৎ একদিন আমার শাশুড়ি বলচে

দোকান নিয়ে কত ঝামেলা হচ্ছে। ঝামেলাটা কি। ছেলেরা বলচে আমার

দোকান দেব না। আর বাপ বলচে আমি দেবো। বাপ বলচে আমি দোকান
দেব। আর ছেলেরা বলচে আমরা ওদের দোকান দোব না। বাপ বলচে
ওদের যে দোকানটা দোওয়া হবে না তার তো একটা কোনো অজুহাত
দেখাতি হবে। কারণ বার ক্রতি হবে তো। এই কারণে ওদের দোকান
দেওয়া হবে না। আমি তো ওদের কোনো কারণ পাইনি। এই নিয়ে তখন
ছিল মার্কেটে মাটির দোকান। এবং সেই দোকানটা প্রথম। এবার সব বসে
আলোচনা করে বলা হল ওই দোকানটা ফাঁকা করা হবে। দোকানটা ফাঁকা
করতি গেছে। এতটা যত গাঁথা হয়েছে। ওরা লোক ফিট করে সেই দোকান
পুরো ভাঙলো। তারপর থেকে আবার ওই দোকান করা হয়েছে।

নাম – মাহবুবা বেগম

বয়স – ৩৮

পেশা – গৃহ বধূ

ঠিকানা –

তারিখ – ১০/৯/২০১৭

মাহবুবা – কি নাম?

আমি – হাসুনহেনা

মাহবুবা – বাহ ভালো সুন্দর। আনকমন নাম তো বেশ। আকসু কি করেন?

আমি - চাকরি করতো। রিটায়ার করে গেছেন। আপনার নাম

মাহবুবা - আমার নাম মাহবুবা বেগম।

আমি - এটা কি হাতে সেলাই? [গায়ে চাদর উদ্দেশ্য করে]

মাহবুবা - হ্যাঁ আমার বোন করেছে। উত্তর দিনাজপুরে এগুলো বেশি হয়।

আমি - আচ্ছা আপনার বাড়ি কোথায়?

মাহবুবা - বাংলাদেশে। এখানে আমার বিয়ে হয়েছে।

আমি - কত বছর বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

মাহবুবা - ২০০৩ সালে। ছেলের বয়স ১২ বছর।

আমি - বাড়ি দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরোনো দিনের।

মাহবুবা - হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি গ্রামটা বেশ পুরোনো বর্ধিষুক্ত গ্রাম। আর আমার

শ্বশুররা এখানে বেশ প্রতিষ্ঠিত ও নামকরা। শেখদের প্রিবার। আপনি

হয়তো জানবেন। ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা সেটা হল এখানে ইরান থেকে

পূর্বপুরুষা ধর্মপ্রচারের জন্য আসে তারপর এখানীসে পীর গোরাচাঁদ বাবা

যেটা বলে - হাড়োয়াতে জার সমাধি আছে। পীর গোরাচাঁদ, একদিন শাহ

যার আছে তাদের থেকেই আমাদের আর কি চলে এসেছে।

আমি - তার মানে আপনি বলছেন, যে আপনার ইরান থেকে এসেছেন?

মাহবুবা ও তার স্বামী - হ্যাঁ ইতিহাস তো তাই ব্লছে। আমাদের দাদীর তরফে আমরা

ওদের বংশীর। দাদার দিবে নয়। এখানে বিলং করছি আমরা দাদীর বংশীর।

আর দাদীর আব্বার কিংবা তার আব্বার মেইনলি ইরান থেকে এসেছিল।

মূলত দুই ভাই ওরা এসেছিল। বোগদাদ থেকে। বাগদাদ আর কি। বোগদাদ

কি বলা হত তখন। দুই ভাই ওরা দু জায়গাতে শিফট করে যায়। একটা

হাড়ায়া কেন্দ্রিক নদীর ধারে। বিদ্যাধরীর এটা বনবিবি টির এর সাথে

একরে।

আমি – মানে ? বনবিবির কথাটা ঠিক বুঝলাম না ।

মাহবুবা – বনদেবতা, বনের যে দেবী হয়, এখানেও আমাদের বনবিবি টির থান

আছে, উনি আসতেন এসব অঞ্চলে । পীর গোরাচাঁদের সঙ্গেই ওনার

রিলেশন । দুজনে কো – রিলেটেড একদম । আর পীর গোরাচাঁদের যে

আরেকটা ভাই ছিল, তারই উম্মত হিসেবে আমরা এখানে । তারপর

থেকে আমাদের এই বেশ ৭-৮ পুরুষের অনেক আগের কথা এখনও

আমরা সেই ইতিহাস বহুগুলো পাই, মুজিবর রহমান বলে একজন

আই.এ.এস ছিলেন । প্রথম আই.এ.এস যে আমাদের কাস্ট এর ।

তখনতো অনেক আগের ৬৩/৬২ ওই সময়কার কিছু বই আমরা পাই ।

আমি – এখন আছে আপনার কাছে ?

মাহবুবা – না আমাদের কাছে এখন নেই । আরেকজনের কাছে কালেকশনটা আছে ।

ও আসলে এখানে থাকে না । পার্ক স্ট্রীট ওরিয়েন্টেড জায়গায় থাকে ।

ওদের কাছে বই টাই গুলো এখনো আছে । ওদের থেকেই আমরা

আমাদের পুরনো ইতিহাস গুলো জানতে পারি । তারপর জেনেছি, শুনেছি

ওটাই আর কি । ইরানের ফ্যাসিলি, বোগদাদের ফ্যাসিলি তো এটাই । তারপর থেকে চলছে ।

ম্যাক্সিমাম এখানে আপনার পুরনো কড়ি বর্গার বিল্ডিংগুলো দেখতে পাবেন । আগেকার

যুগের যে লার্টিয়াল বাহিনী ছিল, সর্দার টাইটেল যারা, ওরা ও পাড়াতে আছে । ওরা আমাদের

আগে রক্ষণাবেক্ষণ করতো । কিন্তু ফিনানসিয়াল বলুন বা অন্য যা কিছু ইকনমিক ক্লাস চেঞ্জ

হওয়ার পর শেখদের সাথে অদের যে ডিফারেন্স ছিল সেটা অনেকটা মুছে গেছে । আগে

আত্মীয়তা হতো না, এখন আত্মীয়তাও হয় মানে আর কি বলতে গেলো কিন্তু ক্লাসের মধ্যে

এখনও সেটা বিলিং করে ,রক্তের মধ্যে সেই ধারা তো বইবেই । আমাদের আর ওদের মধ্যে

একটা পার্থক্য তো আছেই ।

আমি - আপনি কি করেন ।

মাহবুবা - আমি হাউস ওয়াইফ

আমি- আপনার স্বামী কি করেন?

মাহবুবা - উনি একটা এম এন সি তে চাকরী করে । ও প্রথমে বাংলাদেশ ছিল । ওর কিছু

রিলেটিভস আছে ওখানে । চাচার, ফুফুরা ওখানেই ওর সাথে আমার আলাপ ।

আমি - আপনি নামাজ রোজা পড়েন ।

মাহবুবা - নামাজ রোজা তো পড়তেই হয়। অবশ্যই। তবে সবসময় হয়ে ওঠে না। মেয়েদের শরীরের ওপর নির্ভর করে, সব রোজা হয়না। পরে সেগুলো করে দিতে হয়। আর কোরান চর্চাও সবসময় হয়না। কেউ মারা গেলে তখন হয়।

আমি - আপনি তো বাংলাদেশের মেয়ে। ভারতের বউ। দু'টো দেশের মধ্যে আমি আলাদা কিছু দেখি না। সবাই এক। আমাদের ওখানে হিন্দু মুসলমান একভাবে বড় হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ছোট জাত, বড় জাত এটা আমরা দেখি নাই। এদের বাড়িতে সেটা একটু আছে দেখছি। বাংলাদেশেও সৈয়দ, আশ্বেদ, চৌধুরী কাজী সবই আসে। কিন্তু এরম ছোটো বড় নাই। বরঞ্চ আমার আরো মনে হয়, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কি বলবো বলতো আমরা এখানেই বেশি ফ্রি। আমরা বাংলাদেশে এতো ফ্রিভাবে ঘুরিনা। আমি যেরকম ফ্রি থাকি, আমার বাপের বাড়ির বউরা সেরকম থাকে না। আমি চুল কাটি, মাথা ঢাকা দিই না, বেড়াতে যাই। এ জিনিসগুলো আমাদের ওখানে এতটা ফ্রি নাই।

নাম - নাহাবুনুসা

বয়স - ৫৬

পেশা - গৃহবধূ

তারিখ - ২০.০৮.২০১৮

আমি - আপনার নাম কি ?

নাহাবুনুসা - আমার নাম নাহাবুনুসা

আমি - কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে আপনার?

নাহাবুন্নেসা - তখন তো ছোটো বয়সেই হতো। ১৫-১৬ বছর হবে। বিয়ে হয়েছে প্রায় ৩২ বছর। বড় ছেলের বয়সই তো ৩০ হতে চলেছে। ছোটো ছেলের ২৪ প্লাস হবে।

আমি - বড় ছেলে কি করে?

নাহাবুন্নেসার - কাটিং এর কাজ করে।

আমি - ছোটো ছেলে?

নাহাবুন্নেসা - ও ও একই কাজ করছে। এখন জুনিয়র আরকি। শিখছে।

আমি - আপনার বাপের বাড়ি?

নাহাবুন্নেসা - আমার বাপের বাড়ি বড় জাগুলিয়ায়।

আমি - আপনারা কয় ভাইবোন ছিলেন?

নাহাবুন্নেসা - আমরা পাঁচ ভাইবোন। দুই ভাই। আব্বামা মারা গিয়েছে।

আমি - বাপের বাড়ি যান?

নাহাবুন্নেসা - যাই তবে খুব কম। বিপদে আপদে পড়লে, খবর দিলে যেতে হয়। বাবা মা না থাকলে যা হয়। বাবা মা না থাকলে তো সেই যত্ন আত্মীয়তা তো হয় না।

আমি - আপনাদের অরিজিনাল বাড়ি, মানে শ্বশুরবাড়ি কি প্রথম থেকেই এখানে? অনেক পুরুষ ধরে এখানে না, আগে কোথায় কোথাও ছিল?

নাহাবুন্নেসা - না। এখানে মানে মসজিদের ওদিকে গিয়েছে? ওই তো সামনেই মসজিদ। ওখানে আমাদের পুরোনো বাড়ি ছিল আর কি। এখন এখানে উঠে এসেছি।

আমি - বাংলাদেশে আত্মীয়স্বজন আছে?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ। আমার নানার বাড়ি বাংলাদেশে।

আমি - তার মানে আপনার মায়ের বাড়িটা হল বাংলাদেশে?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ।

আমি - মানে আব্বার বাড়ির সঙ্গে কোনো লিঙ্ক নেই।

নাহাবুন্নেসা- প্রথম রাইটের সময় মা তখন ছোটো। ১২-১৩ বছর বয়স। তখন প্রথম রাইট হয় না কি, শুনেছি যেতা, সেইসময় চলে গিয়েছিলো। কাঁচড়াপাড়ায় থাকতো।

আমি - মানে কাঁচড়াপাড়াতেই ছিল? তারপর বাংলাদেশে যায়।

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ।

আমি - তারপরে কি আবার চলে আসে?

নাহাবুন্নেসা - না। চলে আর আসেনি। মামারা সব ওখানেই আছে।

আমি - ও মানে আপনার মামার বাড়ি বাংলাদেশে?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ। ওখানেই।

আমি - যাওয়া হয় ওখানে।

নাহাবুন্নেসা - ওখানে গিইচি। তবে অনেক অনেক দিন হয়ে গেছে। বিয়েরা আগে। তারপর আমার আব্বা মা খুব তাড়াতাড়ি মারা গিয়েছে। আব্বা বেঁচে থাকলে যাওয়া আসা হতো। উনার সঙ্গে যেতাম। তারপরে এখন আর হয় না। তারপরে আমার নানা বেঁচে ছিল। নানা আসতো। আমার মা মারা গিয়েছিল; কিন্তু নানা বেঁচে ছিল। নানা আসতো। খোঁজ খবর নিত। এখন আর সে মামারা আর মামাদের মতো হয়ে গেছে।

আমি - ... । সেই। আপনারা ঈদের সময় কি করেন? ঈদের দিনটা কি করেন?

নাহাবুন্নেসা - ঈদের দিনটা খুব আনন্দে কাটে। সকাল থেকে একটা উৎসাহ থাকে। তাড়াতাড়ি উঠে গোসল করে নতুন কাপড় পড়ে কাজকর্ম করে সিমুই লাচ্চা এসব করতে হবে, মিষ্টি মুখ করতে হবে। পাড়া প্রতিবেশীকে দিতে হবে সবাইকে। একটু বেশ আনন্দ হয়।

আমি - আর এখানে সবেবরাতে কিছু হয়?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ হয়। সবেবরাতে নামাজ ও পড়তে হয়। রোজা ও করতে হয়। আবার অনেকেই পিঠে পাঠা করে, ওগুলো এখন আমরা আর করি না। করি না বলতে, আমাদের আর এটা ভালো লাগেনা। সারাদিন রোজা করে নামাজ করতে হয়। ওগুলো আর করি না এখন ৩-৪ বছর। বন্ধ করে দিয়েছি। খাওয়া তো, সারা বছরই খাওয়া হয়। এম্ফুনি যে খেতে হবে এর তো কোনো মানে নিয়ম নেই। তাই না।

আমি - হ্যাঁ তা তো বটেই। আপনাদের কেউ হজ করে?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ ইচ্ছে তো সবারই থাকে। কিন্তু সমর্থ না থাকলে আর কি করে হবে। মনে হয় না হয়ে উঠবে।

আমি - নামাজ পড়েন আপনি।

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ পড়ি। পাঁচ ওয়াক্তই পড়ি। তবে মাঝে মাঝে কাজা হয়ে যায়।

আমি - পাঁচ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য নামাজ ও তো থাকে, সেগুলো পড়েন?

নাহাবুন্নেসা - না সেগুলো আর পড়া হয় না। গাফিলতি আর কি। গাফিলতিতেই আর পড়া হয় না। আমার শরীর একটু খারাপ জানো তো। স্পন্ডলাইস না কি বলে কোমরে সমস্যা।

বসতে অসুবিধা, কাজ করতে ও একটু অসুবিধা। ওই জন্য আর কি গাফিলতি হয়ে যায়। সেভাবে যে একটু কোরানশরীফ পড়বো কি বেশি করে মহরমে কি শবেবরাতে পড়বো, কিন্তু অত ধৈর্য ধরে পড়া যায় না। তবে পড়ি। ইচ্ছা হয়। সে সময় ও আর করে উঠতে পারি না।

আমি - আচ্ছা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজগুলো কি কি মোটামুটি?

নাহাবুন্নেসা - সকালের টা ফজরের নামাজ, তারপরে আসছে জোহরের নামাজ দুপুরের একটার পর থেকে। তারপর ৪ টের সময় আসরের নামাজ, তারপর সন্ধ্যা হচ্ছে মগরের নামাজ। তারপরে সন্ধ্যার পরে আট টার দিকে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। ওই সময় ঈশার নামাজ।

আমি - আচ্ছা আপনারা গোসলখানা বলেন না বাথরুম বলেন?

নাহাবুন্নেসা - বাথরুম তো বলা। বাথরুমটা বলা হয়। কিন্তু আমরা মানে তোমাকে ধরো, মানে গোসল করলে না, বললাম যে গোসল করে এসো। কিন্তু বাথরুমটা বাথরুমই বলা হয়।

আমি - আর ধরুন। আপনাদের মধ্যে কি এসব বলে- 'জি' বা এরকম কিছু?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ফ্যামিলিতে তেমন কেউ বলে না। মানে আমরা ছোটো থেকে সেভাবে শেখাতে পারিনি।

আমি - আবার যে ভাই, তাদের কি বলেন? চাচা বলেন না?

নাহাবুন্নেসা - না বড় আকা, ছোটো আকা এইসব বেশি বলে আমাদের বাড়িতে।

আমি - আর বাবার বোনদের কি বলা হয়?

নাহাবুন্নেসা - বেটি বলা হয়। তবে কেউ কেউ ফুফু ও বলে।

আমি - আপনারা তসবীহ গোনেন?

নাহাবুন্নেসা - হ্যাঁ ।

আমি - বিয়ের পড় শ্বাশুড়ি তো ছিল, তা তখন শাশুড়ি কেমন ছিলেন?

নাহাবুন্নেসা - তিনি খুব একটা রাগী ছিলেন না। খুব অমায়িক মানুষ ছিলেন। খুবই ভালো মানুষ। মানে আমরা অন্যায় করলে ও সেটা খুব তাড়াতাড়ি এ করে নিতেন, মেনে নিতেন।

Date: 10.12.2021

Hasnukhema

Udaya K. Chakraborty.